উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

ঐচ্ছিক পত্র – ১০৪

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ - মঙ্গলকাব্য

একক ২ - মনসামঙ্গল

একক ৩ - চন্ডীমঙ্গল

একক ৪ - ধর্মমঙ্গল

একক ৫ - শিবমঙ্গল বা শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গল

একক ৬ - বৈষ্ণব পদাবলী: স্থান-কাল-প্রেক্ষিত-বিকাশ ও অবক্ষয়

একক ৭ - পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, বৈষ্ণব কবিকূল ও তাঁদের কৃতিত্ব

পর্যায় – খ

একক ৮ - রামায়ণ অনুবাদ

একক ৯ - মহাভারতের অনুবাদ

একক ১০ - ভাগবত অনুবাদ

একক ১১ - দৌলতকাজীরঃ লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না

একক ১২ - সৈয়দ আলাওল

একক ১৩ - পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস – সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ,
উপকরণ, গঠন, লিপিকর, আদর্শ পুঁথি

একক ১৪ - পুঁথি পাঠ ও পাঠ – সংক্রান্ত বিষয় সমূহ

১০৪ - মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

পর্যায় – ক

একক ১ – মঙ্গলকাব্য – উদ্দেশ্য, মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি, অনার্য দেব-দেবীর আর্যীকরণ, মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণ, মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক গঠন, মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ, মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাগ, মঙ্গলকাব্যগুলিতে ইতিহাসের উপাদান।

একক ২ – মনসামঙ্গল - মনসা দেবীর উদ্ভাবনের কারণ ও মনসা নামের উদ্ভব, মনসামঙ্গলের কাহিনী, বাংলায় মনসা মঙ্গলের ত্রিধারা ও কবিগন, মনসামঙ্গলের প্রথম যুগের কবিকুল, মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যকৃতির পরিচয়-নারায়ন দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, চৈতন্য পর্বের মনসামঙ্গল কাব্য, মনসামঙ্গলের চরিত্র বিচার, মনসামঙ্গলের সমাজ চিত্র।

একক ৩ – চন্ডীমঙ্গল – উদ্দেশ্য, দেবী চণ্ডীর উৎস, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী, মঙ্গলচন্ডী নামের উৎপত্তি, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচার, মুকুন্দরামের ঔপন্যাসিক প্রতিভা, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্র।

একক ৪ – ধর্মমঙ্গল – উদ্দেশ্য, ধর্ম ঠাকুরের উৎস ও বৈশিষ্ট্য, ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়, ধর্মমঙ্গলের কবিগন, ধর্মমঙ্গল : রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য প্রসঙ্গ, ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা, ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যতা, ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচার, ধর্মমঙ্গলের সমাজজীবন।

একক ৫ - শিবমঙ্গল বা শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল - দেবতা শিবের উৎস, শিবায়নের বৈশিষ্ট্য, শিবায়নের কাহিনী পরিচয়, শিবায়নের কবিগন, শিবায়ন কাব্যের চরিত্র বিচার, শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্যের পার্থক্য, অষ্টাদশ শতাব্দী যুগ চেতনা ও ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়, অন্নদামঙ্গলের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, 'নূতনমঙ্গল' অভিধা কতখানি প্রযোজ্য

একক ৬ - বৈষ্ণব পদাবলী: স্থান-কাল-প্রেক্ষিত-বিকাশ ও অবক্ষয় – উদ্দেশ্য, মধ্যযুগের বৃহত্তর রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক- সামাজিক-সাংস্কৃতিক চালচিত্র, পদাবলীর বিষয়, বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ, প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা, ষোড়শ শতক: বৈষ্ণব সাহিত্যের সুবর্ণযুগ, বিভিন্ন যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা গণ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক: পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়।

একক ৭ - পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়,বৈষ্ণব কবিকূল ও তাঁদের কৃতিত্ব – উদ্দেশ্য, বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রেষ্ঠ কবিকূল, চন্ডীদাস ও তাঁর কৃতিত্ব, বিদ্যাপতি ও তাঁর কৃতিত্ব, চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রেষ্ঠ কবিকূল, জ্ঞানদাস ও তাঁর কবি কৃতিত্ব, গোবিন্দদাস ও তাঁর পদাবলী, বলরাম দাস ও তাঁর কবি কৃতিত্ব, গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলী।

একক ১- মঙ্গলকাব্য

বিন্যাসক্রম

১.১- উদ্দেশ্য

১.২- মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি

১.৩- অনার্য দেব-দেবীর আর্যীকরণ

১.৪- মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণ

১.৫- মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক গঠন

১.৬- মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ

১.৭- মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারাস

১.৮- মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাগ

১.৯- মঙ্গলকাব্যগুলিতে ইতিহাসের উপাদান

১.১০- অনুশীলনী

১.১১- গ্রন্থপঞ্জি

১.১- উদ্দেশ্য

যেখানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় তাকেই বলা হয় মঙ্গলকাব্য। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাংলার বিশৃংখল আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি।বাংলার মানুষের বিন্যাস ছিল যে মঙ্গলকাব্য গুলি পাঠ করলে কিংবা শ্রবণ করলে অথবা গ্রন্থ গুলি বাড়িতে রাখলে সকলের মঙ্গল সাধিত হবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কারের বিপরীতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ভাবনার রীতিনীতি, উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মর্যাদা দান - প্রভৃতি কারণে মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয়েছিল।এখানেও দেব দেবীর উল্লেখ আছে,কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেব দেবী গন প্রত্যেকেই মর্ত্য মৃত্তিকা ঘেঁষা। আর এর মূলে ছিল অনার্য সম্ভূত দেবদেবীর সঙ্গে পৌরাণিক দেব দেবীর মিলন সাধনের প্রচেষ্টার ফল। মঙ্গলকাব্য গুলি দেব পূজা এবং ধর্মচিন্তা কেন্দ্রিক আখ্যানকাব্যের এক বিশেষ শাখা। মনসা,চন্ডী,ধর্ম প্রমুখ দেবতার কাহিনি বিভিন্ন আসরে, ঘরোয়া উৎসবে গান করা হত। বিবাহ,সন্তানের জন্ম,ফসলের জন্য,গৃহের যে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে এবং দেবতার পূজায় গাওয়া হতো এই মঙ্গল গান। সুকুমার সেন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে 'তামসী শতাব্দী' বলে উল্লেখ করেছেন।আনুমানিক সেই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত দীর্ঘসময় এই ধর্মীয় কাব্য শাখাটি জড়িত ছিল জনজীবনের সঙ্গে। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত গ্রাম্য ব্রত কথা এবং পাঁচালী রূপেই প্রচলিত ছিল এই বিশেষ রীতির কাব্যধারা। এই দীর্ঘকাল ধরে কোন কবিগণ কোন সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন, কিভাবে দেবকথার সঙ্গে মানব কথাকে যুক্ত করে জনপ্রিয় আখ্যান গড়ে তুলেছেন- সেই বহু কথিত কবিকাহিনী ও বহু আয়াসসাধ্য গবেষণালব্ধ মঙ্গলকাব্য কথাকেই নতুন করে দেখা আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এর ফলে বাংলা মধ্যযুগের ইতিহাসে জনজীবনের পরিচয় আমাদের সামনে অনেকটাই স্পষ্ট হবে। আর এই সাহিত্যধারা পাঠ করলে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বের বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকার পরিচয় লাভ করব। পাশাপাশি বাঙালির ভৌম জীবন ও ভাব জীবন, মর্ত্য জীবন ও অধিমানুষের জীবন সম্পর্কেও অবহিত হতে পারব।

১.২- মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি

মধ্যযুগের সাহিত্য ভূমিতে মঙ্গলকাব্য গুলি যেন একরাশ সূর্যমুখী ফুল- তার জন্ম মাটিতে, পরিপুষ্ট তা মাটির রসে ও মাটি ঘেষা জীবনের স্বেদবিন্দু ছায়ায়। অথচ প্রতি মুহূর্তে দৈব কৃপালাভের জন্য ক্রমাগত তার উর্ধমুখী প্রার্থনা। একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর'গ্রন্থে 'বাতায়নিকের পত্রে' ব্যাখ্যা করেছিলেন- "বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তাঁর সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথাটা মনে হয়, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে সেটা ধর্মনীতিগত তারতম্য নিয়ে।" রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে রূপায়নের অন্তরালে মানব বুদ্ধির আগমন অগোচর দৈব মাহাত্ম্য ঘোষণাই এর মূল উপজীব্য বিষয় বলে ভেবেছিলেন। এই অনুমান সত্য,তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়।

মঙ্গলকাব্য গুলি ধর্মীয় বিচারে দেব দেবীর মহিমা জ্ঞাপক কাহিনি। ইতিহাসের বিচারে মধ্যযুগীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার পটভূমিতে আত্মরক্ষার পুরাণ। কারণ তুর্কি আক্রমণ বাংলাদেশে বিজাতীয় সংস্কৃতিবাহী বিধর্মী রাষ্ট্রশক্তির অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠায় ধন-প্রাণ-ধর্মরক্ষার চিন্তায় হিন্দু মানস হয়ে উঠেছিল অস্থির। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ১২০৩ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তুর্কি আক্রমণ বাংলাদেশে বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পাল রাজবংশ এ দেশে প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে। গঙ্গা নদীর তীরে নদিয়ায় ছিল রাজা লক্ষণ সেনের অস্থায়ী রাজধানী। তাঁর আমলে বাংলায় সুখ শান্তি বজায় ছিল।তুর্কি নেতা বক্তিয়ার খলজির আকস্মিক আক্রমণে লক্ষনসেনের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়,বক্তিয়ার খলজির সঙ্গে দলে দলে তুর্কিরা যোগ দেয়। ভেঙে পড়ে বাংলার হিন্দু প্রশাসন।দলে দলে সাধারন মানুষ, লক্ষনসেনের আমলা এবং অভিজাতরাও পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গের কামরূপে আশ্রয় নেয়। ঐতিহাসিকের মতে, বৃদ্ধ লক্ষণ সেন চলে যান বিক্রমপুরে। তুর্কি শক্তি ক্রমশ প্রসারিত হয় উত্তর ভারত থেকে পূর্ব ভারতের দিকে।এরপর বক্তিয়ার অধিকৃত অংশে ও সমগ্র বাংলাদেশেই ক্রমাগত লুণ্ঠন ও ধ্বংস চলতে থাকে এবং প্রচারিত হতে থাকে ইসলাম ধর্ম।পরিণামে বাংলাদেশে প্রচন্ড শক্তিশালী সম্পূর্ণ বিজাতীয় ইসলাম ধর্মের এক রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত

হয়।যুদ্ধে হিন্দু রাজশক্তি সেন বংশের পতনের ফলে রাজকীয় আনুকূল্য থেকে হিন্দু ধর্ম বঞ্চিত হয়। আবার জাতপাত, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির কারণে হিন্দু ধর্ম নিম্নবর্ণের মানুষজনের সহানুভূতি হারায়। নবাগত ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণে অনেকে ধর্মান্তরিত হন। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয় হতাশা ও ব্যর্থতার বেদনা। প্রথম পর্যায়ে ইসলামী শাসকবর্গের ধ্বংস, হত্যা,অত্যাচার ও লুণ্ঠনের নাটকীয় আচরণে হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে এক বিপন্ন মনোভাব দেখা দেয়। বস্তুত তুর্কি আক্রমণোওর বাংলাদেশের জনজীবনে যে অস্থির চিন্তার আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তারই মনোদর্পণ 'মঙ্গলকাব্য'। ইসলামী ধর্ম ও সংস্কৃতির আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এদেশের হিন্দু সংস্কৃতিমনা সম্প্রদায় আর্য দেবভাবনা ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাগার্য দেবদেবীর সমন্বয় সাধনের জন্য সচেষ্ট হন।ফলে এতদিন ধরে উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা উপেক্ষিত চন্ডী,মনসা, ধর্মঠাকুর প্রমুখ দেবদেবীরা, রাষ্ট্রীয় অবিচার এবং আধি ব্যাধি সর্পভয় নিবারণে কবি কল্পনায় দেখা দিয়েছিল।

তুর্কি রাজত্ব,পাঠান ও মুসলমান শাসনের দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল হত্যা,ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি কারণে।১৪১৪খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে বাংলার শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন হিন্দু রাজা গণেশ। প্রবল সামরিক শক্তিতে তিনি ইলিয়াস শাহী বংশ ধ্বংস করেন এবং হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ বিধর্মী রাজা গণেশের আধিপত্য মেনে নিতে পারছিলেন না। তাদেরই আহ্বান জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শরকি বাংলা আক্রমণ করেন ও সিংহাসনে আরোহন করেন যদু অর্থাৎ জালালউদ্দিন। কিন্তু ইব্রাহিম দেশে ফিরে গেলেই গণেশ আবার তার প্রতিপক্ষকে দমন করেন। জালাল উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে 'দনুজমর্দনদেব'উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসন অধিকার করেন এবং পুত্রকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন।

এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় ধারার পর অর্থাৎ অন্ধকার যুগের অবসানের পর বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরত শাহ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় ধারায় বাংলার সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহও (১৪৫৬-১৪৭৪) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা।ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'গ্রন্থের রচয়িতা মালাধর বসুকে তিনি 'গুনরাজ খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন। হোসেন শাহের আমলেও মুসলিম শাসনকর্তাগন হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই সময়ে মালাধর বসু,বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ কবিরা সুলতানের আনুকূল্য লাভ করেছেন। পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত অনুবাদে ও এই সাংস্কৃতিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। এদিক থেকে পূর্ববর্তী রাজা দনুজমর্দন গণেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিল তাঁর আমলেই। অনুমান করা হয় যে বাংলা রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনিই মুদ্রায় উৎকীর্ণ করেছিলেন 'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' শব্দটি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে তুর্কি বিজয়ের পরিণামে অন্ত্যজ হিন্দু সমাজের সঙ্গে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দুদের যোগাযোগ তৈরি হল। নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে একটি সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থে কেবল যে নিম্নবর্ণের অবহেলিত হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে সচেষ্ট হলেন তাই নয়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হাত থেকেও হিন্দুসমাজ অনেকটা রক্ষা পেল এবং লোকায়ত দেবদেবীরাও প্রতিষ্ঠা পেলেন। মঙ্গলকাব্যগুলি মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল,শিবমঙ্গল,ধর্মমঙ্গল এই দেব-দেবীদের আখ্যান রূপে রচিত হল। সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক- "বাংলাদেশ আর্য অনার্য দুই স্তরের পরস্পর মিলন কল্পে তুর্কি অভিযান রূপে প্রচন্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করেছিল। মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্য মিলন হইয়া বাঙালি জাতি বিশিষ্ট রুপাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।"

এই রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ছাড়াও মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির আরো বেশ কিছু কারণ ছিল। সেগুলি হল-

ক) আর্য সংস্কৃতির ধারক উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অনার্য সংস্কৃতির ধারক নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিল, যে ধর্ম চিন্তাগত তীব্র ব্যবধান ছিল তুর্কি আক্রমণের ফলে তাদের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে সংস্কৃতির বিনিময় ঘটলো। ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালি হল ঐক্যবদ্ধ। আর্য-অনার্য দেবদেবীদের মধ্যেও ঘটলো সংমিশ্রণ। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে ওঁরাও, সাঁওতাল, ব্যাধ বা সবর পূজিতা 'চান্ডী' বা 'চুন্ডী'দেবী শিবজায়া উমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠলেন দেবী চণ্ডী রূপে, সর্প দেবী মনসা 'মঞ্চামা' বা 'মনোমাঞ্চী' নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে বা বৌদ্ধ সর্পদেবী 'জাঙ্গুলী' তারার সঙ্গে জড়িত হয়ে লৌকিক দেবী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। অনুরূপভাবে ধর্ম ঠাকুর অস্ট্রিক কূর্মবাচক 'দরম' বা অন্ত্যজ দেবতা 'ডোমরায়' কিংবা বৌদ্ধ দেবতা 'নিরঞ্জন'বা বৈদিক বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্র-বরুণ-যম প্রমুখ দেবতার ভাব কল্পনার সঙ্গে অভিন্ন চেতনায় ধর্ম ঠাকুর রূপে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে প্রকাশিত হলেন।

খ) বিপদে পড়লে ভীত মানুষ দেবতার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের উৎপত্তির মূলে রয়েছে এই রকম নানা ধরনের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রভাব। বাংলাদেশ নদী-নালা, খাল-বিল ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাঘ,কুমির,সাপ ইত্যাদি হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের আক্রমণে এবং বসন্ত,কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপে প্রায়ই মানুষের প্রাণহানি ঘটত। নানাভাবে উপদ্রুত বাংলার মানুষ তাই ভেবেছিল এই সমস্ত আধিভৌতিক দুর্যোগের পিছনে নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী দেবতার অদৃশ্য হাত কাজ করছে। সেই ক্রুদ্ধ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই মঙ্গল সাধিত হবে। তাই সাপ, বাঘ, কুমিরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মনসা, দক্ষিণরায় ও কালো রায় প্রভৃতি দেবদেবীর কল্পনা করা হল। ঝড় ঝঞ্ঝার ক্ষেত্রে উদ্ভূত হলো দেবী চণ্ডী, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি দানের জন্য ধর্ম ঠাকুর, কলেরা ও বসন্ত ব্যাধির থেকে উদ্ধার পেতে শরণাপন্ন হলেন দেবী শীতলার । স্বভাবতই লোকচিত্তে এই বিশ্বাসবোধ প্রকার হলো যে, এইসব দেব-দেবীকে পুজো করে তুষ্ট করলে তাঁরা ভক্তকে সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। মঙ্গলকাব্য রচনার আর একটি মৌল প্রেরণা এই ভয়ভাবনাজাত অহৈতুকী ভয় ভাবনা। একদিকে উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে রেহাই পাবার জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলে দলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয়

বিশৃঙ্খলা-এই দুইয়ে মিলে হিন্দু সমাজের দ্রুত ভাঙ্গন ও অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লৌকিক দেবদেবী ও ধর্ম বিশ্বাসকে বাঙালি হিন্দুরা মেনে নিতে লাগলেন। এটাই ছিল মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের সব চেয়ে বড় কারন।

গ) সম্রাট অশোকের সময় থেকেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম সুবিস্তৃত ছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু দেবতাদের মধ্যে ক্ষমতা আরোপ করে তাঁদের প্রকট করে তোলা হল।

ঘ) পাল রাজাদের সময় থেকে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব হয় ও সেনরাজাদের সময়ে বৈষ্ণবধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে এই লৌকিক ও দেশীয় সংস্কৃতি মিশে যায়। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় মঙ্গল দেবতাদের উদ্ভবের একটি বিশিষ্ট কারণ।

ঙ) রাজা লক্ষণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর সভাকবি ছিলেন 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেব। জয়দেবের কাব্যে প্রথম 'মঙ্গল' শব্দটি উল্লেখ পাওয়া যায়।

১.৩- অনার্য দেব-দেবীর আর্যীকরন

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো মঙ্গলকাব্য। পল্লী অঞ্চল এমনকি শহর ও শহরতলীতেও মঙ্গল কাব্যের কোন কোন দেব দেবীর ঘটা করে পূজা হয়। এই উপলক্ষে দেব দেবীর মহিমা বিষয়ক গান করা হয়।বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা প্রচার সম্বন্ধীয় একপ্রকার আখ্যানকাব্য কেই মঙ্গলকাব্য বলা হয়। তবে এই সমস্ত দেব-দেবীদের অনেকেই আর্য পরিমণ্ডলের অন্তর্গত নন, বাংলার গ্রাম্য পরিবেশে ও সমাজে এঁদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। তাই এঁরা লৌকিক অলৌকিক গ্রামীণ আদর্শ থেকেই উদ্ভূত।বিশেষত সমাজের নিম্নস্তরে এবং স্ত্রী সমাজে যেখানে আর্য প্রভাব পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছিল, সেখানে তথাকথিত অনার্য প্রভাব বিশেষত দেবদেবীদের প্রভাব অনেকদিন প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল। বর্তমানেও বাংলার পল্লী গ্রামগুলিতে নানা গাছ তলায় যেসমস্ত দেবদেবী মহিলাদের দ্বারা পূজিত হন, তাঁদের কেউই সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা পরিশুদ্ধ নন। এমনকি পুরাণ গ্রন্থে ও তাদের ঠাঁই মেলেনি। চন্ডী, মনসা, বাশুলী,

ধর্ম, পঞ্চানন প্রভৃতি লৌকিক অর্থাৎ গ্রাম্য দেবগন বাঙালির অর্জিত সংস্কার বহন করে চলেছে।

বিপদে-আপদে পড়লে মানুষ ভয়ে ভক্তিতে দেব-দেবীদের স্মরণ করেন। বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের উৎপত্তির মূলে এইরকম নানা ধরনের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আপদ বিপদের প্রভাব রয়েছে। সাপের বিষ দাঁত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনসার পরিকল্পনা, হিংস্র শ্বাপদের মুখ থেকে বাঁচবার জন্য দেবী চণ্ডীর পরিকল্পনা, বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেবী শীতলার উৎপত্তি, এমনকি বাঘের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের মূর্তি তৈরি করে পূজা করার ব্যবস্থা এখনো রয়েছে।মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী অনেক আগে থেকেই ছড়ায়, পাঁচালীতে, মেয়েলি ব্রতকথায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। তবে অবশ্য পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর সমাজে পৌরাণিক প্রভাব গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরও জাতে উঠতে লাগলেন। আগে চন্ডী ছিলেন অনার্য জাতির দেবী, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি শিবের গৃহিণী পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন।সাপের দেবী ভয়ঙ্করী মনসা যে আর্য মন্ডল বহির্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শিবের মানসকন্যা বলে প্রচার করা হলো।মঙ্গল কাব্যের একমাত্র পুরুষ দেবতা ধর্মঠাকুর পৌরাণিক না হলেও তাঁকে প্রায় বিষ্ণু করে তোলা হয়েছে। তাই এক সময়ের এই সমস্ত আর্যতর গ্রাম্য দেবদেবী বাংলাদেশের নির্বাচিত হলেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে সমন্বয়ের যুগ শুরু হলে তাঁরা উচ্চবর্ণেরও শ্রদ্ধা লাভ করলেন। ব্রাহ্মণ কবিরা পূর্বের সংস্কার ভুলে গিয়ে চন্ডী, মনসা, ধর্ম ঠাকুরের আরাধনা ও তাঁদের মহিমা প্রচার করার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের স্বভাব ও আচরণ প্রধানত এরকম-

১) মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীগন অনার্যকুলজাত। মনসা দেবীর উৎসে আছে সর্পপূজা, সিজ গাছের উপাসনা, প্রজনন শক্তির আরাধনা। চন্ডী দেবী মুখ্যত ব্যাধদের শিকারের দেবী। মেয়েলি ব্রতের ঠাকুর- পশুদের ত্রাণকর্ত্রী বনদেবী। ধর্মঠাকুরের মূলে কূর্মাকৃতি প্রস্তরের উপাসনা ও সূর্য পূজার যোগ রয়েছে। রোগের ভয় ও রোগ মুক্তির জন্য

শীতলা ও ওলাইচন্ডী দেবীর পূজা লোক সমাজে প্রচলিত ছিল। আর ষষ্ঠী পূজার মূলে ছিল আদিম প্রয়োজন শক্তির প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস।

২) মঙ্গল দেব-দেবীদের মধ্যে কোন উচ্চ দার্শনিকতা নেই। মোক্ষদানে এইসব দেব-দেবীদের আগ্রহ দেখা যায়নি। ইহলোকে মানুষ সুখ চায় এবং পরলোকে স্বর্গ পেতেই সাধারণ মানুষ আগ্রহী। স্বর্গ ও তাদের কাছে ভোগ আকাঙ্ক্ষা পূরণের উচ্চতর কোন পৃথিবী। মানুষের পার্থিব সমস্যা দূর করা, প্রাকৃতিক ভয়-ভীতি নিবারণ করা, কামনা বাসনা পুরনেই এই দেব-দেবীদের ভূমিকা সার্থক। মনসা দেবী সাপের ভয় দূর করেন,দক্ষিণরায় বাঘের অত্যাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করেন এবং ওলাইচন্ডী ওলাওঠা অর্থাৎ কলেরা রোগের ত্রাণকর্ত্রী। আবার শীতলা দেবী বসন্ত রোগের প্রতিকার করেন, ধর্ম ঠাকুর নিবারণ করেন কুষ্ঠরোগ ও বন্ধ্যাত্ব। ষষ্ঠী দেবী ও মনসা দেবী সন্তানহীন মানুষকে পুত্র সন্তান প্রাপ্তির বর দেন। আবার কোন দেবী নিরুদ্দেশ স্বামী পুত্রকে ফিরিয়ে দেন তাদের স্ত্রী ও মাতার কাছে।

৩) মঙ্গলকাব্যের দেব দেবীগন মানুষের মতোই রাগ ও বিদ্বেষের বশবর্তী। তাঁরা ক্ষনে রুষ্ট, আবার ক্ষণে তুষ্ট। দেবত্ব এঁদের একটা আবরণ মাত্র। স্বাভাবিক মানবিক গুণের আধার মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা।

১.৪- মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণ

মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা:-

মধ্যযুগের সাহিত্য ভূমিতে মঙ্গলকাব্যগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুত পদাবলী, চরিত কাব্য ও অনুবাদ শাখার মত মঙ্গলকাব্যগুলিও বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট পর্যায়। এর আখ্যানের বহিরঙ্গে আছে দৈবলীলা বা দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং অন্তরঙ্গে আছে সেই দেবদেবী বা শাপভ্রষ্ট চরিত্রের মানবিক স্বভাবের রূপায়ণ। লোক সমাজে পূজা প্রচার ও স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় এখানে দ্বন্দ্বই হয়েছে দেবতা ও মানব চরিত্রের বিধিলিপি। মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত অনুসারে,"খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রিস্টীয়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ প্রকার সাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রচলিত ছিল তাহাই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত”।

"অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বলেন-" মঙ্গলকাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত।..... যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যেখানে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলার গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আটদিন ব্যাপীয়া চলে তাহাকেই মঙ্গলগান বলে।"

মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-"দেবমাহাত্ম্য বাচক বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য যে আখ্যান কাব্য রচিত হইয়াছিল, সাধারণ কথায় তাহাকে মঙ্গলকাব্য বলা যায়।"

মঙ্গল নামকরণের কারণ:-

মঙ্গল কাব্য গুলির মঙ্গল নামের কারণ ও উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। সেই তথ্যগুলিকে সুত্রাকরে এইভাবে সাজানো যেতে পারে-

১) 'মঙ্গল' শব্দটি ঋকবেদে 'গৃহ কল্যাণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূত্রানুযায়ী শব্দটি গৃহীত হতে পারে।

২) হরিবংশ অনুযায়ী মঙ্গল শব্দটির অর্থ দেবলীলাগত।

৩) জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে "মঙ্গলম উজ্জ্বল গীতি"বলে গানের সূচনা হয়েছে।

৪) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রে 'মঙ্গল' নামে একটি পৃথক রাগের উল্লেখ আছে। তাঁর মতে একসময় মঙ্গলকাব্যগুলি এই মঙ্গল রাগেই পরিবেশিত হতো।

৫) বাংলাদেশ,অসম ও তামিলনাড়ুতে বিবাহের বন্ধন হিসেবে ‘মঙ্গল’ শব্দের ব্যবহার আছে। এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ বিবাহ সংগীত।

৬) প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে বিবৃত মঙ্গলাসুর দৈত্য বধের কাহিনী থেকে কাব্যের এইরূপ নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

৭) 'অষ্টমঙ্গলা' অর্থাৎ মাসের এক মঙ্গলবার থেকে শুরু করে আর এক মঙ্গলবারের মধ্যে এই কাব্য পালা পাঠ সীমাবদ্ধ থাকতো বলে এর 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণ করা হতে পারে।

এই কাব্য লিখনে মঙ্গল, পাঠ করলে মঙ্গল, শুনলে মঙ্গল এবং ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয়। আসলে 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ হল 'গাথা'। গানের 'গা' আর কথার 'থা' মিলে হল গাথা। সেই সূত্রে মঙ্গলকাব্য হলো গান ও কথার সংমিশ্রণ। অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই অভিমতের পক্ষপাতী। এক কথায় বলা চলে, অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মঙ্গল বিধায়ক দেব দেবীর বিজয় কাহিনী বর্ণনা করা যে কাব্যের মূল লক্ষ্য, তারই নাম 'মঙ্গলকাব্য'।

১.৫- মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক গঠন

মঙ্গলকাব্য দেবলীলা বর্ণনার কাহিনী কাব্য। ধর্মতত্ত্ব, দেবলীলা ও নানাকাহিনীর সংমিশ্রণে মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছে।সংস্কৃত পুরাণের শেষ সংস্করণ বলা যেতে পারে এই কাব্যগুলিকে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য বিচার বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করা গেছে সেগুলি এইরকম-

১) মঙ্গল কাব্যের দুটি ভাগ- একটি দেবখন্ড এবং অন্যটি নরখন্ড। 'দেবখন্ডে' উদ্দিষ্ট দেবতাকে সাধারণত মহাদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় । অপরটি ‘নরখন্ড’- এখানে মর্ত্যলোকে দেবতা নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য মানব-মানবীকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করে থাকেন। মঙ্গলকাব্যের সূচনায় কবি গণেশাদি অন্যান্য দেবদেবীর প্রশস্তি বন্দনা ও গ্রাম্য দেবতাদের বন্দনা করতেন। চৈতন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্য গুলিতে চৈতন্য বর্ণনা স্থান পেয়েছে অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে।

২) মঙ্গলকাব্যের সূচনায় কবি গণেশাদি অন্যান্য দেব দেবীর বন্দনা করে কাব্য শুরু করেন। এই বন্দনা অংশে হিন্দু দেব দেবীর পাশাপাশি অনেক কবি অন্যান্য দেবতা

এমনকি ইসলামী দেবতাকেও বন্দনা করতে কুণ্ঠিত হননি। আবার চৈতন্য পরবর্তী কালের মঙ্গলকাব্য গুলিতে চৈতন্য বন্দনা স্থান পেয়েছিল এক অপরিহার্য অঙ্গ রূপে।

৩) প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' বর্ণনায় স্বপ্নাদেশ বা দৈবাদেশের উল্লেখ রয়েছে। এই অংশ কবির ব্যক্তি জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এমনকি সমকালীন ইতিহাস, আঞ্চলিক পরিচয় বিবৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষ।

৪) মঙ্গলকাব্যের নায়ক নায়িকাদের অনেকে বনিক বা অন্ত্যজ শ্রেণী ভুক্ত, যেমন- চাঁদ সওদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত সদাগর, ব্যাধ কালকেতু, ফুল্লরা, কালু ডোম, লখাই প্রমুখ।

৫) অনেক মঙ্গলকাব্যে যাত্রা, সমুদ্রযাত্রা এবং শিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা রয়েছে, আবার চন্ডীমঙ্গল কাব্যে শিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে কামরুপ যাত্রার কথা আছে, আছে যুদ্ধযাত্রার কথা।

৬) মঙ্গলকাব্য গুলিকে বলা যেতে পারে মধ্যযুগের লোক সংস্কারের খনি। সাধভক্ষণ, শিশুর জন্ম, অন্নপ্রাশন, সংসার জীবনের বর্ণনা, রন্ধন তালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ রীতি, সংস্কার, নারীগণের পতিনিন্দা, নায়িকার বারমাস্যা, চৌতিশা স্তব ইত্যাদি প্রসঙ্গে বাঙালিয়ানা প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবি বাঙালি জীবনকে ছুঁয়ে গেছেন।

৭) জরতী বা বৃদ্ধার বেশে ভক্তকে ছলনা বা শত্রুপক্ষকে ভয় দেখানোর প্রচেষ্টা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের মধ্যে দেখা যায়।

৮) কবির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছে। গোষ্ঠী বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ থেকে শুদ্র, এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়কেও তারা বাদ দেননি। অবশ্য মনসামঙ্গলে বিশেষ করে বিপ্রদাস-এর 'মনসাবিজয়'-এ মুসলমানদের উপর মনসা এবং তার সর্পকুলের যে কোপ তা অন্য কথা বলে। যদিও অবন্তী সান্যাল মনে

করেছেন অংশটি রচনা বিপ্রদাসের নাও হতে পারে। তবে ধর্মমঙ্গলে হিন্দু-মুসলমানের একত্রে রুটি ভাগ করে খাওয়ার সাম্যবাদী ছবি ধরা পড়েছে।

৯) করুণরস, বীররস এবং কৌতুক রসের আশ্রয়েই প্রধানত মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা হত। এরফলে দুঃখের দারুণ দহন এবং কৌতুকের স্নিগ্ধ নির্ঝরে কাব্যগুলির কাহিনী সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

১০) মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত পয়ার ছন্দে লেখা। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ইত্যাদি পয়ারের বিচিত্র রূপ দেখা যায়।আবার ভারতচন্দ্রের মতো কবির রচনায় বহু সংস্কৃত ছন্দের বাংলায় প্রকাশ ঘটেছিল।

১১) প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের অলৌকিকতা প্রাধান্য লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত দেবমাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল বলেই এমনটি ঘটেছে।

১.৬- মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ

আঙ্গিক অর্থাৎ গঠনশৈলীর নির্দিষ্ট বিভাগ ছাড়াও মঙ্গলকাব্যের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ আছে। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথম পর্যায়ে ছিল ব্রত কথা। গ্রামীণ নারীসমাজ গৃহের সুখ-শান্তির কারণে লৌকিক দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাতেন ছড়া ও গানের মাধ্যমে। লোকসমাজ থেকেই সৃষ্ট এইসব ব্রত কথায় দেব বন্দনা মূলক কাহিনী কিছু কিছু থাকতই। সঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আলপনা ও কিছু প্রতীক চিহ্নের ব্যবহারে শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি হত। এই মৌলিক সাহিত্য ছাড়া ব্রতকথা পরবর্তী সময়ে লিখিত পাঁচালীর মর্যাদা লাভ করে। ক্রমশ দেবীদের বিশেষত চন্ডী ও মনসার লীলাকাহিনী পাঁচালীর আকারেই বিস্তৃত হতে থাকে। পাঁচালী ব্রতকথার মতো সংক্ষিপ্ত নয়, বরং তা আরো বিস্তারিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হয়ে মঙ্গল কাব্যগুলির সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পল্লীর সাহিত্যই বৃহৎ সাহিত্যে রূপান্তরিত হল। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোটো পল্লী সাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। সব শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের রয়েছে-

১) নায়িকার বারোমাস্যা, কখনো নায়কদেরও। সুখের বারোমাস্যা যেমন আছে তবে দুঃখেরই বেশি।

২) এখানে আছে লোকসমাজ, লোক জীবনের ও লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়। এসেছে অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষদের জীবনযাপন, বিশ্বাস সংস্কার, আচার-আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠানের কথা।

৩) আছে নারীদের পতিনিন্দা। সংস্কৃত সাহিত্যে পতিনিন্দার এই রীতি লক্ষ করা গেছে। মঙ্গল কাব্যে বিবাহ বাসরে উপস্থিত রমণীরা আপন আপন স্বামী নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। চন্ডীমঙ্গলে দেখা যায়-

'দেখিআ বরের রূপ জতেক যুবতী

মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।'

৪) মঙ্গলকাব্য গুলিতে কবিরা আত্মপরিচয় দান ছাড়াও ভণিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন 'চন্ডীমঙ্গল'কাব্যে-

‘প্রভুর ইঙ্গিত পায়া আদি দেবী মহামায়া

সৃষ্টি সৃজিতে খৈল মন।

উমাপদ-হিত চিত রসিল নতুন গীত

চক্রবর্তী শ্রী কবিকঙ্কন।।’ (প্রথম দিবস: নিশা)

অবশ্য বিভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন ভনিতাও পাওয়া যায়। অনেক কবি তাদের ভনিতায় পূর্ববর্তী কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। যেমন মুকুন্দরাম স্মরণ করেছেন পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তকে-

'মানিক দত্তের বন্দো করিয়া বিনয়।

যাহা হইতে হইল গীত পথ পরিচয়।।'

ধর্মমঙ্গলের আদি কবিকে স্মরণ করেছেন পরবর্তী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।

৫) প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যে বিবাহ আচারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কবিগণ প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতাতেই এই অংশটি রচনা করেছেন।

৬) মঙ্গলকাব্য গুলিতে নায়িকাদের রন্ধনবিদ্যায় নিপুণতা, দীর্ঘ বিস্তৃত রন্ধন ও খাবারের তালিকা এবং বহুরকম খাদ্যবস্তুর কথা আছে, যা বাঙালির ভোজনপ্রিয়তাই প্রমাণ দেয়।

৭) মঙ্গলকাব্য গুলিতে আছে বণিকদের বাণিজ্য যাত্রার বিষয়। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা নিয়ে বাণিজ্যে যায়।চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সওদাগর সপ্তডিঙা নিয়ে চন্দন ইত্যাদি আনবার জন্য বাণিজ্যে যায়। এ প্রসঙ্গে সমুদ্রপথের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

৮) বারমাস্যা বা বারমাসের দুঃখের কাহিনী মঙ্গল কাব্যের একটি বিশেষ অংশ। ফুল্লোরা বারমাসের দুঃখের কথা শুনিয়েছে ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত এই বারমাস্যা।

৯) অনেক মঙ্গল কাব্যে দেব দেবীর শতনাম কীর্তন আছে। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে দেবী চণ্ডীর শতনাম বর্ণনা।

১০) মঙ্গলকাব্য গুলিতে আছে নগর বর্ণনা, সরোবর বর্ণনা, বিস্তৃত বৃক্ষ তালিকা। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে গুজরাট নগর পত্তন এর বর্ণনা বন কেটে বসতি স্থাপনে এই দিক গুলির পরিচয় আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান নগরের বর্ণনা আছে।

১১) লোক সাহিত্যের কোন কোন লক্ষণ মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায়। যেমন নারীর সতীত্ব প্রমান-এর বিষয়। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলাকে এবং চন্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনাকে এই পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

১২) মঙ্গলকাব্য গুলিতে মূল চরিত্র প্রথমে বিদ্রোহী হলেও পরে দেবতা বা দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য সবই উদ্দিষ্ট দেবতার মহিমা ও পূজা প্রচারের জন্য। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগর, চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সওদাগর, ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহামদ এমনই চরিত্র। মঙ্গলকাব্যের কবিরা এভাবেই প্রথা রক্ষা করেছেন।

১.৭- মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল সম্ভবত তুর্কি আক্রমণ কালে তথা ক্রান্তিকালে। তখন তার আকার বা রূপ কেমন ছিল তা জানা না থাকলেও অনুমান করা হয় যে, তখন মঙ্গল কাব্যের কাহিনীগুলি সংক্ষিপ্ত পাঁচালীর আকারেই বর্তমান ছিল। তারপর আদি মধ্যযুগে আমরা প্রচলিত আকারে পাচ্ছি মঙ্গলকাব্যের একটি ধারা-'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ'কে। অন্ত্যমধ্য যুগে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'চন্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল'। মঙ্গলকাব্য শাখার তৃতীয় প্রধান শাখা 'ধর্মমঙ্গল'কাব্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। মঙ্গলকাব্যের প্রধান চতুর্থধারা 'শিবমঙ্গল', যেটি সাধারণত 'শিবায়ন' নামেই অধিক পরিচিত।'মঙ্গল'নামে অভিহিত হলেও 'শিবায়ন' প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্য নয়। এরূপ একটি ধারা'কৃষ্ণমঙ্গল'-এটি বস্তুত ভাগবতের অনুবাদ। পরে আরো অনেক অনার্য সমাজ থেকে আগত দেবদেবী বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী এবং কাব্যও 'মঙ্গলকাব্য'-র পরিচয় লাভ করেছে, এমনকি দেবোপম নর-নারীর কাহিনী নামেও 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত হয়েছে।

প্রাচীনত্ব, সংখ্যা ও উৎকর্ষের বিচারে মঙ্গলকাব্য গুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-

১) প্রধান মঙ্গলকাব্য , ২) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য,

১) প্রধান মঙ্গলকাব্য :

মনসামঙ্গল :-

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে পড়ে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন।আপাতত যে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের পুঁথি আমাদের হস্তগত হয়েছে তার বিচার বিশ্লেষণ থেকে অনুমিত হয় যে, মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য। এর অন্তত তিনজন গ্রন্থকারকে চৈতন্য পূর্বকালে স্থাপন করা হয়। এঁরা হলেন- নারায়ন দেব, বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই। মনসামঙ্গল কাব্যে এছাড়াও অর্ধশতাধিক কবির নাম পাওয়া গেলেও এঁদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নামই বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। বণিক প্রধান চাঁদসদাগর বা সাধু চন্দ্রধরের পূজা লাভের জন্য দেবী মনসার নিষ্ঠুরতার কাহিনীই এর প্রধান উপজীব্য।

চন্ডীমঙ্গল :-

চন্ডীমঙ্গলও প্রাচীন কাব্য, তবে চৈতন্যপূর্ব যুগের কোন কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই ধারার কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করে থাকেন। অপর কবি দ্বিজ মাধব। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ কাহিনী- একটি ব্যাধসন্তান কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী, অপরটি বণিক ধনপতি সওদাগরের কাহিনী। এই কাব্যে দেবী চণ্ডীর মধ্যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় নেই।

ধর্মমঙ্গল :-

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও বিস্তৃতি রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এর প্রধান কাহিনী লাউসেনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও, পার্শ্ব কাহিনী রয়েছে অনেকগুলি। এতে কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনীও যুক্ত হয়েছে। এই ধারার কবিদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিবায়ন :-

শিবায়ন কাব্যের প্রধান দেবতা পৌরাণিক শিব, অতএব পূর্বোক্ত মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে এর একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।অবশ্য শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি লৌকিক কাহিনীও যুক্ত রয়েছে। এই ধারার কবিদের মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তী, কবি চন্দ্রশংকর চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

২) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য :

অপ্রধান মঙ্গল কাব্যের অনেকগুলিই পৌরাণিক দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার উপলক্ষে রচিত। অতএব এদিক থেকে এগুলিকে মূলধারার বহির্গত বলাই উচিত। এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ধারায় কোন উল্লেখযোগ্য কবির পরিচয় পাওয়া যায় না। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং তাঁর কাব্য অন্নদামঙ্গল এর ব্যতিক্রম। অপ্রধান ধারায় রয়েছে

গঙ্গামঙ্গল- এই ধারার কবিদের মধ্যে আছেন মাধব, দ্বিজগৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গা প্রসাদ প্রমুখ। গৌরীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা পাকুড়ের ভূস্বামী পৃথ্বীরাজ। শীতলা মঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে রয়েছেন-নিত্যানন্দ ও বল্লভ। দুর্গা মঙ্গল কাব্যের কাহিনীকার ভবানীপ্রসাদ, রূপনারায়ন ও রামচন্দ্র। বাসুলিমঙ্গল কাব্য কারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবিচন্দ্র মুকুন্দ। ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের কবি কৃষ্ণরাম, রুদ্র রায় ও শংকর। রায়মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের অনেক ভিড়ের মধ্যে আছেন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, কবিকঙ্কন, সাবিরিদ খাঁ। এই মঙ্গল কাব্য গুলির ছাড়াও রয়েছে- সূর্যমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, গোসানিমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি।

এছাড়া চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল আদি গ্রন্থের সঙ্গে 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত থাকলেও এগুলি বস্তুত জীবনীগ্রন্থ- নাম ছাড়া মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

১.৮- মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাগ

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের যুগ বলা হয়। এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর পূর্ববর্তী মনসামঙ্গল রচয়িতা হরিদত্ত সম্পর্কে বলেছেন-

'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।

হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।

ঘোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।'

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তকে যথোচিত বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন-

'মানিক দত্তেরে বঙ্গ করিয়া বিনয়।

যাহা হইতে হইল গীত পথ পরিচয়।।'

মানিক দত্ত সম্ভবত খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূর ভট্টের নাম স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাতেও দেখা যায় ময়ূরভট্টের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টির যুগ।পরবর্তী যুগের আখ্যায়িকা এই যুগে এসে একটা পরিমিত পরিনতি পেয়েছে। এযুগের প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলকার বিজয় গুপ্ত, নারায়ন দেব, দ্বিজ বংশীদাস ও চণ্ডীমঙ্গলের লেখকেরা দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম এবং ধর্মমঙ্গলের কবি মানিক গাঙ্গুলী, খেলারাম আবির্ভূত হন। এই সময়ে উল্লিখিত শক্তিমান কবিদের হাতে মঙ্গলকাব্যগুলো পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু এই পরিপুষ্ট অবয়বের উপর তখনও শিল্পিত করার কাজ বাকি ছিল। এই যুগে মঙ্গল কাব্যের অপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব পড়ে। তখন হিন্দুসমাজ লৌকিক কাহিনী অপেক্ষা পৌরাণিক কাহিনীতেই বিশ্বাসী ছিল।এইভাবে সেই যুগে মঙ্গলকাব্যে লৌকিক ও পৌরাণিক ঘটনা মিশ্রিত করে মঙ্গলকাব্য আভিজাত্যের স্তরে উঠলো। তবুও তখনও এর ভাষায় ও কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা মুক্ত হয়ে সাহিত্যিক সৌন্দর্য মন্ডিত হতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সাহিত্যিক আভিজাত্য ফুটেছে, যদিও ষোড়শ শতকের মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা উপন্যাসের মতই জীবন্ত।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে ভাবসত্য কম ছিল না।কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে কাব্যিক ব্যায়াম অনেক সময় আধুনিক লেখকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতচন্দ্রের অলংকার ও ছন্দ ছিল আধুনিক যুগের লেখকদের অনুপ্রেরণা। রূপনারায়ণের দূর্গামঙ্গল, মার্কন্ডেয় পুরাণের ভাষানুবাদ ও রতিদেবের মৃগলুব্ধ শিবপুরাণের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। কবিদের মৌলিক কবিত্ব ছিল মধ্যযুগের লৌকিক দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ক্ষেত্রে। মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গলে ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে মানবিক রস পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্নদামঙ্গল নাগরিক কবি ও রাজসভায় লালিত

ভারতচন্দ্রের বাগবৈদগ্ধ্যপূর্ণ রচনা। অন্নদামঙ্গল 'নূতন মঙ্গল' কাব্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার মৌলিকত্ব আছে।তবু এ কথা অনস্বীকার্য, মঙ্গল কাব্যের প্রথম যুগের সৃষ্টিসম্ভার যতটা মানবিক, শেষ পর্যায়ের মঙ্গলকাব্য গুলিতে শিল্পগুন বেশি থাকলেও অবক্ষয়িত সমাজের ছায়া থেকে সেগুলো মুক্ত নয়।

১.৯- মঙ্গলকাব্যগুলিতে ইতিহাসের উপাদান

মঙ্গলকাব্য গুলিতে সমকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। তুর্কি আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়েছিল বহু বৌদ্ধ বিহার ও বিভিন্ন হিন্দু মন্দির। ধর্মমঙ্গল কাব্যে গাজনের শেষ অনুষ্ঠান 'ঘর ভাঙ্গার ছড়া'য় এই ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধ বর্ণনায় ফৌজ মিছিল ও যুদ্ধ সজ্জার বিস্তৃত পরিচয় আছে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ কবি-আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এই অংশে আছে ষোড়শ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থা। গৌড়বঙ্গের সুবাদার উৎকল অধিপতি মানসিংহ ওড়িশার বিদ্রোহী আফগানদের দমন করেছিলেন। মুকুন্দরাম তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন চন্ডীমঙ্গল কাব্যে। সেইসঙ্গে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচার, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের দুরাবস্থা, প্রজাদের সর্ববিধ অসহায়তা, উজির নাজিরদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং গোপীনাথ নন্দীর মতো প্রজাবৎসল শাসকের বিপাকে পড়ার কথাও কবিকঙ্কন এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। সরকারি কর্মচারী এবং পোদ্দার প্রমুখ ব্যবসায়ীদের হাতে দরিদ্র কৃষক ও সাধারন প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না।মুকুন্দরামের আত্মপরিচয় অংশে আমরা তার বিস্তারিত বিবরণ পাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেশের অবস্থা ভালো ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেখানে দারিদ্র ছিল চরম। মোগল শাসন শোষণের বাংলাদেশের ধন-সম্পদ বাইরে চলে যেতে থাকে। আর দেশের মানুষ শুধুই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। ভাত কাপড় জোটানোই ছিল তখন প্রজাদের কষ্টের বিষয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে আছে রাষ্ট্র জীবনের পালাবদলের ইঙ্গিত। আছে বর্গীদের সন্ত্রাস, অত্যাচার ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের উপদ্রবের ইতিহাস।

মধ্যযুগের বাঙালি হিন্দুধর্ম অনুযায়ী উপাধি ব্যবহার করতেন।'ডিহিদার', 'তালুকদার','অধিকারী'উপাধিগুলি এভাবেই চলে এসেছে।শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থও কৃষিকাজে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শিবায়ন কাব্যে শিবকেও আমরা চাষির ভূমিকায় দেখেছি। বিভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুন মঙ্গলকাব্য গুলিতে কবিরা বর্ণনা করেছেন। গর্ভিনী নারীর সাধভক্ষণ, পুত্র জন্মের পর রীতি কানুন পালন, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, নারীদের পতি নিন্দা, ইত্যাদি প্রায় সব মঙ্গলকাব্যে আছে। সমাজে বিধবা বিবাহ ছিলনা। বিজয় গুপ্ত পদ্মাপুরাণে এয়ো স্ত্রীদের গীত গাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন-

'এয়ো আইসে মঙ্গল গাইতে,

তারা সব পান খাইতে,

আর চাইবে তৈল সিন্দুরে।'

এইসব প্রথা ইতিহাস হলেও এখনো সমানভাবেই বজায় রয়েছে।বেচা কেনায়-বাণিজ্যে কড়ি, বুড়ি অর্থাৎ ৫ গন্ডা পয়সার এবং তঙ্কার ব্যবহার ছিল।মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল,ধর্মমঙ্গল কাব্যে বণিকদের ব্যবসার কারণে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায় জলদস্যু ফিরিঙ্গিদের ভয় ছিল, ছিল শুল্ক আদায়ের রীতি।

বাণিজ্য নৌকারও বিচিত্র চিত্র রয়েছে। নানা দৈর্ঘ্যের নৌকা তৈরি হত। নৌকার দৈর্ঘ্য, নৌকার গলুইতে আঁকা ছবি অনুসরনে অনেক রকম নাম থাকত নৌকার যেমন বিশহাথী, বাইশা, সিংহমুখী, হংসমুখী ইত্যাদি। আবার যুদ্ধ নৌকার নাম ছিল-রনজয়, নরভীমা ইত্যাদি। বিলাস তরীর নাম ছিল-চন্দ্রপান, হীরামুখী। সাওদাগরী নৌকা-মধুকর।

মঙ্গলকাব্যের কবিগন সুযোগমতো তাঁদের এবং সমকালের বিদ্যাশিক্ষার ইতিহাস জানিয়েছেন। মুসলমান পন্ডিত থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেরই ব্যাকরন, ন্যায় শাস্ত্র, কাব্য ছন্দ এমনকি কিছু সংস্কৃত ফারসি পড়তে হতো। এমন বিদ্যাচর্চার জন্য টোল, চতুষ্পাঠী ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যপাঠের বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর আত্মকাহিনীতে-

' রঘুরাম ভট্টাচার্য্য কবি চন্দ্রের পো,

খুঙ্গি পুঁথি দেখিয়া জন্মিল মায়া মো।

বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে,

অমর জুমর ভেদ হইল অল্পদিনে।

মাখ রঘু নৈষধ পড়িল হরষিত,

পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত।'

১.১০- অনুশীলনী

১) মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২) মঙ্গলকাব্য গুলিতে অনার্য দেব-দেবীরা কিভাবে আর্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার বিবরণ দিন।

৩) মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা ও নামকরণের কারণগুলি আলোচনা করে মঙ্গলকাব্যের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪) মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন লক্ষণগুলি নির্দেশ করুন।

৫) মঙ্গল কাব্য রচনা ধারা বলতে কী বোঝায়? এই ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৬) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৭) মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেণীবিভাগ করে কোন ধারাকে আপনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তা আলোচনা করুন।

৮) মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক-রীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৯) টীকা লিখুন : মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক উপাদান।

১.১১- গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, প্রথম খন্ড।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খন্ড।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) প্রথম পর্ব- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়)- শ্রী ভূদেব চৌধুরী।

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

একক ২- মনসামঙ্গলের বিভিন্ন দিক

বিন্যাসক্রম

২.১- মনসা দেবীর উদ্ভাবনের কারণ ও মনসা নামের উদ্ভব

২.২- মনসামঙ্গলের কাহিনী

২.৩- বাংলায় মনসা মঙ্গলের ত্রিধারা ও কবিগন

২.৪- মনসামঙ্গলের প্রথম যুগের কবিকুল

২.৫- মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যকৃতির পরিচয়

২.৫.১- নারায়ন দেব

২.৫.২- বিজয় গুপ্ত

২.৫.৩- বিপ্রদাস পিপলাই

২.৫.৪- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

২.৬- চৈতন্য পর্বের মনসামঙ্গল কাব্য

২.৭- মনসামঙ্গলের চরিত্র বিচার

২.৮- মনসামঙ্গলের সমাজ চিত্র

২.৯- অনুশীলনী

২.১০- গ্রন্থপঞ্জি

২.১- মনসাদেবীর উদ্ভাবনের কারণ ও মনসা নামের উদ্ভব

মনসামঙ্গল আদি মধ্যযুগের প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের পরেও মনসামঙ্গল কাব্য লেখা হয়েছে। নিগৃহীত জাতির মর্মবেদনা যেন জীবন্ত রূপ ধরেছে চাঁদ সদাগরের বিদ্রোহী স্বভাবের গভীরে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের নানা প্রসঙ্গে চাঁদ সদাগরের কথা উল্লিখিত।শুধু তাই নয় চন্ডীমঙ্গলের বণিক খন্ডের নায়ক ধনপতি এমনকি ধর্মমঙ্গলের লাউসেন চরিত্রের পরিকল্পনাতেও চাঁদ সদাগরের চরিত্রের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়।

মনসাদেবীর উদ্ভাবনের কারণ :-

অর্থশাস্ত্রে সর্পদেবতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদে। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, সর্প শব্দের ব্যবহার যজুর্বেদেই প্রথম পাওয়া যায়। যজুর্বেদের কাল থেকে আমরা সর্প নামক প্রাণীটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। ভারতবর্ষে আর্যপূর্ব কাল থেকেই সর্প ভীতি ছিল। বাংলা আদিম অনার্য অধিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়রা ছিল এক প্রধান শাখা। দাক্ষিণাত্যের নিম্নবর্গীয় দ্রাবিড় ভাষীদের মধ্যে সর্প পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। বাংলার দ্রাবিড় অধিবাসীদের কাছ থেকেই সর্বপ্রধান তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

১) নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর সরীসৃপ মূর্তিপূজা বিশেষভাবে উত্তর ভারতে ও মধ্য ভারতে প্রচলিত।

২) দক্ষিণ ভারতের জীবন্ত সর্প পূজার আদর্শই প্রবল।

৩) বাংলাদেশে সর্প পূজার কেন্দ্রে আছেন নারী রুপা সর্পদেবতা জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে এর পরিচয়। অবশ্য বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় স্থানেই সর্প-প্রতীক পূজার রীতি আছে। এই প্রতীক হিসেবে কখনো 'মনসার ঘটে' নানা আকৃতির সর্প ফনা আঁকা হয়। কখনো ফনিমনসা গাছের ব্যবহারও দেখা যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সর্পদেবী হলেন দেবী মনসা। সর্প দেবী রূপে এই মাতৃকা মূর্তির পরিকল্পনা বাংলার সর্প পূজার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মনসা নামের উদ্ভব :-

'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'মনসা' নামের উৎপত্তির মূল কারণটি অজ্ঞাত। 'মনসা' নামটি সম্বন্ধে সন্ধান করে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তা হল- দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট অঞ্চলে এক নিম্নবর্গীয় জাতি "মনে মঞ্চমা" নামে এক সর্পিনীর পূজা করত। এই 'মঞ্চ' থেকেই মনসা নামের উৎপত্তি বলে অনুমিত হয়। আবার পাণিনির ব্যাকরণে 'মনসো নান্মী' সূত্রেও মনসা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,ছোটনাগপুরের সিংভূম মানভূম বীরভূম ইত্যাদি জেলা থেকে 'মনসা' নামটি বাংলায় সম্প্রসারিত হয়েছিল। কোন কোন সংস্কৃত পুরাণে 'মনসা' নামের সামান্য পরিচয় বিদ্যমান।নানা দেব ভাবনা ও রূপ কল্পনার নানা দিক-দেশাগত কাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে মনসা মূর্তির উদ্ভব হয়েছে। এমনকি বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতিতেও মহামায়ূরী দেবী বা 'জাঙ্গুলী তারা'নামে দেবীর কথা শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- "প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থেই যেন সর্পের দেবীর বেশি উল্লেখ আছে। 'বিনয় বস্তু'ও'সাধনমালা'নামে দুখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের সর্পের দেবীর স্পষ্ট বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা'য় দেবীকে'জাঙ্গুলী' বা 'জাঙ্গুলী তারা' বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে সাপের রোঝাকে বলা হত 'জাঙ্গুলীক'।"প্রাচীন পুরান ও মহাভারতে যে সর্পদেবীর উল্লেখ আছে তিনি হচ্ছেন জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক তাঁর পুত্র। পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার উল্লেখ আছে। আর্য সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। আর্য দেবতারা তাই প্রায়ই পুরুষ। বাংলাদেশের সর্পদেবীর এই মাতৃ-মূর্তি অনার্য সমাজ থেকেই এসেছে। বৌদ্ধ যুগের জাঙ্গি নামক দেবতা সর্প মাতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান বাংলাদেশ। সর্পদেবী মনসার ধ্যানে তাঁকে 'ফণিময়ী', 'বিষহরি'নামের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ পূর্ব কোন অরণ্য জাতির পূজিতা দেবী ছিলেন জাঙ্গুলী। তবে বাংলাদেশে সর্পদেবী বিষহরি ও মনসা নামে পরিচিত।

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। মূলত কৌমসমাজে প্রজনন শক্তির পুজো সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মনসা মূর্তির ক্রোড়ে একটি ফল

দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বা পূর্ণ ঘটের উপর মনসার প্রতিকৃতি আঁকা হয়। এদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক। 'মুদামা' নামে এক দক্ষিণী সর্পদেবীর প্রভাব আছে মনসার নাম ও রূপ কল্পনায়।

পাল আমল থেকেই মনসা-দেবী উচ্চশ্রেণীর সমাজে স্বীকৃতি পান। সেন আমলে এই মনসা দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অর্বাচীন পুরানগুলিতেও এই সময়ে মনসা নামক দেবীর পরিচয় অনার্য মনসা দেবীর আর্যীকরনের ফল।

মনসামঙ্গল কাব্য দীর্ঘকাল জনপ্রিয়তার জোয়ারে জীবিত ছিল। তার কারণ এই কাব্য ছিল অশ্রুভারাতুর মানব সংবেদ্য। অনেকদিন আগে থেকেই বাস্তুদেবতা, আরোগ্যের দেবতা ও সম্পদের দেবতা বলে যে দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, সেই দেবীই মানুষের অনুরাগ-এর আহবানে সারা দিয়ে মনসা বা সর্পের দেবী নাম নিয়ে আবির্ভূতা হলেন কবিমানসে।

২.২- মনসামঙ্গলের কাহিনী

মনসামঙ্গলের প্রচলিত লৌকিক কাহিনীটি এইরকম- শিবের সন্তান লাভের বাসনা থেকে মনসার জন্ম। কালীদহে পদ্মপাতায় জন্ম হলে তার এক নাম পদ্মা। পত্নী চণ্ডীর ভয় শিব কন্যাকে ঘরে নিয়ে গেলেন না। মনসা আশ্রয় নিলেন পাতালে। সর্পেরা তাঁকে রানী করে রাখলো পাতালে। তিনি হলেন সর্প কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে শিব পরিত্যক্ত কন্যা মনসার পরিচয় পেলেন। মনসাকে তিনি কৈলাসে নিয়ে এলেন। কোপন স্বভাব মনসার সঙ্গে বিমাতা চণ্ডীর কলহের ফলে তার একটি চোখ কানা হয়ে যায়। তাই তিনি চাঁদ সদাগরের দ্বারা গালিচ্ছলে 'কানী'বলে নিন্দিত হয়েছেন। অশান্তি দূর করার জন্য শিব মনসাকে সিজুয়া পর্বতে রেখে এলেন। কন্যার জন্য শিবের চোখ থেকে এক ফোটা জল ঝরে পড়লো। সেই জল থেকে জন্ম নিল মনসার সহচরী নেতা। এক সময় সমুদ্রমন্থনজাত বিষপানে শিবের মৃত্যু ঘটলে মনসা তাঁকে বাঁচিয়ে দেন। ফলে শিব জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিয়ে দেন। কিন্তু বৈরাগী স্বামী হঠাৎ সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন।স্বামী ঘরে নেই তাই মনসা সহচরী নেতার পরামর্শে মর্ত্যধামে নিজো পূজা প্রচারের জন্য উদ্যোগী হলেন।

এই কারণে মনসা প্রথমে রাখাল প্রভৃতি নিম্নবর্ণের কাছ থেকে বলপূর্বক পূজা আদায় করলেন। কিন্তু তখন উচ্চতর সমাজে স্ত্রী দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল না। সমাজে সম্পন্ন বলতে বণিকদের কেই বোঝাতো। চম্পকনগরের বিত্তশালী ও সর্বজনমান্য বণিক ছিলেন চাঁদ সওদাগর। মনসা ভাবলেন চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে নিজের পুজো প্রচার করলে অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সহজেই মনসার ভক্ত হয়ে উঠবে। অতএব চাঁদের পূজো আদায় করতে সচেষ্ট হলেন মনসা। স্ত্রী সনকা, ছয় পুত্র ও পুত্রবধূ, দাস-দাসী, সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে চাঁদের বিরাট সুখের সংসার। তিনি একজন একনিষ্ঠ শিবভক্ত। শিবের বরে 'মহাজ্ঞান কবচ'লাভ করেছেন চাঁদ। এর সাহায্যে মৃত ব্যক্তি প্রাণ লাভ করতে পারে। তাছাড়া বিখ্যাত শংকর ওঝা ছিলেন চাঁদের পরম বন্ধু।

চাঁদ সাপকে পছন্দ করেন না। হেতালের লাঠি দিয়ে তিনি সাপ মারতেন। এহেন চাঁদের কাছ থেকে পূজা আদায় করা মনসার পক্ষে কঠিন কাজ ছিল। জেলে, রাখাল প্রভৃতি সাধারণ মানুষ মনসার পূজো করে সুখে আছে জেনে চাঁদের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার ঘট স্থাপন করে পূজা করতে লাগলেন। এ ব্যাপার জানতে পেরে চাঁদ পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙে দিলেন। ক্রুদ্ধ মনসা চাঁদের অনিষ্ট সাধনে ব্রতী হলেন। চাঁদের সুন্দর বাগান বাড়ি ধ্বংস হলো। মহাজ্ঞানী দ্বারা চাঁদ মহাজ্ঞান পুনরুদ্ধার করলেন। তখন মনসা কৌশলে শংকর ওঝাকে মেরে ফেলে মোহিনী নারীর ছদ্মবেশে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করলেন। ভাতে বিষ দিয়ে মনসা চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করলেন। স্ত্রী ও পুত্র বধূদের কান্নায় ও হা হা কারে আকাশ বাতাস ভরে উঠলো। তবুও চাঁদ এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মুখে এক অটল পৌরুষের প্রতিমূর্তি হয়ে রইলেন। সদম্ভে চাঁদ ঘোষণা করলেন-

'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।

সেই হাতে নাহি পূজি চ্যাঙমুড়ি কানি।'

কিছুদিন পর চাঁদ বাণিজ্যে বেরোলেন। যাবার সময় সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে বলে গেলেন-

'পুত্র হইলে নাম থুইও লখিন্দর।'

কালীদহে মনসার কোপে প্রচন্ড ঝড় উঠল। চাঁদের ব্যবসার তরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবে গেল। চাঁদ জলে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। চাঁদ মারা গেলে মনসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তিনি চাঁদের সামনে পদ্মফুল ফেলে দিলেন। চাঁদ তা স্পর্শ করলেন না-

'চাঁদ বলে এই পদ্মে মনসার জন্ম।

হেন পদ্ম পরশিলে অনেক অধর্ম!'

অনেক দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ভোগ করে চাঁদ দেশে এলেন। বড় হয়েছে চাঁদ সদাগরের সপ্তম পুত্র লখীন্দর। উপযুক্ত সময়ে উজানী নগরে সায়বেনের নিত্যগীতপটিয়সী পরমাসুন্দরী কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিয়ে হল। চাঁদ আগে থেকে জেনেছিলেন সর্পদংশনে লখীন্দরের মৃত্যু অনিবার্য। তাই সান্তালী পর্বতে এক লোহার নিশ্ছিদ্র বাসর ঘর তৈরী করলেন। মনসার প্রলোভনে কারিগর (মতান্তরে বিশ্বকর্মা) লখীন্দরের লোহার বাসর ঘরে একটি চুল প্রমান ছিদ্র রেখে দিয়েছিলেন। বাসর ঘরে কালীয় নাগের দংশনে লখীন্দর প্রাণ হারান। চাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। সনকা কাঁদতে কাঁদতে বেহুলা কে তিরস্কার করলেন কঠিন ভাষায় :

'সনোকা কান্দিয়া দেয় বেহুলার গালি।

সিঁতার সিঁদূর তোর না পড়িল কালি।।

খন্ড কাপালিনী বেহুলা চিরুনী-দাঁতী।

বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি।।'

কিন্তু জেদী চাঁদের চোখের জল মহাক্রোধে আগুন হয়ে জ্বলতে লাগলো। 'কানী'র উচ্ছিষ্ট পুত্রকে ঘরে রেখে আর কোনো লাভ নেই জেনে কলার ভেলায় করে লখীন্দরের শব দেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ হতে লাগল। তখন সতী শিরোমনি বেহুলা

ওই ভেলায় স্বামীর শবের পাশে ঠাঁই করে নিল। তার পণ-সে স্বর্গে গিয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনবে, আর তা না হলে আর সে ফিরে আসবে না।

জলপথে বেহুলা কে নানা বিপদে পড়তে হল, মনসার ক্রোধও তাকে অনুসরণ করতে লাগল।নানা প্রলোভন জয় করে অসাধারণ সতী ধর্মের জোরে বেহুলা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছল।তারপর দেবতাদের নৃত্যগীতে তুষ্ট করে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইল।শিবের নির্দেশে অনিচ্ছার সঙ্গে মনসা লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেন। তবে তিনিও বেহুলাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, বেহুলা ফিরে গিয়ে শ্বশুরকে দিয়ে মনসার পূজো করাবে, এই কথা বেহুলাকে দিতে হল।কারণ চাঁদসদাগর দেবীর পুজো না করলে মর্ত্যে উচ্চবর্ণের মধ্যে মনসার পূজা প্রচারিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বেহুলা তাতেই সম্মত হল। তার স্বামী লখীন্দর বেঁচে উঠল, ছয় ভাসুর প্রাণ ফিরে পেল,শ্বশুরের নিমজ্জিত বাণিজ্যের নৌকাও জলে ভেসে উঠল। জয়ধ্বনি সহ সে স্বামীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি হাজির হল। চাঁদের পরিবারে চাঁদের হাট বসে গেল।প্রথমটা চাঁদসদাগর মনসার পূজার ব্যাপারে বেঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু মনসার রক্তচক্ষুকে অবহেলা করলেও তিনি পুত্রবধূ বেহুলার অশ্রু কাতর মিনতি এড়াতে পারলেন না- মনসার পূজায় কোনো প্রকারে রাজি হয়ে গেলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলেও, তিনি যে খুব একটা ভক্তির সঙ্গে মনসার পূজা করেছিলেন তা মনে হয় না। তিনি ডান হাত দিয়ে দেবীর পূজা করতে কিছুতেই রাজি হলেন না। কারণ ডান হাত দিয়ে তিনি মহাদেবের পুজো করেন, তাই ওই হাত দিয়ে তিনি স্ত্রী দেবতার পূজা করতে পারবেন না। তাই বাম হাত দিয়ে দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করেন এবং তা একপ্রকার তাচ্ছিল্যভরে। অবশ্য তাতেই দেবীকে খুশি হতে হল- কারণ এর ফলে তিনি উচ্চ সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন। বেহুলা-লখীন্দরের দ্বারা দেবী মনসার পূজা মর্ত্যধামে প্রচার লাভ করল। কিন্তু আসলে বেহুলা-লখীন্দর স্বর্গের দেবদেবী- ঊষা ও অনিরুদ্ধ।দেবের অভিশাপে মর্ত্য জন্মগ্রহণ করে তারা দেবী মনসার পূজার প্রচারে সাহায্য করল, তারপর শাপের অবসানে স্বর্গের দেবদেবী স্বর্গে ফিরে গেলেন। এই হল মনসামঙ্গলের কাহিনীর সূত্র।

২.৩- বাংলায় মনসামঙ্গলের ত্রিধারা ও কবিগন

বাংলার নানা অঞ্চলে এবং বাংলার বাইরে মনসামঙ্গল কাহিনীর অল্পস্বল্প বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ ভারতের লোকসাহিত্যও মনসামঙ্গলের অনুরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বিহারে মনসামঙ্গলের আখ্যান হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে, সেটিও অনেকটা বাংলার মত, মনে করা হয় এই গুলি বাংলার প্রভাবেই পরিকল্পিত হয়েছে। বাংলায় মনসামঙ্গল কাব্যের তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল-

১) রাঢ়বঙ্গের ধারা:-

কবিগন : বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র প্রমুখ।

২) পূর্ববঙ্গের ধারা:-

কবিগন : নারায়ন দেব, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ।

৩) উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা :-

কবিগন : তন্ত্র বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল প্রমুখ।

পূর্ববঙ্গের ধারাটি 'পদ্মপুরাণ' নামে পরিচিত। কাহিনীর দিক থেকে উত্তরবঙ্গের ধারা একটু পৃথক ধরনের। এতে ধর্মমঙ্গলের বেশ প্রভাব রয়েছে।

২.৪- মনসামঙ্গলের প্রথম যুগের কবিকুল

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কানা হরিদত্ত ছিলেন বাংলা মনসামঙ্গল ধারার প্রথম কবি।বিজয় গুপ্ত ছাড়া পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের উল্লেখ থেকেও কানা হরিদত্তর প্রাচীনতার পরিচয় আবিষ্কার করা চলে। ইনিও শ্রদ্ধার সঙ্গে হরি দত্তের ঋণ স্বীকার করেছেন।মনসামঙ্গল কাব্যের সন-তারিখ যুক্ত প্রাচীনতম পুথির লেখক বিজয়গুপ্ত পূর্বতম কবি কানা হরিদত্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন-

'মূর্খে রচিল গীত না জানে বৃত্তান্ত।

প্রথমে রচিত গীত কানা হরিদত্ত।।'

বিজয় গুপ্তের রচনার সময় কানা হরিদত্ত-এর কাব্য লুপ্ত যদি নাও হয়ে গিয়ে থাকে, তবু অতিপ্রাচীন হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।এদিক থেকে হরি দত্তের রচনাকে অন্তত দুই শতাব্দি পূর্বের বলে মনে করলেও সম্ভবত কানা হরিদত্ত খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত। কানা হরিদত্ত-এর রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথির হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর কাব্যের 'পদ্মা' ময়মনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে কানা হরিদত্তর পরেই নারায়ন দেবের নাম উল্লেখ করা হয়। মনসামঙ্গল কাব্যধারার শুধু একজন সুপ্রাচীন কবিই তিনি নন, এই কাব্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। নারায়নদেবের কবি প্রতিভার খ্যাতি বিস্তৃত হয় পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করে রাঢ় অঞ্চল ও আসামে। নারায়ন দেবের পূর্ণাঙ্গ পুথি এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' সিদ্ধান্ত করেন, নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। ড. সুকুমার সেনের মতে, ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় নারায়ণ দেব তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন।

২.৫- মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যকৃতির পরিচয়

২.৫.১ : নারায়ণদেব

কবি পরিচয়ঃ কবি নারায়ণদেব ছিলেন বাঙলার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী । তিনি তাঁর গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ রাঢ়দেশে বসবাস করলেও পরে বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই বোরগ্রাম বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। কবির পিতার নাম নরসিংহ দেব এবং মাতা রুক্মিণী দেবী। কবি কায়স্থবংশোদ্ভূত। তাঁর কাব্যে কোন কালবাচক ভণিতা না থাকায় তাঁর জীবৎকাল-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তবে বিভিন্ন বহিঃপ্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে এ বিষয়ে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।কবির "পদ্মাপুরাণ" কাব্যে এইভাবে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটিত

"নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মুগধি।

মিশ্র-পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদি ॥

পিতামহ উদ্ধব, নরসিংহ মোর পিতা।

মাতামহ প্রভাকর, রুক্মিণী মোর মাতা ॥

পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।

রাঢ় ত্যাজিয়া মোর বোরগ্রাম বসতি ॥"

তাঁর কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পুথি অবলুপ্ত। কাব্যটি সংক্ষিপ্ত, বিভিন্ন গায়েনের হস্তক্ষেপে তার অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাব্যে কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা ও বর্ণনাভঙ্গীর আঙ্গিকগত অসংলগ্নতা থাকলেও ভাবকল্পনার দৃঢ়নিবদ্ধ সংহতি সুস্পষ্ট।

কবির কালঃ-

কবির বংশধরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বংশতালিকা-অনুযায়ী কবি সাম্প্রতিক কাল থেকে অন্তত পাঁচশ বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ কিংবা কোন প্রভাবচিহ্ন না থাকায় তাঁকে চৈতন্যপূর্ব যুগে সংস্থাপন করা চলে । বিজয়গুপ্তের কাব্যে যেমন পূর্ববর্তী কবি হরিদত্তের উল্লেখ রয়েছে, নারায়ণদেবের কাব্যে তেমন কোন পূর্ববর্তী কবির উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা চলে যে তিনি হয়তো বা বিজয়গুপ্তেরও পূর্ববর্তী ছিলেন, এ ছাড়া তাঁর কাব্যে এমন কিছু অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা রয়েছে, যা থেকে অনুমান করা চলে যে মনসামঙ্গল কাব্যের তেমন কোন ধারা সৃষ্টি হবার পূর্বেই তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্যটি যে শ্লথবদ্ধ, তা থেকেও অনুমান করা চলে কাব্যক্ষেত্রে ইতিপূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ রূপের সাক্ষাৎ তিনি পান নি। এই সমস্ত বহিঃপ্রমাণ থেকে এ কথাই মনে করা চলে যে, নারায়ণদেব চৈতন্য-পূর্ব যুগে সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ড. সুকুমার সেন কবিকে ষোড়শ শতকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্ত তিনি এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপিত করেন নি, কিংবা কাল বিচারও করেননি।

জনপ্রিয়তাঃ-

কবি নারায়ণদেবকে নিয়ে আরো কটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। অসমীয়া ভাষায়ও নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়, তাই অসমীয়াগণ কবিকে অসমীয়া বলে দাবি ক'রে থাকেন। নারায়ণদেব বাঙলাদেশের যে অঞ্চলে বসবাস করতেন, তা আসামের অতি সন্নিহিত অঞ্চল। কবি যে কালে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়, সেকালে পূর্ব-ময়মনসিংহের ভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পার্থকা অতি সামান্যই ছিল। কবির জনপ্রিয়তার কারণে অতি সহজেই তাঁর কাব্যের ভাষাকে অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর ছিল। সম্ভবত অসমীয় ভাষায় এইরূপ রূপান্তরিত গ্রন্থের আধিক্য হেতুই আসামবাসীগণ কবিকে অসমীয়া বলে দাবি ক'রে থাকেন। কিন্তু কবি যে বঙ্গদেশীয়, তা আত্মপরিচয়-সূত্রে তিনি নিজেই বলে গেছেন।

বাইশা বা বাইশ কবির মনসামঙ্গলঃ-

কবি নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত কোন সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাঁর বহু গ্রন্থে 'সুকবিবল্লভ' ভণিতা থেকে অনুমিত হয় যে এটি ছিল কবির প্রাপ্ত উপাধি। এমন বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার বেশির ভাগ ভণিতা কবি নারায়ণদেবের হলেও তাতে আরো বহু কবির ভণিতাই 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল'-এ যুক্ত রয়েছে। এ জাতীয় মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে “বাইশা” বা “বাইশ কবির মনসামঙ্গল” নামে অভিহিত করা হয়। এর মূলভিত্তিতে রয়েছেন কবি নারায়ণদেব। নারায়ণদেবের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণেই যে অপর কবিরাও তাঁদের রচনা নারায়ণদেবের কাব্যে প্রক্ষিপ্ত করে কালজয়ী হবার স্বপ্ন দেখতেন, এ ধারণা সম্ভবত অবাস্তব নয়। নারায়ণদেবের এই জনপ্রিয়তা তাঁর সার্থকতারই পরিচয় বহন করে।

কাহিনী সূত্রঃ-

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি কে প্রথম কোথা থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তা জানা যায় না। তবে নারায়ণদেব একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি সংস্কৃত পুরাণ থেকে তাঁর কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান কালে প্রচলিত কোন সংস্কৃত

পুরাণেই এ জাতীয় কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় না। কবির উক্তি যদি যথার্থ হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, কবি যে সংস্কৃত পুরাণ বা উপ-পুরাণ থেকে কাহিনীটি গ্রহণ করেছিলেন, তার সম্ভবত বিলুপ্তি ঘটেছে কাহিনী সূত্র অপর অনেক পুরাণ বা উপপুরাণের মতোই। লোক-কবিদের গানের মধ্যে প্রচলিত লোক-পুরাণ এই মঙ্গল-কাহিণীর অবলম্বন হয়ে থাকতে পারে তবে নারায়ণদেব-বর্ণিত মনসামঙ্গলের সঙ্গে অপর সকল মনসামঙ্গলেরই মোটামুটি কাহিনীগতমিল এক থাকায় অনুমিত হয়, মনসামঙ্গলকারদের মধ্যে কোন একজন যে কোন সূত্রে কাহিনীটি পেয়েছিলেন, অপরেরা তার অনুসরণ করেছেন। অথবা এঁরা প্রায় সকলেই কোন একটি সাধারণ উৎসমূল থেকেই কাহিনীটি গ্রহণ ক'রে নিজেদের রুচি ও সামর্থ; অনুযায়ী তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্ধকার ঘরে কালো বিড়াল খুঁজে বার করার মতই এ বিষয়ে যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করা এক দুরূহ ব্যাপার ।

কাব্য-বৈশিষ্ট্যঃ-

কাব্যসাহিত্যে একমাত্র নারায়ণদেবের সৃষ্ট চাঁদসদাগর-চরিত্রটিই আপন দৃপ্ত পৌরুষে এবং সমুন্নত কাব্য-বৈশিষ্ট্য মহিমায় মাহাত্ম্য- সমর্থ হয়েছে। কাহিনীর প্রয়োজনে নারায়ণদেবের চাঁদসদাগরও মনসার চরণে অঞ্জলি দিয়েছেন, কিন্তু আপনার মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিয়ে শ্রদ্ধাভরে তার মাথা নত করেননি। দেব-মানুষের অসম দ্বন্দ্বে দেবতার নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতার দাপটে তিনি পরাজয় স্বীকার করেছেন, কিন্তু আত্মিক জয় ছিল তারই। আঙ্গিকগত অসংলগ্নতা থাকলেও ভাবকল্পনার দৃঢ়নিবদ্ধ সংহতি সুস্পষ্ট। নারায়ণদেব মনসামঙ্গল কাব্যের "কবি সার্বভৌম" রূপে স্বীকৃত। তার কারণ (১) যে যুগে ধর্মের মনের উপর একাধিপত্য ছিল, সেই যুগে তিনি ধর্মের ভেতর থেকে চিরন্তন মানবাত্মার সুখদুঃখের সন্ধান করেছেন। (২) অত্যাচারিত অপরাজিত বীর্যের সুস্পষ্ট ছবি একমাত্র তাঁর কাব্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যের অন্তিম স্তবকে অন্যান্য কবিরা যেখানে মনসাভক্তির বেদীমূলে নমনীত পূজারী চন্দ্রধরের চিত্রাঙ্কনে মুগ্ধীবিবশ, সেখানে একমাত্র এই সত্যসন্ধ কবি নারায়ণদেবই তার জ্বলন্ত পৌরুষের ছবি আকায় ব্যাপৃত। চরিত্র সৃষ্টিতেও কবি উত্তমর্ণের মহিমা স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। তাঁর

চন্দ্রধর চরিত্রে যে প্রধান রাগটি সঙ্গীতায়িত তা হলো মানবের আদিম পৌরুষ। দৈবশক্তির অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে প্রতিহিংসালিপ্সু মানবের চিরন্তন পৌরুষের প্রতীকরূপে তাঁর চন্দ্রধর চরিত্র "মুহূর্তের দীপে শাশ্বত শিখায়" উদ্ভাসিত হয়েছে আঙ্গিকগত অসংলগ্নতা থাকলেও ভাবকল্পনার দৃঢ়নিবদ্ধ সংহতি সুস্পষ্ট।

"ডাল মূল গেল মোর মৈদ্ধ হৈল সার।

এখন কানির সনে চাপিয়া করোঁ বাদ ॥

জাদি কানির লাইগ পাম একবার।

কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার।।"

সে শোকে উন্মাদ, প্রতিহিংসায় ভয়ঙ্কর, স্বার্থে সঙ্কীর্ণচিত্ত, কিন্তু সর্বত্রই আত্মগোপনে অক্ষম। স্ব প্রকাশ-মানবতার মহিমায় ভাস্বর তার মনোবেদনা-

"চান্দো বলে এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।

তাহা হইতে অধিক দুঃখে কলা জাইব কাটা।।"

শুধু চাঁদসদাগর নয়, বেহুলার চরিত্রাঙ্কনেও তাঁর পরিচয় সমুজ্বল। শুধু গৃহাঙ্গনা নয়, আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয়ে তিনি অদ্বিতীয়া। তাই "সাথীহারার গোপন ব্যথায়" অন্তর্লোক বেদনামথিত হলেও তার অন্তরে যে সংকল্পের সঙ্গীত সুরধ্বনিত তা-

"জাদি বেউলা হম সতি সাহসে জীয়াব পতি।

জেন জম ঘোষয়ে সংসারে ॥

জাইব দেবের পুরি রঞ্জায়িব বিষহরি।

আমি জাইয়া জিনিব মনসারে ।। "

বেহুলা এখানে চিরন্তন নারীর প্রতিনিধিরূপে রেখায়িত। মনসা, লখিন্দর ও অন্যান্যও অনুপেক্ষণীয়। মনসামঙ্গল কাব্য মানুষের বেদনাময় অনুভূতির কাব্যসম্মত রুপায়ণ।

সেই বেদনা-বিহ্বল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা নারায়ণদেবের কাব্যেই অধিকমাত্রায় অভিব্যক্ত, যেমন বেহুলার মর্মস্পর্শী বিলাপ স্মরণীয় -

"জাগ প্রভু কালিঙ্গী নিশাচরে।

ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে ॥

তুমিত আমার প্রভু আমি যে তোমার।

মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার॥"

অন্যান্য কবিদের কাব্যে চাঁদসদাগরের অবিশ্বাস্য হৃদয়হীনতার জন্য যা অবরুদ্ধ, নারায়ণদেবের কাব্যে .সেই বেদনা শতধারায় উচ্ছসিত। একদিকে সংকল্প-বিচ্যুতির , অপরদিকে স্বজনহারানোর সর্বহারা অন্তরের নিঃস্ব আকুতি-এই উভয়ের চাঁদসদাগর বারিধৌত বনস্পতির মতই দণ্ডায়মান। তার সাজানো বাগান ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। তার সাধের সংসার বিষাদপুরীতে পরিণত হোলো। চারিদিকব্যাপী মহাশূন্যতার মধ্যে একটি বৃহৎ বনস্পতি মহাশূন্যতার মধ্যে একটি বৃহৎ বনস্পতি তার পত্রহীন শাখাপ্রশাখাগুলি রৌদ্দজ্বলময় আকাশের দিকে প্রসারিত করে তার ভগ্ন হৃদয়ের যে নীরব আর্তি জানিয়ে যাচ্ছে তা যেন অনন্তকালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে কৌতুকরসের প্রকাশও নারায়ণদেবের কাব্যে দেখা যায়, যেমন ডোমনী চণ্ডীর মহাদেবকে ব্যঙ্গ-

"বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।

কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকাবেল "

তাঁর কাব্যে যে বেহুলার প্রত্যাবর্তন কাহিনী দৃশ্যমান, তার কারণ এটি একটি রূপক। ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের আদর্শে বীর বা বীরাঙ্গনা মৃত্যুর পর তার পুনর্জীবনপ্রাপ্তি না দেখালে কাব্য হয় না। তাই তাদের প্রত্যাবর্তনের বৃত্তান্ত কাব্যের সঙ্গে যুক্ত। বেশিরভাগ কবির রচনায় রূপকের সঙ্গে সত্যের ব্যবধান অবলুপ্ত। কিন্তু নারায়ণদেব সেখানে সফলকাম শিল্পী। লখিন্দরের পুনজীবনলাভে চাঁদের মনে একটা সংঘাতের আবির্ভাব

ঘটেছে। তাই সবাইকার অনুরোধে চাঁদ যখন মনসার পূজা না করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন তার মনে অসহায়া বেহুলার মুখছবি গভীরভাবে দাগ কাটতে আরম্ভ করেছে। এখানে সে পুত্রবধূ নয়, সে ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক। আর সেই মানবাত্মার প্রতি সহানুভূতিতে চাঁদ আজন্মপূজিত আদর্শের অটুট নিষ্ঠা ত্যাগ করে ব্যথিত মানবাত্মার বেদনাবোধকে স্বীকার করে নিয়েছে। তবুও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তার শাশ্বত পৌরুষ পরিস্ফুট -

"চাঁদ বোলে- তোমা পারি পুজিবারে।

আমার নাম চাঁন্দোয়ায় টাঙ্গাও তো উপরে ॥"

বাংলা সাহিত্য যখন কোন রকমে অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন এরকম একটি চরিত্রসন্ধান বিস্ময়কর ব্যাপার। আর ততোধিক বিস্ময়কর কাব্য মধ্যে তাকে জীবন্তভাবে অঙ্কন করা। নারায়ণদেবের কাব্য পৌরাণিক সাহিত্যের পরিবেশ-শাসিত রুচি-নিষ্ঠার ফসল। কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে তা ব্যক্ত হয়েছে। পাণ্ডিত্য কবিত্ব প্রকাশে বাধা না হয়ে এখানে সহযোগসূত্রে আবদ্ধ। বাংলার ঘর ও বাহিরকে এমনভাবে একাকার করে নেওয়ার ক্ষমতা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কবিদের মধ্যে বিরলদৃষ্ট।

২.৫.২ : বিজয়গুপ্ত

মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তি । তাঁর কাব্যকে তিনি 'পদ্মাপুরাণ' নামে অভিহিত করেছেন। কবি কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সনাতন, মাতা রুক্মিণী । কবি ছিলেন বৈদ্যবংশজাত এবং মনসার উপাসক। স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত "মনসার স্থান" বঙ্গবিভাগকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। পদ্মাপুরাণ-রচনার কালজ্ঞাপক যে শ্লোক তিনি রচনা করেন, তার অন্তত তিনটি পাঠান্তর পাওয়া যায়। একটি আছে- 'ঋতুশূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ' - এতে পাওয়া যায় ১৪৮৬ খ্রীঃ। অপর একটি পাঠ- 'ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমাণ, এর অর্থ-

শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীঃ। আর একটি পাঠে আছে- 'ছায়াশূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ'- এটির অর্থ উদ্ধার করা যায়নি। অপর একটি চরণে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

"সুলতান হোসেন শাহ্ নৃপতি তিলক।"

অর্থাৎ তার কাব্য রচনাকালে সুলতান হোসেন শাহ্ ছিলেন গৌড়াধিপতি। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৩ শ্রীঃ থেকে ১৫১৮ খ্রীঃ-কেই বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনাকাল বলে গ্রহণ করা চলে। তবে ১৪৮৬ খ্রীঃ-র দাবিকেও অস্বীকার করা চলে না; ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেন যে জালালুদ্দিন ফতে শাহ্-ও সুলতান হোসেন শাহ্ নামে ১৪৮১ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই হিসেবে ১৪৮৬ খ্রীঃ -ও কাব্যের রচনাকাল হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বিজয়গুপ্ত-রচিত গ্রন্থের খুব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না বলে ড. সুকুমার সেন বিজয়গুপ্তের এত প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তার মতে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা না হ'য়ে এর গায়েনও হয়ে থাকতে পারেন।

বিজয়গুপ্ত মনসার উপাসক ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ সমগ্র কাব্যে তিনি মনসাকেই প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেছেন। তার ফলে, কাব্যের নায়ক চন্দ্রধর বা চাঁদসদাগর অনেকটা উপেক্ষিত হয়ে রয়েছেন। চাঁদসদাগরের যে পৌরুষদৃপ্ত চরিত্র অপর সকল মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, বিজয়গুপ্তে তার বেদনাদায়ক অভাব পরিলক্ষিত হয়। শেষ পর্যন্ত কবি চাঁদসদাগরকে এমনভাবে মনসা-ভক্ত করে গড়ে তুলেছেন যে চাঁদচরিত্রে পূর্বাপর সঙ্গতিসাধন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কাহিনীর প্রয়োজনে কবি মনসাকেও অতিশয় নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তুলতে বাধ্য হয়েছেন, এবং মনসার সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি আরোপ করতেও চেষ্টা করেছেন। মনসা জন্মাবধি এমন কিছু কিছু প্রতিকূল শক্তির দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে তাঁর নিরুদ্ধ চিন্তবেদনাই তাঁকে এমন নিঠুর, অত্যাচারী ও প্রতি- হিংসাপরায়ণ ক'রে তুলেছিল।

বাখরগঞ্জ তথা বরিশালের সুবৃহৎ অঞ্চলে বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' দীর্ঘদিন যাবৎ একান্ত জনপ্রিয় হয়েছিল বিজয়গুপ্তের কাব্যের প্রবচন আজও বাংলার জনজীবনে জনপ্রিয় –

"অতিকোপে করিলে কাজ ঠেকে আতান্তর।

অতি বড় গাঙ হইলে কাটে পড়ে চর।।"

বাকচাতুর্য ও অশ্লীল রসিকতার প্রতি বিজয়গুপ্তের প্রবণতা ছিল। শিব কর্তৃক পদ্মার বিবাহ ব্যবস্থাপনার উপলক্ষে শিব স্ত্রী-আচারের আয়োজন করতে দুর্গাকে নির্দেশ দেন। তখন-

'হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ডাণ্ডাইতে জানি

মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হইয়া।

দেখিয়া আমার ধান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,

লাজে সবে যাবে পলাইয়া।।'

বিজয়গুপ্তের শিব শিথিল চরিত্রের দরিদ্র গৃহস্থ। অল্প প্রশংসায় গলে যায় আবার সামান্য ব্যাপারে রেগে তাণ্ডব বাধিয়ে দেয়। শিবের আনন্দ ও বেদনার মাত্রা ও প্রকাশভঙ্গির সারল্য তাকে বিশেষ কৌতুকাশ্রয়ী করেছে চরিত্র শৈথিল্যের ব্যাপারটি বিজয়গুপ্তের দৃষ্টিতে যথেষ্ট চটুল ও হাস্যকর। ভাষা ও ছন্দে কবি বিজয়গুপ্ত যথেষ্ট সচেতন। পয়ার-লাচরির একাধিপত্যের যুগে বিজয়গুপ্ত ছন্দে এনেছেন বৈচিত্র্য-

"প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।

সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।'

শব্দ ও উপমাদি চয়নেও কবি সংস্কৃত-রীতির পুরো বশ্যতা স্বীকার করেননি-

"ব্যাধের হাতে পড়ি যেন পক্ষীর কিলকিলি।

উচ্চৈঃসরে ডাকে পদ্মা বাপ বাপ বলি।।"

বাণিজ্য পথে সপ্তডিঙা হারিয়ে অশেষ, দুঃখ ও দুর্গতির মধে চন্দ্রধর তখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন অবস্থায় হঠাৎ দৈবের কৃপায় তিনি চারপণ কড়ি পেয়ে যান। নিঃস্ব চাঁদ সওদাগর এই চারপণ কড়ি নিয়েই বিলাসিতার স্বপ্ন দেখেছেন-

‘একপণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর সুদ্ধি হব।

আর একপণ কড়ি দিয়া চিঁড়া কলা খাবো ।

আর একপণ কড়ি দিয়া নটী বাড়ি যাব।

আর একপণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব।।’

বিজয়গুপ্ত শুধু কবি ছিলেন না, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যেরও অধিকারীও ছিলেন বলেই রচনায় কোন প্রকার শিথিলতা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি পূর্বসূরী কবি হরিদত্ত সম্বন্ধে বলেছেন-

‘প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।

জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।’

বিজয়গুপ্তের এই উক্তিতে পূর্বসূরী-সম্বন্ধে যথেষ্ট অবিনয় রয়েছে সত্য, কিন্তু কাব্য-গুণ-বিবর্ধক অলঙ্কারাদি-বিষয়ে যে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন তার পরিচয় এখানে বিধৃত। বস্তুতঃ বিজয়গুপ্তের রচনায় তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান অক্ষুন্ন রয়েছে। -ছন্দ, মিল, অলঙ্কারাদি-বিষয়ে তিনি যথার্থ নিপুণতারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কোন কোন উক্তি প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পয়ার-ত্রিপদী ছাড়াও তিনি “লাচাড়ি” নামে লৌকিক বা স্বরবৃত্ত ছন্দেরও সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিজয়গুপ্ত সমসাময়িক কবিদের চেয়ে যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রকে অনেকেই বিজয়গুপ্তের সার্থক উত্তরসূরী বলে বিবেচনা করেন। 'পদ্মাপুরাণ' বা ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে বিজয়গুপ্তের কৃতিত্ব-বিষয়ে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, “সমসাময়িক যুগ ও জীবন হইতে কবি যে অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন, কাব্যে তাহার পরিচয় বর্তমান। তাহার অঙ্কিত সামাজিক চিত্রগুলিও অংশ বিশেষে রুচিগর্হিত

বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের বাস্তবতা নিসংশয়িত। এই প্রসঙ্গে তিনি যে রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্থূল হইলেও যে সমসাময়িক যুগের পক্ষে বেমানান হয় নাই তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ছিল বৈচিত্র্যের প্রতি। তাই সমগ্র কাহিনীটি যেন অনেকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ পালায় বিভক্ত হইয়া আছে। কাহিনী-পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই কবির বৈচিত্র্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।" বিজয়গুপ্তের কাব্যের দোষ-ত্রুটি সত্বেও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে ব্যাপকতায় ও জনপ্রিয়তায় বিজয়গুপ্তই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

২.৫.৩ : বিপ্রদাস পিপলাই

বিপ্রদাস মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি হিসাবেই সুবিদিত। কিন্তু তাঁর কাব্যের চারখানি পুঁথির মধ্যে দু'খানির ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের এবং অন্তত তিনটি পুঁথি আদ্যোপান্ত খণ্ডিত। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে বর্তমানে পুঁথিগুলি রক্ষিত। কিন্তু মূল পুঁথিটি বিলুপ্ত, এগুলি তার অনুলিপি মাত্র।

কাব্যের একটি পুঁথিতে "সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ" (অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দ-১৪৯৪ খ্রীঃ) কালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া গেলেও তার সঙ্গে অন্য পুঁথির বৈসাদৃশ্য বর্তমান। ড. সুকুমার সেনের মতে, কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে রচিত। কিন্তু শব্দ ও ভাষাপ্রমাণের ভিত্তি অনুসারে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, "ইহাকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে লওয়া যায় না।" কাব্যের প্রকৃত নামটিও পরিষ্কার নয়-"মনসাবিজয়", "মনসামঙ্গল" এবং "মনসাচরিত" তিনটি নামই পাওয়া যায়। কবির জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িয়া বা নাদুড়্যা বটগ্রাম।

বিপ্রদাসের কাব্যে কাহিনীর ঘটনা-বিস্তৃতি স্বচ্ছ, ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন এবং বর্ণনাভঙ্গী আতিশয্য-বর্জিত। তাঁর কাব্যে হাসান হুসেনের পালাটি দীর্ঘায়ত এবং অন্যান্য মনসা মঙ্গল অপেক্ষা সুপরিকল্পিত। মুসলমান সমাজের বিবরণে অনুপুঙ্ক্ষতা আছে –

"মিঞা যবে ফৌত হইল গোলামের ঘোষ পাইল

বিবি লইয়া পলাইতে চায়।।"

'ব্রতগীত' এবং ব্যালাডের লক্ষণে কাব্যটির কাহিনী রচিত। চরিত্র-চিত্রণে মনসার স্বরূপ যথেষ্ট স্বাভাবিক, স্নেহ-মমতা এবং করুণায় দ্রবীভূত। প্রাকচৈতন্য যুগের ক্রূর-কঠিনতা থেকেও চরিত্র মুক্ত। কিন্তু তুলনামূলকভাবে চাঁদ চরিত্র এখানে আদৌ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত নয়। মনসার পদাঘাত পর্যন্ত তার কাম্য –

'হাসি পদাঘাত কৈলা চাঁদের মস্তকে।

অন্তরীক্ষ হৈয়া দেবী রহিল কৌতুকে।।'

চাঁদসদাগরের বাণিজ্য পথের মধ্যে কলকাতার উল্লেখ একাব্যে আছে। কিন্তু Stravonius-এর বিবরণী অনুসারে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা নগররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্য বিপ্রদাসের কাব্যের সর্বাঙ্গীণ বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সত্যই সংশয় জাগে।

২.৫.৪ : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

"মনসামঙ্গল' কাব্যগুলির মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত গ্রন্থই সর্বপ্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ ক'রে বলে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে এঁরই প্রচার এবং খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশকদের বিভ্রান্তির কারণে একসময় 'কেতকাদাস' এবং 'ক্ষেমানন্দ' নামক দু'জন কবির অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হাত। কিন্ত কবির নাম 'ক্ষেমানন্দ' এবং কেতকার অর্থাৎ মনসার দাস বলে তিনি 'কেতকাদাস' নামে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। মনসাই কেতকা, এ কথার উল্লেখ কবি নিজেই করেছেন-

"কিয়াপাতে জন্ম হৈল কেতুকাসুন্দরী।"

অবশ্য এই কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ছাড়াও 'ক্ষেমানন্দ' নাম বা ছন্মনামধারী অপর একজন কবিও মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

কবি পরিচয়ঃ-

কবি ক্ষেমানন্দ তার কাব্যে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি দামোদর নদের তীরবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম শঙ্কর। সলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা বারাখাঁর অধীনে তিনি চাকরি করতেন। এক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বারাখাঁর নিহিত হলে কবির পরিবার রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিশোর ক্ষেমানন্দ একদিন এক মুচিনীর সাক্ষাৎলাভ করেন। মুহূর্ত কাল পড়েই মুচিনী আবার দেবী মনসারুপে আবির্ভূত হয়ে কবিকে কাব্য রচনার আদেশ দিয়ে বলেন-

"ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্বে কর প্রবন্ধ

আমার মঙ্গল গাইয়া তুল।"

তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত সপ্তদশ শতক। মনসার' আর এক নাম 'কেতকা'। কবির ভাষায়-_"কিয়াপাতে জন্ম হৈল কেতকাসুন্দরী।" এই কেতকার স্তাবক বা 'দাস' বলে কবি নাম নিয়েছেন কেতকাদাস। সেলিমাবাদ পরগনায় কাথোরা গ্রামে তাঁর জন্ম। কবির পিতার নাম শঙ্কর। বারাখী নামে সেলিমাবাদের পালনকর্তার অধীনে ছিলেন পরে ভারমল্লের (জগন্নাথপুর) কাছে আশ্রয় নেন। মুকুন্দরামের কাব্যে এই ভারমল্লের কথা আছে। তারকেশ্বর থানায় জগন্নাথপুর ভরামলপুর গ্রামে অবস্থিত। কবির সময় ভরামলপুর ছিল না। মুচিনী রূপিণী মনসা কবিকে কাব্য রচনার আদেশ দেন। ক্ষেমানন্দের বহু পুঁথি পাওয়া যায় পূর্ণ এবং খণ্ডিত অবস্থায়। পশ্চিমবাংলার কবি হলেও পূর্ববঙ্গেও তাঁর কাব্য জনপ্রিয় ছিল। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম যে মনসামঙ্গল মুদ্রিত হয় তা হলো ক্ষেমানন্দেরই পুঁথি। উনিশ শতকে তারঁ কাব্যই প্রথম ও সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর কাব্যে নির্দিষ্ট রচনাকাল না থাকলেও উল্লিখিত ঐতিহাসিক চরিত্র থেকে তাঁর কাব্যের কাল মনে হয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে লেখা। কাহিনীকে শিল্পরূপ দান তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। কাহিনী ও চরিত্রগত ঐক্য রক্ষার। এখানে লক্ষণীয় চরিত্রচিত্রণও প্রশংসনীয়। তাঁর কাব্যে বর্ণিত মনসা অত্যন্ত হিংস্র। কালনাগিনীর লখিন্দর দংশনের মুহূর্তে তাঁর দ্বিধা ও মমতা এবং অন্যদিকে মনসার নির্মমতার সূক্ষ্ম

রূপায়ণ করে ক্ষেমানন্দ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর চাঁদ চরিত্রও স্মরণীয়। লখিন্দরের মৃত্যুসংবাদে চাঁদ চরিত্রের আচরণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে-

'লোহার বাসরে মৈল বালা লখীন্দর।

শুনিয়া যে চাঁদ বাণ্যা হরষিত হৈল।

কান্ধে হেঁতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল।।

ভাল হৈল পুত্র মৈল কি আর বিষাদ।

কানি চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ।।'

সনকা-চরিত্রে জননীর দুই রূপ। একদিকে তাঁর বেহুলাকে ভৎসনা অন্যদিকে বেহুলার যাত্রা সংবাদে তাঁর জননীসুলভ মমতার পরিচয় লক্ষিত হয়।

"সনকা কান্দিয়া বলে আ লো অভাগিনী।

এ তিন ভুবনে ইহা কখনও না শুনি ।।"

তাঁর কাব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সপ্তদশ শতকের বাঙালীর জীবন এখানে জানা যায়। এছাড়া লখিন্দরের বিবাহ, জন্ম-প্রসঙ্গ ও বাঙালীর ষষ্টি পূজা, ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের সাময়িক মৃত্যু-সংবাদে গঙ্গার সহমরণ ইচ্ছার প্রস্তাবে সামাজিক প্রথার পরিচয় আছে।

আন্তরিকতা অথবা সরলতা নয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী এবং সামাজিক রীতিনীতি ও ভৌগোলিক সংস্থানের বিশ্বস্ত বর্ণনা একাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যে বেহুলার স্বর্গপথে যাত্রার যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে তার মধ্যে ১৪টি ঘাট বা গ্রাম এখনও দামোদর ও তার শাখা বাঁকা নদী এবং বর্তমান বেহুলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। করুণ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে কবির দক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট। কারুণ্যের মর্মস্পর্শী বর্ণনা- "প্রাণনাথ-কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী।

ঘরে হৈতে শোনে তাহা সোনকা বাণ্যানী ॥

ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া।

পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া।।"

লৌকিক কাব্য এবং Ballad-এর মতো একটি প্রধান লক্ষণ, এর কোন কোন অংশে ইংরেজী refrain-এর মতো পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে ঘন রসাবেশ হয়।'লৌহবাসর' বর্ণনায় এমনি একটি অংশে পুনরাবৃত্তি করবার ফলে ক্ষেমানন্দের কাব্যের রসগৌরব আধুনিক শিল্পসুষমায় সুশোভিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে-

"কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া যায়।

বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায় ॥

কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভূজঙ্গ।

চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হইল ভঙ্গ।।"

তাঁর পরিকল্পনায় বেহুলা কেবল আদর্শ গৃহবধূ নয়, কারুণ্যেরও আধার। প্রাচীনকালের নটীনৃত্যের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বেহলার নৃত্যের মাধ্যমে রেখায়িত হয়েছে। মুকুন্দরামের কাব্যের প্রভাব কেতকাদাসের কাব্যে আভাসিত হয়েছে। এই কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ একটি কারণে স্মরণীয়, সেটি হল, মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে এই গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করে। শ্রীরামপুর মিশনারীদের সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়।

২.৬- চৈতন্যপর্বের মনসামঙ্গল কাব্য

চৈতন্যপর্বে মনসামঙ্গলের ধারাটি সবেগে চলতে থাকে। তবে ষোড়শ শতকের কবিরা ঠিক বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের সমকক্ষ নন। প্রথম পর্বের কবিরা (ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক) পৌরুষদৃঢ় চরিত্রচিত্রণে এবং গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে জীবনকে দেখবার চেষ্টায় কতকতা সফল হয়েছিলেন। তাঁদের কাব্যের ভাষা ছিল কর্কশ। চৈতন্যোত্তর কালের কবিরা তাঁদের কাব্যে বিভিন্ন দিক থেকে সজীবতা আনলেন-

(১) ভাষায় লাবণ্য এল

(২) চাঁদের দৃঢ় পৌরুষ এ কালের মনসামঙ্গল কাব্যে মিলল না চৈতন্যর প্রভাবে চাঁদের চরিত্র প্রথাসর্বস্ব প্রানহীন ও গতানুগতিক হয়ে গেল।

(৩) মনসাচরিত্রের হিংস্র রূপটি এ পর্বে অনেকটাই প্রশমিত ও প্রয়োজনে রচিত। বৈষ্ণবীয় ভক্তি-মনসাদেবীর হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দিল না।

(৪) কবিরা কাহিনি বর্ণনায় ও চরিত্রটি এনে সুযোগ পেলেই ভক্তিরস আমদানি করতে লাগলেন।

১) তন্ত্রবিভূতি -

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত ‘তন্ত্রবিভূতি'র মনসামঙ্গল কাব্যে কিছু বৈচিত্র্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থকর্তার নাম বিভূতি, সম্ভবত তিনি তাঁতী ছিলেন বলেই নামের সঙ্গে 'তন্ত্র' শব্দটি যোগ করেছেন। কবি ছিলেন উত্তরবঙ্গবাসী- এই উত্তরবঙ্গে মনসা মঙ্গল কাব্যের একটা স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত ছিল। কাহিনীতে এবং চরিত্রসৃষ্টিতেও কিছুটা নতুনত্ব দেখা যায়। তন্ত্রবিভূতির কাহিনী এবং রচনারীতি প্রশংসনীয় হলেও এতে আদিরসের বাড়াবাড়ি নিন্দনীয়। কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

২) জগজজ্জীবন ঘোষাল -

জগজ্জীবন ঘোষাল উত্তরবঙ্গের কবি। তাঁর আত্মপরিচয়ে জানা যায় যে, তিনি দিনাজপুরের কুচিয়ামোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রূপ, মাতা রেবতী। তিনি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহন করেন বলে অনুমান করা হয়। কবি চরিত্রসৃষ্টিতে স্বাভাবিক বর্ণনায় মোটামুটি প্রতিভার পরিচয় দিলেও গ্রন্থের বহু অংশ তন্ত্রবিভূতির সঙ্গে হুবহু এক- শুধু ভণিতায়ই পার্থক্য। আদিরসের আধিক্য কবির রুচি-বিকৃতিরই পরিচয় দেয়।

৩) দ্বিজ বংশীদাস -

ময়মনসিংহ জেলার পাতুয়ারি গ্রামের অধিবাসী দ্বিজ বংশীদাস একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি যে কাল-পরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক সন্নিবেশ করেছে তা প্রামাণিক

হলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি ১৫৭৫ খ্রী: কাব্যটি রচনা করেন। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, কবির কন্যা চন্দ্রাবতী বাঙলার প্রথম মহিলা কবি। কৰি মোটামুটিভাবে প্রচলিত কাহিনীর অনুসরণ করলেও দৃষ্টিভঙ্গির দিক্ থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যে সংঘাত যেন দেবতা আর মানবে নয়- এই সংঘাত একেবারেই যেন পারিবারিক। কাব্যের ভাষার সরলতা ও অনাড়ম্বর বর্ণনা-ভঙ্গিই তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪) হরিদত্ত –

আদিমধ্যযুগের কবি বিজয়গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে হরিদত্তই প্রথম মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং বিজয়গুপ্তের কালেই তাঁর রচনা লোপ পেয়েছিল । কিন্ত হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়। তবে এই সামান্য অংশ থেকে তাঁর প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া সন্তব নয়। তাঁর সমস্ত পান্ডুলিপিই ময়মনসিংহ অঞ্চলে পাওয়া গেছে বলে অনুমান করা হয় যে, তিনি সম্ভবত এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

৫) ষষ্ঠীবর –

কবি যষ্ঠীবর দত্ত সম্ভবত শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর উপাধি ছিল ‘গুণরাজ খান'। এঁর কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলে অনুমান করা চলে যে ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্য বর্ণনাত্মক- গল্প জমিয়ে তোলার দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল; তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য এবং অভিনবত্ব পাওয়া গেলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

৬) জীবন মৈত্র -

করতোয়া তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামের অধিবাসী জীবন মৈত্র তাঁর কাব্য রচনা করেন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতার নাম অনন্ত, মাতা স্বর্ণমালা। কবি রাজা রঘুনাথের রাজ্যে বাস করতেন।

উপসংহারঃ- মনসামঙ্গলের কবিদের কথাশেষ এখানেই। এইসব কাব্যের পুজো মন্দিরের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ।

পূর্ববাংলার জনসমাজে মনসামঙ্গলের আবেদন এখনো অটুট। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা মনসামঙ্গলকাব্যের কবিদের কবি পরিচয় ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হল এই পর্বে।

২.৭- মনসামঙ্গলের চরিত্র বিচার

চাঁদ সদাগর:-

মনসামঙ্গলের কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ সদাগর। কিছুতেই সে মনসা পুজো করবে না, ভয় দেখিয়ে বা লোভার্ত করে চাঁদ সদাগরকে বশ করা যায় না। অথচ চাঁদের পুজো না পেলে উচ্চসমাজে মনসার পুজো প্রচলিত হবে না। মনসা ঝালুমালুর মতো জেলেদের পুজো ও রাখালদের পুজো পেয়েছে। মানুষ সামান্য প্রাপ্তির আশায় মনসাকে মেনে নিয়েছে ও তার পুজো করেছে। চাঁদের স্ত্রী সনকাও মনসার সেবিকা। অটল চাঁদ মনসার প্রতিটি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। মনসা চাঁদের সুপারিবাগান নষ্ট করেছে। শঙ্কর ওঝা (গারুডী)র সহায়তায় চাঁদ তা আবার গড়ে তুলেছে। কৌশলে শঙ্কর ওঝার প্রাণ হরণ করেছে মনসাদেবী। নটীবেশে চাঁদের মহাজ্ঞান চুরি করেছে হিংস্র মনসা। চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করেছে মনসা। চাঁদ সদাগরের বেদনাবিদ্ধ হৃদয় এত আঘাতেও ভেঙে পড়ে নি। দক্ষিণ পাটন থেকে বাণিজ্য সেরে চাঁদ প্রভূত ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে শিবের আরাধনা করেছে। বৃদ্ধার ছদ্মবেশে মনসা পুজো ভিক্ষা করেছে চাঁদের কাছে। চাঁদ তাড়িয়ে দিয়েছে মনসাকে। রুষ্ট মনসা চাঁদের বাণিজ্যের নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে। সঙ্গী-সাথীরা প্রাণ হারাল মাঝ নদীতে মৃতপ্রায় চাঁদ সদাগরকে মনসা তার পুজো করার অনুরোধ করল। চাঁদ তীব্রকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে, কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে নানান বিপদ ও অপমান সহ্য করে ভিখিরি বেশে চাঁদ দেশে ফিরে এল। শেষ পযন্ত স্বর্গ থেকে প্রত্যাগতা সতী নারী বেহুলার অনুরোধ রক্ষারজন বাঁ হাতে ফুল ছুঁড়ে দিয়েছে চাঁদ সদাগর মনসার পায়। চাঁদ সদাগরের মতো পুরুষ চরিত্র বাংলাদেশে বিরল। দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের কঠিন ও আপোসহীন এই সংগ্রাম মধ্যযুগের পুরুষ

চরিত্র বিরল। সামাজিক পৌরুষহীন বাঙালি জীবনে চাঁদ সদাগরের মতো . দৃঢ়চরিত্রের সাহসী নায়কের বোধহয় প্রয়োজন ছিল। বহির্বাণিজ্য রত চাঁদের রূঢ় বাক্তিত্ব ও শৌর্য বাংলাদেশের সাহসী বণিকদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বেহুলাঃ-

বেহুলার চরিত্রের জীবনবাসনা ও রোমান্সের নায়িকাসুলভ দুঃসাহসিক অভিযান ও হিন্দুরমণীর সতীত্ব অথচ তা অতিক্রমী অভিনব আচরণ আধুনিক কবি জীবনানন্দের “রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে অপরূপ ব্যঞ্জনায়। বেহুলা অবিচলিত চিন্তে সর্বংসহা রমনী। কবিহৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি পেয়েছেন বেহুলা।

মনসাঃ-

মনসা চরিত্রের অপূর্ব মানবিক ভাব ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা স্বভাবধর্মেই কবিদের হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় পরিবেশে মনসা চরিত্রটি অনন্য। মনসা ন্যায়-অন্যায়, পাপপুণ্য, ভালোমন্দ সমস্ত বিচারবোধ বিসর্জন দিয়ে নিজের লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হযেছে প্রচণ্ড হিংসা ও নির্মম ক্রূরতার এবং দাবদাহ চরিত্র মনসা। একটি দেবীচরিত্রকে এরূপ নির্জলা অসৎগুণের অধিকারী। কারে. তোলার পেছনে কবি যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণগুলি মনসা-চরিত্রের মধ্যে মূর্ত। জন্মসূত্রে মনসা অনার্ধ। জন্মের পর পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত বিমাতা চণ্ডীর অত্যাচার, অপগত পৌরুষ, বিবাহ স্বামীপ্রেমের অতল, অতৃপ্ত পিপাসায় দগ্ধ ও সমাজ থেকে নিবাসিত পুঞ্জিত আঘাত ও ব্যর্থতাই মনসাকে উন্মত্ত ও নিষ্করুণ চরিত্রে পরিণত করেছে। তাই মনসা তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধানলে মানব সংসারের স্নেহপ্রেম ও আনন্দহাসিকে ভস্মীভূত করতে সচেষ্ট। মনসার আক্ষেপোক্তির মধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বিতা মানবচরিত্রের নিঃসীম শূন্যতা ও অতলান্ত বেদনার ইতিহাস প্রকটিত হয়ে উঠেছে-

'জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল

যেই ডাল ধরি আমি ভাঙে সেই ডাল।।

কারে কি বলিব আমি নিজ কর্মফল।

দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল।।'

সনকাঃ-

চাঁদ সদাগরের পত্রী সনকা বেদনার গভীর অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন। লোহার বাসর ঘরে সনকার শোকব্যাকুল চিত্র তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।

দেখিল সোনার তনু ধুলিতে লোটায়।।

দুই হাতে করি লখাই নিল কোলে।

চুম্বন করিল রাণী বদন কমলে ।।"

পরবরতীকালের আখ্যানকাব্যগুলিতে এ ধরনের জননী চরিত্রে সনকার প্রভাব অপরিসীম।

২.৮- মনসামঙ্গলের সমাজ চিত্র

চাঁদ সদাগরকে আদর্শের পূজারী রূপে অঙ্কিত করেছেন মনসামঙ্গলের কবিগণ। তবু দেখা যায় যে অন্যান্য সন্তান-শোকাতুর পিতার মতোই দুঃখে স্তব্ধ- 'স্তব্ধ প্রায় হৈল সাধু নাহি বোল চাল'। মনসা সদাগরের যে পরাজয় বর্ণিত তা দুঃখিনী পুত্রবধূর কাছে স্নেহশীল এক পিতৃতুল্য হৃদয়ের কাহিনী। একদিকে চাঁদের পুত্রদের মৃত্যু, মধুকর ডিঙা ডুবে যাওয়ায় ব্যবসার ক্ষতি চূড়ান্ত হয়েছে মনসার ক্রোধে! আছে সনকার ও পুত্রবধূ বেহুলার সকরুণ ছবি। বেহুলা আদর্শ চরিত্র। আমাদের সমাজের নিয়মানুযায়ী দুঃখের ভাগটাই নারীর দিকে পড়ে।

নীরবে সব দুঃখ সহ্য করা বাঙালি নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তবু মাঝে মাঝে সেও বিদ্রোহী। সনকাকে বলে

'নাগিনী দংশিল প্রভু মোরে কর রোষ।

তোমার' ছয় পুত্র মৈল সেও কি আমার দোষ।।

শোকাতুরা মা পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূ বেহুলাকেই দায়ী করেন। বেহুলা অন্তরে ক্রুদ্ধ হলেও উত্তর দিচ্ছে-

"অভাগিনী বেহুলারে মাতা কেন কর রোষ।

কর্মদোষে মইল প্রভু নহে মোর দোষ ।।'

মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে বেহুলা যখন চলেছে অনিশ্চিতের পথে তখন শাশুড়ী সনকা রোষ ঝেড়ে ফেলে বেহুলাকে ফিরে আসতে বললেন। সমাজবদ্ধ নারী বেহুলা তাই তার ভ্রাতারাও তার দুঃখে কাতর। বেহূলা সাহসী নারী। মৃত স্বামীর সৎকার করে বালবিধবার জীবন কাটাতে সে রাজী নয়। সে চায় সতীর গৌরব। ছয় পুত্রের মৃত্যু এক পরিবারের পক্ষে শ্মশানতুল্য। অত্যাচার অবিচার মাথা পেতে নেয় নি বেহুলা। আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাগ্র সাধনার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হল। লখীন্দরের মৃত্যুর পর সমাজের সেকালের নিয়মানুযায়ী চাঁদ সদাগরও জানতে চেয়েছেন দুঃখিনী বেহুলার উদ্দেশ্যটা কি? তাই

'বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর কি আছে সাহস।

লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ।।'

২.৯- অনুশীলনী

১) দেবী মনসার উদ্ভব ও মনসা নামের কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) বাংলায় মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা কয়টি ও কি কি? প্রত্যেক ধারার কবিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) মনসামঙ্গল কাব্যধারার দুজন প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫) মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে নারায়ণ দেবের মূল্যায়ন করুন।

মন্তব্য

৬) কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যকৃতির পরিচয় দিন।

৭) মনসামঙ্গল রচয়িতা বিপ্রদাস পিপলাই -এর কবি কৃতিত্বের মূল্যায়ন করুন।

৮) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য কৃতির পরিচয় দিন।

৯) চৈতন্য পর্বের মনসামঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১০) মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র হিসেবে চাঁদ সওদাগর ও মনসার চরিত্র আলোচনা করুন।

১১) মনসামঙ্গলের সমাজ চিত্র অঙ্কন করুন।

১২) মনসামঙ্গল কাব্যের বিষয়বৈচিত্র সম্পর্কে আলোচনা করে যে কোনো দুজন কবির কৃতিত্ব বিচার করুন।

২.১০- গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, প্রথম খন্ড।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খন্ড।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) প্রথম পর্ব- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্রগুপ্ত।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) শ্রী ভুদেব চৌধুরী।

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৩- চন্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন দিক

বিন্যাসক্রম

৩.১- উদ্দেশ্য

৩.২- দেবী চণ্ডীর উৎস

৩.৩- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

৩.৪- মঙ্গলচন্ডী নামের উৎপত্তি

৩.৫- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ

৩.৬- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচার

৩.৭- মুকুন্দরামের ঔপন্যাসিক প্রতিভা

৩.৮- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্র

৩.৯- অনুশীলনী

৩.১০- গ্রন্থপঞ্জি

৩.১- উদ্দেশ্য

মঙ্গলকাব্য গুলি দেব পূজা এবং ধর্মচিন্তা কেন্দ্রিক আখ্যানকাব্যের এক বিশেষ শাখা। মনসা, চন্ডী, ধর্ম প্রমুখ দেবতার কাহিনী বিভিন্ন আসরে, ঘরোয়া উৎসবে গান করা হত। বিবাহ, সন্তানজন্ম, ফসলের জন্য গৃহের যেকোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে এবং দেবতার পূজায় গাওয়া হতো মঙ্গল গান। মঙ্গলকাব্য ধারায় চন্ডীমঙ্গল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। দীর্ঘকাল ধরে কোন কবিগণ কোন সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন,

কিভাবে দেব কথা মানব কথাকে যুক্ত করে জনপ্রিয় আখ্যান গড়ে তুলেছেন- সেই বহু কথিত কবিকাহিনী ও বহু আয়াসসাধ্য গবেষণালব্ধ মঙ্গলকাব্য কথাকেই নতুন করে দেখা আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এর ফলে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে জনজীবনের পরিচয় আমাদের সামনে অনেকটা স্পষ্ট হবে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সৃষ্ট হওয়া চন্ডীমঙ্গল কাব্য গুলি পরবর্তী কবিদের কিভাবে প্রভাবিত করেছে, দেবী চণ্ডীর উৎস,চন্ডী নামের উৎপত্তি, চন্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও পরবর্তী কবিদের পরিচয়, কাব্যটির চরিত্র বিচার, সমাজ চিত্র ও কবিদের প্রতিভা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করাই এই এককের মূল উদ্দেশ্য।

৩.২- দেবী চণ্ডীর উৎস

দেবী চণ্ডী (চন্ড + ঈ) দুর্গার রূপবিশেষ । মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্যকথাকেও চণ্ডী বলা হয়। এখানে অবশ্য চণ্ডী বলতে দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকাকেই বোঝান হয়েছে। চণ্ড নামে দানব বিশেষকে বিনষ্ট করেছেন বলেই তিনি চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক। ঐ গ্রন্থের মধ্যে চণ্ডীর বিষদ পরিচয় আছে । অবশ্য তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের রচনা মহাভারতেও চণ্ডী নামের উল্লেখ আছে । আবার উৎসের সন্ধানে প্রাগার্য সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রকৃতি পূজায় অনেক গবেষক পৌঁছেছেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চণ্ডীর মিল আবিষ্কার করেছেন ।

বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য থাকলেও নারীশক্তির পরিকল্পনা সেখানে আছে । দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত ইত্যাদির মধ্যে নারীশক্তি বা নারীদেবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত। বিভিন্ন উপনিষদ ও আরণ্যক শাস্ত্রেও নারীদেবতার উল্লেখ আছে । তবে পুরাণ সাহিত্যে আমরা, নারীদেবতার প্রাধান্য লক্ষ্য করি। বৈদিক নারীদেবতারা প্রধানা নন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ঋকবেদের দশম মণ্ডলে অরণ্যানী দেবীর কথা আছে । ঐ দেবীকে 'মৃগাণাম মাতরম্' বলা হয়েছে । কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন অরণ্যানীই বহু শতাব্দীপার হয়ে নানা কবি- কল্পনার রঙে ডুবে ও নানা লোকভাবনার পাকে জড়িয়ে চণ্ডীমঙ্গলের দেবী মঙ্গলচণ্ডীরূপে দেখা দিয়েছে ।

শুধুদ্রাবিড় সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতিতেও চণ্ডীদেবীর মত নারী-দেবী পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় । বৌদ্ধ দেবী তারা, মারীচী, বা পর্ণশবরী, হারীতী, চুণ্ডা প্রভৃতির সঙ্গে চণ্ডীদেবীর মিল লক্ষ্য করা যায় । চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় । চণ্ডিকা যেমনঃ পৌরাণিক শিবের গৃহিনী, তেমনি কিরাতের দেবী, আবার বৌদ্ধদের মারীচী বা পর্ণশবরী। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী যে এক মিশ্রদেবী এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" গ্রন্থে প্রচুর তথ্যের উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন লোকায়ত সংস্কার বিশ্বাসী বাঙালি এবং নিকটবর্তী অনার্য শ্রেণির মানুষেরা অনুরূপ নানা লোকদের তার পুজো করত। চান্ডী নামে পরিচিত ওরাঁওদের শিকার ও যুদ্ধের দেবীর কথার উল্লেখ করেছেন মঙ্গলকাব্যের গবেষক। কালকেতুর কাহিনি থেকে বোঝা যায় চন্ডী প্রকৃতই পশুকুলের দেবী এবং ব্যাধ জাতির মানুষরা এই দেবী চন্ডীর উপাসক। কিন্তু ধনপতির গল্পের মধ্যে চন্ডীর সঙ্গে ব্যাধ অথবা পশুকুলের যোগ নেই। এখানে তিনি “যোষিতামিষ্ট দেবতা”। মেয়েদের তুষ্টিবিধাত্রী দেবী চণ্ডী। তিনি এখানে হারানো জিনিস ফিরে পাবার দেবতা । কালকেতুর কাহিনির মধ্যে দেবী যেন অরণ্যের রক্ষাকত্রী। ধনপতি সওদাগরের গল্পের ক্ষেত্রে চণ্ডী যেন গৃহস্থ ঘরের কল্যাণসাধিকা দেবী। মনে হয় স্বতন্ত্র দেবপরিকল্পনা থেকে এই উভয় কাহিনির ভিত্তিভূমিটি গঠিত হয়েছে।

ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যও লোক-উৎসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে। ড. সেন তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন “দুইটি কাহিনিরই দেবী কান্তারবাসিনী দুর্গা, তবে একটু তফাত আছে। কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনির মঙ্গলচণ্ডী বনপশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গোধিকা তাঁহার বাহন এবং প্রতীক। ধনপতি খুল্লনার মঙ্গলচন্ডী গৃহপালিনী দেবী। তাঁহার পূজার প্রতীক ঘট বা ঝারি এবং উপকরণ আটগাছি দুর্বা ও আটটি ধান। ইনি হারানো বস্তুকে ফিরে পাওয়ার দেবী। খুল্লনা এই দেবীকেই পুজো করে প্রথমে হারানো ছাগলটিকে ফিরে পায়, পরে ফিরে পায় নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ও পুত্রকে।” চন্ডীর লোক-

উৎসবের তত্ত্বটিই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। বাংলাদেশের ব্রত-আরাধনায় চণ্ডী ও মঙ্গলচন্ডীর প্রচুর নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে নাটাই চন্ডী, গোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভ চণ্ডী বা সুবচনী, কলাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী এবং আরও অনেক নাম পাওয়া যায়। ড. ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর 'বাংলাসাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "এই ব্রতের পদ্ধতি এবং লক্ষ্য একান্তভাবেই অবৈদিক অব্রাহ্মণ্য অস্মার্ত অপৌরাণিক।" তবে কমলে কামিনীর বৃত্তান্তে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গজলক্ষীর কথাই মনে পড়ে। গজলক্ষীর রূপটি অনেকটা লৌকিক রূপ লাভ করে লোকসমাজের দেবীর সঙ্গে মিশে যায়। দেবী হাতি গ্রাস করে আবার তা উদগীরণ করে দিচ্ছেন, শাস্ত্রীয় মনোভঙ্গী দিয়ে দেখলে এটি দেবীর সৃজন ও সংহার শক্তির রূপক, তবে প্রকাশভঙ্গি কতকটা 'লোককল্পনাসম্মত। ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য "অরণ্যানীই বহু শত শতাব্দের পথ বাহিয়া নানা কবিকল্পনার রঙে ডুবিয়া ও নানা লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চন্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচন্ডীরূপে দেখা দিয়েছিলেন । চন্ডীমঙ্গলে বন্দিত দেবী মুখ্যত অভয়া। মনসার মতো তিনি ক্রুর ও হিৎসাপরায়ণ নন।

দেবী চন্ডীর পৌরাণিক রূপের পরিচয় মুকুন্দের কাব্যে পাওয়া যায় ঠিকই, তবে তিনি যে ব্যাধ ও অনার্যের দেবী সেকথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি প্রথমে ব্যাধসমাজে পূজিতা হয়েছেন, পরে বণিক পরিবারের নারীসমাজে পূজিতা হয়েছেন। ছোটনাগপুরের উপজাতিদের উপাস্যা দেবী চান্ডীর পূজা এবং নারীসমাজের মঙ্গলচন্ডীর ব্রত এখনও প্রচলিত আছে। চন্ডীদেবীর পরিকল্পনায় মুকুন্দ ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য উভয় সংস্কৃতিরই সমন্বয় ঘটিয়েছেন। দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আদর্শে যেভাবে দেবীর রূপ পরিকল্পিত হয়েছে, চন্ডীমঙ্গলের দেবীরূপ তা থেকে স্বতন্ত্র। সেগুলিতে তন্ত্র ও মার্কন্ডেয় চন্ডীকে পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়েছে। দূর্গামঙ্গল ও ভবানীমঙ্গলের দেবী এবং চন্ডীমঙ্গলের দেবী এক নয়। চন্ডীমঙ্গলের চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় বিবিধ সংস্কৃতির সমন্বয় আছে। মুকুন্দের কাব্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কবি যদিও দেবীর পৌরাণিক মহিমার কথা উচ্ছ্বসিত ভাবে বহুবার কাব্যমধ্যে বলেছেন তথাপি তাঁর কাব্যের দেবী ভবানীমঙ্গলের ভবানী বা দুর্গামঙ্গলের দুর্গার অনুরূপ নন।

মেয়েলী ব্রতকথার চন্ডী, কিরাত পূজিতা চন্ডী ও বৌদ্ধ পর্ণশবরীর সংমিশ্রণ সেখানে আছে। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীদেবী কালকেতুকে মহিষমর্দিনী রূপে দেখা দিয়েছেন আবার কলিঙ্গ রাজের স্বপ্নে তিনি চামুন্ডারূপ ধারণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে অরণ্যের পশুদের ত্রানকত্রী সেকথা উল্লেখ করতে কবি ভোলেন নি।

৩.৩- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

চন্ডীমঙ্গলের তিনটি কাহিনি আছে। 'দেবখন্ড'-এ আছে শিব কাহিনি। দক্ষ যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় গৃহে উমার জন্ম, উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ কথা এই অংশের বিষয়। 'নরখন্ড'-এ আছে দুটি কাহিনি- 'আখেটিক খন্ড' ও 'বণিক খন্ড'। কাব্যের কাহিনিটি গড়ে উঠেছে এভাবে- দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনে শিবপত্নী সতী দেহত্যাগ করে আবার উমা-পার্বতীরূপে হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তিনি শিবকেই পতিরূপে লাভ করেন। পার্বতীকে বিবাহের পর শিব স্বশুরগৃহে ঘরজামাইরূপে অবস্থান করেন। এখানে মা মেনকার সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে কন্যা পার্বতী স্বামীসহ কৈলাসে চলে যান। শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের সংসারে অভাব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলে দু'জনেই যার যার মতে সংসার ত্যাগ করতে চান। তখন পার্বতীর সখী পদ্মাবতী দেবীকে মর্তলোকে পুজা প্রচার করতে উপদেশ দেন। তদনুযায়ী পার্বতী মহাদেবকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন শাপ দিয়ে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্তালোকে পাঠিয়ে দেন-তিনিই মর্তালোকে দেবীর পূজা প্রচার করবেন। মহাদেবও নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। এই পর্যন্ত 'দেবখণ্ড"। নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যাধসন্তান কালকেতুরূপে এবং নীলাম্বরপত্নী ছায়া ব্যাধকন্যা ফুল্লরারূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাদের বিয়ে হয়। এদিকে দেবী চণ্ডী মর্ত্যে প্রথম পুজা গ্রহণ করেন কলিঙ্গ- রাজের। তারপর বনের পশুদের পূজা গ্রহণ করে সিংহকে পশুদের রাজা করে দিয়ে তাদের অভয় দান করেন। এদিকে কালকেতু শিকার করতে গেলে বনের পশুদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার করে। দেবী সুবর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ ক'রে কালকেতুকে ছলনা করেন। কালকেতু গোধিকাকে ঘরে নিয়ে এলে দেবী প্রথমে ষোড়শীরূপে এবং পরে মহিষমর্দিনীরূপে দেখা দিয়ে কালকেতুকে

প্রচুর ধন পাইয়ে দিয়ে তাকে গুজরাট বন কেটে রাজা হতে নির্দেশ দান করেন। সেখানে দেবীর দেউল নির্মিত হল এবং মর্ত্যলোকে দেবীর পুজা প্রচারিত হল। এই পর্যন্ত 'আখেটিক পর্ব'।

এরপর দেবীর ইচ্ছা হলো- তিনি নারীর এবং বণিক সমাজের পূজা গ্রহণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে গন্ধর্বকে শাপগ্রস্ত করে ধনপতি সদাগর ও তৎপত্নীকে ফুল্লরা রূপে মর্ত্যলোকে প্রেরণ করেন। এটি 'বণিক পর্ব'। দেবী এখানে প্রথমে মঙ্গলচন্ডীরূপে এবং শেষ পর্যায়ে কমলে-কামিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই কাহিনিটি কালকেতু কাহিনি অপেক্ষা অনেক বেশি বিস্তারলাভ করেছে। কালকেতু কাহিনির মধ্যে কোন সংযোগ-সূত্র নেই- একমাত্র চন্ডীর নামটি ছাড়া। উভয় কাহিনিতে চন্ডীর প্রকৃতিও ভিন্ন তবে তার উপকার করবার ইচ্ছা উভয়ত্র বর্তমান।

৩.৪- মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চন্ডীকে সাধারণভাবে শিবপত্নী চন্ডী বা দুর্গা বলে মনে করা হলেও চন্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু ধারণাই বর্তমান। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই স্ত্রী দেবতার বা মাতৃকা শক্তির পুজা প্রচলিত আছে। বেদ উপনিষদ-এ উমা, হৈমবতী, কাত্যায়ণী, কন্যাকুমারী প্রভৃতি শক্তিরূপা দেবীর উল্লেখ আছে। মহাভারতের যুগে দেবী দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুরবিনাশিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এ দেবী চন্ডীর বর্ণনা আছে। তবে তা প্রধানত দেবী দুর্গা রূপেরই বর্ণনা। এই গ্রন্থের দেবী মাহাত্ম্য অংশ বা 'দুর্গাসপ্তশতী' অংশই 'চন্ডী' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এখানে দেবী দুর্গাই চন্ডী নামে অভিহিত।

দশম শতাব্দী থেকে দেবী চন্ডীকার প্রভাব ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে লক্ষ করা গেছে। চন্ডীর কিছু প্রাচীন মূর্তিও পাওয়া যায়। চন্ডী ও দুর্গা দুই পৃথক দেবীকে ক্রমে অভিন্নরূপেই পাওয়া গেছে পুরাণ ও সাহিত্যে। তবে চন্ডীমঙ্গল এর চন্ডী অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভুত বলেই মনে করা হয়। 'চণ্ডী' শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষার শব্দ।

ছোটোনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁ জাতির ভাষায় ‘চাণ্ডী’ নামে এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি শিকারের ও যুদ্ধের দেবী। কালকেতুর কাহিনিতে এই দেবীকেই দেখা যায়। ইনি আবার পশুদেরও দেবী। অভয়া গোধাবাহনা। পশুদের যেমন রক্ষা করেন তেমনই মেয়েদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর পুজা করলে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায়। এখানেই তিনি মঙ্গলচন্ডী। প্রথমে নারী সমাজের ব্রতকথায় ছিলেন, পরে বণিক সমাজে পূজা পেয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন।

৩.৫- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগন

দ্বিজ মাধব :

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ মাধবের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তির কারণ রয়েছে। মধ্যযুগে মাধব নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন- কেউ ‘দ্বিজ মাধব', কেউ বা ‘মাধবাচার্য', আবার একই ব্যক্তি উভয় নাম ব্যবহার করতেন কিনা, তা-ও নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় নেই। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কৰি দ্বিজ মাধব আত্মপরিচয়সূত্রে বলেছেন-'পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নামে'। আবার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধবাচার্যও পরিচয় দিয়েছেন-

'পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার ।

মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।।’

জন্মস্থানরূপে কবি নবদ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন, কোন গ্রন্থে নবদ্বীপ-স্থলে সপ্তগ্রামের নাম পাওয়া যায়। মাধবাচার্যের বংশধরদের নিকট ‘মাধববংশতত্ত্ব’ নামক যে কুলপঞ্জিকা আছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কবি মাধব গঙ্গাতীর থেকে বাস উঠিয়ে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার কবি-পরিচয় মেঘনা তীরে বাসভূমি স্থাপন করেছিলেন। 'গঙ্গামঙ্গল'-রচয়িতারূপেও এক মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধব-রচিত চন্ডীমঙ্গলের যাবতীয় পুথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে- নবদ্বীপ সপ্তগ্রাম বা ময়মনসিংহ অঞ্চলে কোন পুথি পাওয়া যায়নি। অতএব কোন মাধব চন্ডীমঙ্গল রচনা করেন এবং তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়।

দ্বিজ মাধব কোনকালে বর্তমান ছিলেন তা নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে আছে-

‘ইন্দুবিন্দুবাণধাতা শক নিয়োজিত।

দ্বিজ মাধব গাত্র সারদাচরিত।।’

এ থেকে তারিখ পাওয়া যায় ১৫৯১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রী। গ্রন্থের অন্যত্র আছে

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।

একাব্বব নামে রাজা অর্জুনাবতার।।’

উক্ত সালে আকবর সিংহাসনাসীন থাকলেও পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়নি, অতএব কোথাও একটা গোঁজামিল থাকা সম্ভব। ডঃ সুকুমার সেন পূর্বোক্ত ‘ইন্দু-বিন্দু-বাণধাতা'- স্থলে ‘ইন্দুবিন্দুদানদাতা’ পাঠ গ্রহণ করে কবির কাব্য রচনাকাল নির্ণয় করেছেন ১৬৪৪-৪৭ খ্রী:। কিন্তু এতে আকবরের সঙ্গতি থাকে না এবং কাব্যের কতকগুলি অভ্যন্তর লক্ষণের জন্য একে অর্বাচীন বলেও মনে হয় না। অতএব অধিকতর প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রী: বলেই গ্রহণ করা সঙ্গত।

কবি দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যের নাম বলেছেন ‘সারদাচরিত' বা ‘সারদামঙ্গল'। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এটি ‘সুকবি মাধবাচার্য-বিরচিত জাগরণ’ নামক ব্রতকথা বা পাঁচালি জাতীয় গ্রন্থরূপে বহুল প্রচলিত। মাধবের কাব্য-পাঠে স্পষ্টতই অনুমিত হয় যে কবিকঙ্কণের কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, কাজেই তিনি যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রাগবর্তী- এই অনুমান যথার্থ হওয়াই সম্ভব। সাধারণভাবে কাহিনীর দিক থেকে কবিকঙ্কণের কাব্যর সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। এতেও তিনটি খণ্ড দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড এবং বণিকখণ্ড আছে। তবে এতে একটি অতিরিক্ত কাহিনি যুক্ত হয়েছে- দেবী চন্ডী-কর্তৃক মঙ্গলাসুর বধ এবং এই কারণে 'মঙ্গলচন্ডী' নাম লাভ। এতে কালকেতু কাহিনি এবং ধনপতি কাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে আর কাব্যের শেষাংশে তত্ত্ব কথার ব্যাখ্যা অহেতুক বিস্তারলাভ করেছে। কাহিনী নির্মাণে কবি উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিতে

না পারলেও বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি পরিচয় দিয়েছেন, তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তার বাস্তবচিত্র যে কবিকঙ্কণ অপেক্ষাও বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, তার দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে কালকেতু ফুল্লরাকে সংসার-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে বৃদ্ধবয়সে কালকেতুর পিতা-মাতা ধর্মকেতু-নিদয়া কাশীবাসী হলেন এবং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কালকেতু মাসে মাসে টাকা পাঠাতো। একজন ব্যাধের পক্ষে এ জাতীয় জীবনযাপন কি বিশ্বাস যোগ্য ? পক্ষান্তরে দ্বিজ মাধব দেখিয়েছেন কালকেতুর বিবাহের পর সংসার বৃদ্ধি পাওয়াতে পিতা ধর্মকেতু জীবিকা সংগ্রহের জন্য অরণ্যে গিয়ে সিংহের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। ব্যাধ-জীবনের সঙ্গে এই পরিণামই তো অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ কবি দ্বিজ মাধব তথ্যানুসন্ধনী দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখেছেন এবং সেই দৃষ্টিতেই কাব্যখানি রচনা করেছেন বলেই এর বাস্তবতা এত প্রখর হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ কোন নৈপুণ্য দেখাতে না পারলেও তাঁর অঙ্কিত ভাড়ু দত্ত অতিশয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তার কুটবুদ্ধি, চাতুরী এবং বঞ্চনার চিত্রের মতই তার অপরাধ এবং শাস্তি বিধানের কাহিনীও সমভাবেই কৌতুকোদ্দীপক। দেবী চণ্ডী অনার্য সমাজ থেকে আগত হলেও কবিকঙ্কণ তাকে আর্যকল্পনার পৌরাণিক ছদ্মবেশে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেবী যথাযথভাবে অনাযোচিত ভয়ঙ্করী দানবীরূপেই উপস্থাপিত হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রসষ্টিতেও কবি আনুপূর্বিক সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করলেও তা কবিকঙ্কণের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিজ মাধবের দুর্ভাগ্য যে তাকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল বলেই তাঁর তুলনায় নিষ্প্রভ প্রতিপন্ন হয়েছেন। কবিকঙ্কণকে বাদ দিয়ে অপর যে কোন মঙ্গলকাব্যকারের তুলনায় তাঁর প্রতিভা যে কোন অংশেই ন্যূন নয়, এ কথা নিঃসংশয়ে প্রকাশ করা চলে। কবিকঙ্কণকে যদি শিল্পী কবি আখ্যা দেওয়া যায়, তবে দ্বিজ মাধব স্বভাবকবির মর্যাদা অবশ্যই পেতে পারেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীকবিরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। অথবা অন্যতম কবি না বলে তাঁকেই মধ্যযুগের প্রধানতম কৰি বলে চিহ্নিত করা চলে, যিনি একটি লোককাব্যধারাকে রূপ দিয়েও মৌলিকতায়, চরিত্রচিত্রণে, বাস্তব রস সৃজনে এমনকি উপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে আধুনিক সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছেন।তাঁর গ্রন্থে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, মানসিংহ যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন, তখন ডিহিদার মামুদ সরীফের অত্যাচার-আশঙ্কায় কবি পিতৃপুরুষের ভিটা দামুন্যা ত্যাগ করে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণভূমি আরবার রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ এবং রাজা রঘুনাথের অনুরোধেই কবি তাঁর চণ্ডী মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।মানসিংহ ১৫৯৬ খ্রিঃ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন-অতএব কবির স্বীকারোক্তি-অনুযায়ী তিনি এর পর দামুন্যা ত্যাগ করেছিলেন। গ্রন্থ রচনাকাল আরো কিছু বিলম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অনুমান করা চলে যে, কবিকঙ্কন সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন; কবিকঙ্কণের কোন কোন পুঁথিতে গ্রন্থ রচনাকাল-বিষয়ক একটি শ্লোকে আছে-

‘শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্কগণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা।।'

এতে তারিখ পাওয়া যায় ১৪৬৬ শকাব্দ (১৫৪৪ খ্রিঃ) অথবা ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭ খ্রিঃ) কিন্তু একালে আকবরের সুবেদার মানসিংহকে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কবিকঙ্কন মুকুন্দ রচিত 'বাসুকীমঙ্গল' ক্যাবে এই শ্লোকটি বর্তমান থাকায় অনুমান করা হয় যে নাম-সাদৃশ্য শ্লোকটি কবিকঙ্কণের গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে।

কবি গ্রন্থের নাম বলেছেন 'অভয়ামঙ্গল'। গ্রন্থটি অপরাপর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতোই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত-দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। কাহিনী গতানুগতিক,

তাতে মৌলিকত্ব প্রদর্শনের কোন সুযোগ না থাকলেও কৰি ঘটনা-বর্ণনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দেবখণ্ডে তিনি হরগৌরীর জীবনযাত্রার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে দৈবী মহিমা ক্ষুণ্ণ হলেও তা মানবিক মহিমায় সমুজ্জ্বলতা লাভ করেছে। বস্তুত এই জীবনযাত্রায় নিম্নবিত্ত বাঙালী গৃহস্থ ঘরের যে চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিকদের পক্ষেও এমন নিখুঁত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর নয়। বস্তুত এই বাস্তবতার জন্যই কবিকঙ্কণের কাব্য এত উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বাস্তবতা আছে, তা বস্তুসঞ্চয় মাত্র, কবিকঙ্কণ একই উপাদানকে জীবনরসে নিষিক্ত করে বাস্তবরসে পরিণত করেছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর অপর বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে চরিত্রসৃষ্টিতে। তিনি দেবদেবীর চরিত্রেও মানবিকতার সার্থক প্রকাশ দেখিয়েছেন। মানব চরিত্রগুলিকেও মানবিক দোষগুণে সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন তিনি। চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত। বেনে মুরারি শীল তৎপত্নী বেনেনী অতি স্বল্প পরিসরেই এমন বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, যার তুলনা শুধু একালের ছোটগল্পেই পাওয়া যেতে পারে। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটিও চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা এককথায় অনবদ্য। তার পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন এবং কার্যকলাপ একালের সার্থক 'খলচরিত্র'-র সঙ্গেই শুধু উপমিত হ'তে পারে। দুর্বলা দাসীও কবিকঙ্কণের হাতে একটি অতিশয় আকর্ষণযোগ্য চরিত্রে পরিণত হয়েছে। অপরাপর চরিত্রগুলি এতটা স্ফুটোজ্জ্বল না হলেও সেকালের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কবি আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতুকে যে ভদ্রবীর করে না তুলে ব্যাধসন্তানরূপেই অঙ্কন করেছেন, তাতে তাঁর স্বাভাবিক বাস্তববুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতুর পরিচয়ে তিনি বলেন

‘শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।

ছোট গ্রাস গেলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।'

তেমনি ফুল্লরা তার সখী বিমলার বাড়ি গেলে পর বিমলা যখন বলে-

'আস্য গো প্রাণের সই বস্যগো বুহিনি।

মোর মাথায় গোটা কত দেখত উকুনি।।'

তখন তার স্বাভাবিকতায় সন্দেহ করবার উপায় থাকে না। সব মিলিয়ে চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর সার্থকতা-বিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেনঃ "মুকুন্দরাম বিস্ময়কর খুব বৃহৎ বিশাল চরিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিলেও সাধারণ, প্রত্যক্ষ, পরিচিতি ও পাঁচা-পাঁচি বাস্তব চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ কুশলতা দেখাইয়াছেন।" বাস্তবতাবোধ, চরিত্র-সৃষ্টি ক্ষমতা এবং মানবিকতাবোধের যে পরিচয় কবিকঙ্কন কাব্যে পরিলক্ষিত হয়, এদের অসাধারণ সমন্বয়ের ফলে একালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে কবিকঙ্কন- চণ্ডী প্রায় উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। সেকালের প্রখ্যাত মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত কবিকঙ্কনের কাব্য বিষয়ে মন্তব্য করেছেন,"The phought and feelings and sayings of his men and women are perfectly,natural,recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature." বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় বলেনঃ "দক্ষ উপন্যাসিকদের অধিকাংশ গুণই তাঁহার ছিল।

এ যুগে জন্মগ্রহন করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।" বাংলা সাহিতোর ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনও এ বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন "নিপুণ পর্যবেক্ষণ, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে সব গুণ ভালো উপন্যাস-লেখকের রচনায় আমরা প্রত্যাশা করি, সে সব গুণ সেকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে মুকুন্দরামের কাব্য পাই।" মধ্যযুগের একজন কবির পক্ষে এই সমস্ত গুণ তাঁর অসাধারণত্বেরই পরিচায়ক।

কোন কোন সমালোচক মুকুন্দরামকে 'দুঃখবাদী' বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু এই উক্তির পেছনে কোন তথ্যনিষ্ঠ যুক্তি নেই। সত্য বটে, গ্রন্থ রচনায় বাস্তবতার প্রয়োজনে কবি যে কয়টি দুঃখদারিদ্র্যগ্রস্থ জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাদের যথার্থতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ থেকে কবির জীবনদর্শনের পরিচয় আশা করা মূঢ়তা। তাঁর প্রখর বাস্তবানুভূতির জন্যই দুঃখের চিত্রগুলি এত সজীব হয়ে

উঠেছে। কিন্তু দুঃখকেই যে তিনি জীবনের সত্য বলে গ্রহণ করেন নি, তার পরিচয়ও সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর নিজের কিংবা কোন কাহিনীর পরিণামই দুঃখময় নয়। প্রতিটি দুঃখের শেষেই তিনি আশার আলো দেখিয়েছেন। অতএব তিনি যে দুঃখবাদী ছিলেন না, এটিই সত্য। বরং দুঃখ বর্ণনার মধ্যদিয়ে আসলে তিনি জীবনের প্রতি অপরিমিত মমত্বেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই অনেকে তাঁকে 'দুঃখবাদী' না বলে, 'দুঃখরসের কবি' বলাই সঙ্গত মনে করেন। কবিকঙ্কন সম্বন্ধে সর্বশেষ কথা-তিনি ছিলেন বাঙালী জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। প্রসঙ্গক্রমে হরগৌরীর জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করা চলে। না বলে দিলে এটিকে দেবতার লীলা বলে বোঝার কোন উপায় নেই। এটিকে গদ্যভাষায় রূপান্তরিত করে অনায়াসে একালের ছোটগল্প বলে চালিয়ে দেওয়া চলে। বস্তুত মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে এই যে শাশ্বত বাঙালী জীবনের কাহিনী রচনা করেছেন, এটিকেই তাঁর কবিকৃতির সর্বোত্তম সম্পদ বলে গ্রহণ করা চলে।

অন্যান্য কাব্যকারগণঃ

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের সংখ্যা একেবারেই মুষ্টিমেয় এব কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ মাধব ছাড়া অন্য কোন কবির রচনাই তেমন উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হয় না।

মাণিক দত্ত:-

কবিকঙ্কন তাঁর কাব্যে মাণিক দত্তকে আদি কবির সম্মান দান করেছেন। এইক্ষেত্রে মাণিক দত্ত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান মতো ত্রয়োদশ শতকের লেখক হতে পারতেন। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছে প্রাপ্ত মাণিক দত্তের পুঁথি। মাণিক দত্তের ভণিতাযুক্ত যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাতে চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরদের বিবরণ থাকায় ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, "প্রাপ্ত পুঁথির মাণিক দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব। তিনি খানিকটা পুরানো মালমসলা ব্যবহার করেছিলেন।" অতএব অনুমান করা চলে, প্রাপ্ত পুথির মানিক দত্ত মুকুন্দ কথিত আদি মাণিক দত্ত নন। সম্ভবত এই মাণিক দত্ত প্রথম মাণিক দত্তের রচনা থেকে কিছু উপাদান আহরণ করেছিলেন। এঁর আত্মপরিচয়ে জানা যায় ইনি খঞ্জ ও বধির ছিলেন, দেবী চণ্ডীর বরে

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। মাণিক দত্তের কাব্যে 'সৃষ্টিপত্তন' অংশে বৌদ্ধপ্রভাব বর্তমান-অনুরূপ বৌদ্ধপ্রভাব একমাত্র সমসাময়িক কালের ধর্মমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। ভাঁড়ু দত্তকে কবি শিবভক্তরূপে বর্ণনা করেছেন-এরি ফলে তিনি চণ্ডীর কোপে পড়েন এবং পরে দেবী দুর্গার শরণ গ্রহণ করে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কবির কাব্যের নাম ছিল 'ভবানীমঙ্গল' বা 'দুর্গামঙ্গল'।

দ্বিজ জনার্দন:-

দ্বিজ জনার্দন-রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি 'পাঁচালি' রূপেই পরিচিত। এর মধ্যে ধনপতি সদাগরের কাহিনীই প্রধান কালকেতু কাহিনী এরই অঙ্গীভূত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেন যে দ্বিজ মাধব-আদি কবিগণ এ জাতীয় কোন কাব্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল।

দ্বিজ রামদেব:-

গ্রন্থে প্রদত্ত রচনাকাল থেকে জানা যায় যে কবি দ্বিজ রামদেব, ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রিঃ তার 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থকার সম্ভবত পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক শতাধিক উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির সমগ্র অংশ এখনও পাওয়া যায়নি।

মুক্তারাম সেন:-

গ্রন্থে প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে বৈদ্যবংশীয় কৰি মুক্তারাম সম্ভবত ১৭৪৭ খ্রিঃ 'সারদামঙ্গল' গ্রন্থটি রচনা করেন। কবির কোন এক পূর্বপুরুষ যশোহর থেকে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এঁর কাব্যটি পাঁচালি জাতীয় ক্ষুদ্রকায়-এর ভাষা সরল সহজ, পাণ্ডিত্যবর্জিত।

দ্বিজ হরিরাম:-

দ্বিজ হরিরাম রচিত কাব্যটি আকারে সুবৃহৎ। তিনি বিদ্রোহী শোভা সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন। অতএব সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সন্ধিকালে বর্তমান ছিলেন তাঁর কাব্যে মুকুন্দরামের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভবানীশঙ্কর:-

১৭৭৯ খ্রীঃ ভবানীশঙ্কর 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' নামে নাতিবৃহৎ কাব্যটি রচনা করেন। কবি পণ্ডিত লোক ছিলেন- রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা পান্ডিত্যের ভারই ছিল অধিক।

রামানন্দ যতি ও লালা জয়নারায়ণঃ-

রামানন্দ যতি 'রামায়ণ' এর লেখক মুকুন্দরামের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে নিজের কাব্যের উৎকর্ষ প্রতিপালনের চেষ্টা করেছেন। লালা জয়নারায়ণ দেবের 'চণ্ডিকামঙ্গল' কাব্যে কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান ছাড়াও মাধব সুলোচনার আখ্যান আছে। কবি বিক্রমপুরের বৈদ্যবংশজাত। ভবানীশঙ্করের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে এই কবির কাব্যটি রচিত হয় ১৭৭৯ খ্রিঃ।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সজীব ধারা শুকিয়ে যায় মুকুন্দর পরেই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য : "দুঃখের বিষয় মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যসাহিত্যে যে নতুন বাস্তবতার ধারা প্রকাশিত করিয়াছেন, পরবর্তীদের রচনায় তাহাতে আবার চড়া পড়িয়াছে। চণ্ডী , কালিকা ও অন্নদায় রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের কুরুচিপূর্ণ কেলিবিলাসের প্রশ্রয়দাত্রী ও সমর্থনকারিণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।" চণ্ডীমঙ্গলের পর ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । শিবায়নের উপাখ্যান লোকজীবনসম্ভূত।

৩.৬- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচার

কালকেতুঃ-

স্থুলবুদ্ধির মানুষ চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক ব্যাধ কালকেতু স্বভাবে সরল। কালকেতুর ব্যাধসুলভ Rustic চরিত্রটি জীবন্ত। বীরত্ব , ক্রোধ ও সন্দেহপ্রবণতার সমাবেশে কালকেতু বলিষ্ঠ চরিত্র। দেবীপ্রদত্ত সাত ঘড়া ধনের মধ্যে ছটি ঘড়া নিয়ে সে ঘরে যাচ্ছে। তার অনুরোধে দেবীও একঘড়া কাঁধে নিয়ে কালকেতুর পশ্চাদ্ গামী। কালকেতুর সন্দেহ পাছে দেবী পালিয়ে যানঃ

‘পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।

ফিরি ফিরি কালকেতু পাছু পানে চায়।।

মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।

ধনঘড়া নিয়ে পাছে পালায় পার্বতী।।‘

তাই কালকেতু পশু শিকার করে ব্যাধের মতোই। তার আচরণও অনার্যচরিত্রসুলভ। তার শয়ন কুৎসিত। ভোজন বিটকেল। এক একটি গ্রাস তোলে যেন ‘তেঁয়াটিয়া তাল’। ‘অরুগ্ন বর্বরতা’-য় পূর্ণ এক সজীব চরিত্র কালকেতু।

ফুল্লরাঃ-

ফুল্লরা পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী। কর্মঠ ব্যাধপত্নী। দরিদ্র সংসারের গৃহিণী ফুল্লরা পাড়ায় মাংস বিক্রি করে উপার্জন করে। অভাব হলে প্রতিবেশিদের বাড়ি থেকেও ধার করতে হয়। দেবী চণ্ডী যখন সুন্দরী রমণীর রুপে তাঁর গৃহে থাকতে চাইলে, নিজের বারমাসের দুঃখের বর্ণনা দিয়ে তাঁকে বিদায় করতে চেয়েছে। ফুল্লরার স্বামীপ্রেমের ভাগিদার আর কেউ হোক তা সে ভাবতে পারে না। তাই স্বামীর কাছে গিয়ে সে যখন সুন্দরী রমণীকে আনার জন্য অভিযোগ জানায় তখন কালকেতু বলে সংসারের বাস্তব সমস্যার কথাঃ-

‘শাশুড়ী ননদী নাই।

নাহি তোর সতা।

কার সনে দ্বন্দ্ব করি।

চক্ষু কৈলি রাতা।‘

তবে ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যে নারীজীবনের যন্ত্রণাময় দিকটিই ব্যক্ত।

ভাঁড়ু দত্তঃ-

চণ্ডীমঙ্গলে ভাঁড়ু দত্ত শঠ ও ধূর্ত ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র বিরল। শঠতায় ও বাকচাতুর্যে সে অদ্বিতীয়। কালকেতু গুজরাট নগরের অধিপতি হলে ভাঁড়ু ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরে। নীচজাতি কালকেতুর এই সমৃদ্ধি ভাঁড়ুর কাছে অসহ্য। জুয়াচোর ভাঁড়ুদত্তের বেশভূষা ও বাকচাতুর্য কবি ফুটিয়েছেন দক্ষ শিল্পীর মতো। রাজ্যশাসন বিষয়ে ভাঁড়ুর চতুর মতামতঃ

‘যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষমদ্বন্দ্ব

দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা’

কালকেতু এ কথায় কর্ণপাত না করায় ভাঁড়ু কালকেতুকে শাসায়ঃ-

‘হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।

হাটে হাটে বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতি।।‘

এই ভাঁড়ুর প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমন করে বন্দী করল কালকেতুকে। কিন্তু দেবীর কৃপায় অচিরে সে মুক্ত হয়ে পুনরায় রাজত্ব পায়। তখন নির্লজ্জ ভাঁড়ু তাকে গিয়ে জানায়-

‘খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি

বহু তোমার নাহি খায় ভাত।‘

ভাঁড়ু দত্তর মতো চরিত্র আধুনিক যুগে পাওয়া যায়। তাই ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রের যৌক্তিকতা আজও ফুরোয় নি।

মুরারি শীল:-

মুরারি শীল চণ্ডীমঙ্গলের এক অভিনব চরিত্র। সুখ্যাত চণ্ডীমঙ্গলের এই চরিত্রটিকে পাওয়া যায় কালকেতুর দেবীপ্রদত্ত সোনার আঙটিটি ধূর্ত প্রবঞ্চক বেনে মুরারি শিলের কাছে বিক্রি করতে গেলে সে নামমাত্র মূল্যে আঙটি কিনতে চায়। মুরারি বলে আঙটিটি পিতলেরঃ

'সোনারূপা নহে বাপা বেঙ্গা পেতল।

ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কইরাছ উজ্জ্বল।।'

যখন কালকেতু বেণের ধূর্তবুদ্ধি বুঝে ফেলল তখন মুরারি শীল সব কথাই পরিহাস করে উড়িয়ে দিল- 'এতক্ষণে পরিহাস কৈলুঁ ভাইপোরে।'

মুরারি পত্নীও স্বামীর যোগ্য সহচরী। কালকেতুকে দেখে মুরারি প্রথমে আত্মগোপন করে। ভেবেছিল বোধহয় কালকেতু মাংসের বকেয়া দাম দিতে এসেছে। কালকেতুকে তাই মুরারির পত্নী অনেক কৌশলে এড়িয়ে যায়। পরে মুরারি শীলের প্রবঞ্চনা বুঝতে পেরে কালকেতু আর আংটি বিক্রি করেনি। মুরারি শীল বাস্তব type ও প্রবঞ্চক চরিত্র। ভাঁড়ু দত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "কবিকঙ্কন চণ্ডী তে ভাঁড়ু দত্তের যে বর্ণনা আছে শে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখান হইয়াছে তাহা নহে ;এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়িল করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি কিন্তু কবিকঙ্কন এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পাইয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। কবিকঙ্কন চণ্ডী তে ভাঁড়ু দত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।" মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র চিত্রণে চণ্ডীমঙ্গল এর লেখক মুকুন্দ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বললে ভুল হয়না।

ধনপতি:-

লোকচরিত্র সম্পর্কে মুকন্দরামের জ্ঞান ধনপতির চরিত্র পরিকল্পনায়ও বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। দুর্বলার চরিত্রও তার এই জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে। ধনপতি বণিক। ঐযুগের সমাজে বণিকদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। নিম্নবর্ণের হয়ে ধনপতি বণিকের সংসারকে আশ্রয় করলেন। নাগরিক আচার-আচরণে ধনপতি ত্রুটিহীন। সুচতুর ধনপতির চিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরাম গভীর লোক চরিত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

ধনপতি খুল্লনার রূপ দেখে মুগ্ধ হল। কিন্ত তাকে বিয়ে করে ঘরে আনবার বাধা হচ্ছে প্রথমা স্ত্রী লহনা। লহনা স্বামীর পুনঃবিবাহের সংবাদ শুনে কাঁদতে আরম্ভ করল। চতুর ধনপতি অভিমানিনী লহনাকে ডেকে তার কোন সাড়া না পেয়ে কৌশলে কার্যসিদ্ধি করতে মনস্থ করল। প্রিয়াকে বশীভূত করার জন্য সে বলল :

‘রুপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।

চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে।।’

কাজেই ধনপতির প্রস্তাব :

‘যুক্তি যদি লহ মনে কহিৰ প্রকাশি।

রন্ধনের তরে তব করে দিব দাসী।।’

যে অসাধারণ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য থাকলে কবি মানবজীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে তার মর্মকথাটিকে প্রকাশ করতে পারেন, মুকন্দরামের সেই শক্তি ছিল। ধনপতি আহারে বসলেন ও লহনার রান্নার প্রশংসা করে তার মন হরণ করলেন। আহারান্তে বিশ্রাম করবার কালে লহনা স্বামীর কাছে গিয়ে অভিমান খেদ করতে লাগল :

‘ স্ত্রী গত-যৌবনে পুরুষ নির্ধনে

কিবা আদরের চিন।

কামদেব পাপ নাহি ধরে চাপ

করি রাখে গুণহীন।।'

লহনা:-

লহনা চরিত্রের অতিরঞ্জন কোথাও নেই। বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ স্ত্রীলোকের মধ্যে যে সমস্ত মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায় তার সমস্তই অতি সহজভাবে লহনার চরিত্রে মূর্ত হয়েছে। চতুর চূড়ামণি ধনপতি অতি সহজেই লহনাকে বশীভূত করলেন, বশীভূত করার কায়দাটি চিরন্তন :

'পারিতোষে লহনারে দিয়া পাট শাড়ী।

পাঁচপল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি।।

সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে।

যেমন আছিলা পূর্বে বিবাহের দিনে।।

রত্ন পেয়ে যত্নে নিল লহনা যুবতী।

বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।।'

দুর্বলা:-

দুর্বলা কালকেতু উপাখ্যানের ভাড়ু দত্তের স্থান ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে দুর্বলা গ্রহণ করেছে। লহনা ও খুল্লনা এই দুই সতীন সহোদরা ভগ্নীর মতই একে অন্যকে ভালোবাসত। দুই সতীনের অনাবিল প্রেম-সম্বন্ধ কূটচক্রী দাসী সইতে পারল না। দুর্বলা ভাবতে লাগল :

'যেই ঘরে দু-সতীনে না হয় কোন্দল।

সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল।।

একেরে করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান।

সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান।।'

সত্যই মুকুন্দরাম মানবজীবনের রূপকার। মানবজীবনের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সচরাচর দেখা যায় না। দুর্বলা ধীরে ধীরে লহনাকে উত্তেজিত করিত লাগল। সে লহনাকে বলল, খুল্লনা অতুলনীয়া সুন্দরী, তার তুলনায় লহনার কোন আকর্ষণই নেই।

দুর্বলার ঔষধ ধরল। কারণ তার এই উক্তি লহনার কাছে একান্ত সত্য ও স্বাভাবিক বলে মনে হল। দুই সতীনে অবিলম্বে কলহ বেঁধে গেল।

৩.৭- মুকুন্দরামের ঔপন্যাসিক প্রতিভা

গণসাহিত্যের প্রথম ছায়াপাত মুকুন্দরামের "অভয়ামঙ্গল" কাব্যে দৃশ্যমান। দক্ষ-চরিত্রাঙ্গন, কুশল ঘটনা-সন্নিবেশ, সংলাপ-নৈপুণ্য, ব্যাপক পরিলক্ষ্য, তা মুকুন্দরামের কাব্যেও অভিব্যক্ত। পূর্বসূরীদের কাব্যে যা ছিল গুহায়িত, পরিলক্ষ্য, তা মুকুন্দরামের কাব্যেও অভিব্যক্ত। পূর্বসূরীদের কাব্যে যা ছিল গুহায়িত মুকুন্দরামের অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি নির্ঝরে তা বহুজনীনরূপে হল পরিস্নিগ্ধ তাই তাঁর অঙ্কিত মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, ফুল্লরা সময়-সাগর পেরিয়ে ""বহুযুগের ওপার হতে" আজও সুবেদী পাঠকচিত্তে সমাদৃত হয়। আঙ্গিকগত গতানুগতিকতা থাকলেও চিন্তার কৌলীন্য ও ভাষার ঈশিত্ব স্বীকার করতে হয়।

ঘটনা ও সংলাপ:-

আখ্যানকাব্যের গঠনভঙ্গীর একটি প্রধান সমস্যা, ঘটনা, বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। এই তিনটি উপাদানই অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু একটা আনুপাতিক মিলন ঘটা চাই। গল্প বলার আদিযুগে কাহিনীতে ঘটনার বিবরণ ছিল সমধিক। সংলাপের সঙ্গতি ছাড়া তা ছিল বিবর্ণ ও শীতল। বর্ণনার গুরুত্ব আসে কাব্যত্ব থেকে। ঘটনায় থাকে দ্রুততার ঝোঁক, বর্ণনায় মন্থরতা। কবিকঙ্কনের কাব্য ঘটনাপ্রধান, বর্ণনামুখ্য নয়, এটিও প্রথা । কালকেতুর নগর-পত্তন, কলিঙ্গে ঝড় বৃষ্টি-বন্যায় বর্ণনার সুযোগ থাকলেও বর্ণনা ও ঘটনার মধ্যে রাখীবন্ধন সর্বত্র হয় নি। কিন্তু সংলাপ রচনায় এবং সংস্থানে কবির কৃতিত্ব প্রশংসার পরিচায়ক, যেমন দেবখণ্ডে শিবের মাহাত্ম্য নিয়ে দক্ষ-সতীর বিতর্ক, ঘরে জামাই-পোষা প্রসঙ্গে মেনকা-গৌরীর কলহ, দারিদ্রের জন্য

শিব-গৌরীর বিবাদ ,সুন্দরী নারী দেখে কালকেতু ফুল্লরার বিরোধের কথা বার্তায় হাটুরেদের উপরে ভাঁড়ুর অত্যাচারের বিবরণ ও বৈচিত্র্যের স্পর্শে ও সংঘাতের উত্তেজনায় নাট্যরস জমে উঠেছে।

আখ্যানভাগ নির্মাণ ও চরিত্রচিত্রন:-

আখ্যান ও চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কটি সবচেয়ে এখানেই অন্য সব কাহিনীর থেকে উপন্যাসের স্বাতন্ত্র। বলা চলে এখানেই উপন্যাসের প্রথম নিশ্চিত প্রকাশ লক্ষণ। ঘটনার উপর ঘটনা জমিয়ে প্রবাল দ্বীপ্ সৃষ্টির পদ্ধতিটি পুরাতন। গল্পসাহিত্যের প্রথম যুগে ঘটনাগত পারস্পর্য রক্ষাই ছিল চরম লক্ষ্য উপাখ্যানের ভিত্তিতে যে সমস্যা, পরিণতিতে তার সমাধান। কৌতুহলকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তৃপ্ত করতে তাই-ই তখন পর্যাপ্ত ছিল। মানুষের ভূমিকা থাকলেও তা ঘটনার ছকে দাবার ঘুঁটির চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। মানুষের ভাগ্যের বেদনাবিধুর কাহিনী থাকলেও তা নিতান্তই ছিল ঘটনার মালা গাঁথা। একটি ব্যক্তিত্বের, স্বাতন্ত্রের তীক্ষ্ণতা সেখানে বিরলদৃষ্ট। মুকুন্দরামের কাব্যের মধ্যেই দেখা গেল তার প্রথম পরিচয়। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি এল সমতল মাটির কাছাকাছি, বাংলার পরিবার জীবনের নিত্য পরিচিত। কারণ অভিজ্ঞতা-সৃষ্ট বাস্তব কিছু তৈরি করাতেই ছিল তাঁর আনন্দ, তাঁর সাফল্য। কালকেতু ও ফুল্লরা অন্ত্যজ ব্যাধশ্রেণীর মানুষ। চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ, সুদূর কামনা-বাসনা প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া সভ্যতারই লক্ষণ। কিন্তু অন্ত্যজ অসভ্য সমাজে চিন্তা ও মননের অতিরেক অনুপস্থিত। তাদের জীবনে মনের ভূমিকা সামান্যই। দেহবুদ্ধিতেই এ শ্রেণীর জীবনবোধের সীমা। রবীন্দ্রনাথের ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় এই শ্রেণীর পরিচয় পরিস্ফুটঃ

‘অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা-

নাহি কোনো ধর্মাধর্ম নাহি কোনো প্রথা |

নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,

নাহি কোনো বাধাবন্ধ নাহি চিন্তা জ্বর।।’

কালকেতু বীর এবং শিক্ষা সংস্কারহীন বর্বর। সে কুশলী সেনানায়ক নয়, অমানুষিক দৈহিক শক্তির অধিকারী এক মল্ল্। দারিদ্র্য-দংশনে সে হাহাকার করে না, ভোজ্যদ্রব্যের স্বল্পতায় তার দেহকে পীড়িত করে। সে চতুর না হলেও নির্বোধ নয়। সম্পদদায়িনী দেবীর প্রতি তার সন্দেহপ্রবণতা বাল-সুলভ মনেরই পরিচায়ক। কিন্তু ব্যাধজীবনের অরণ্য-পরিবেশে সে জীবন্ত হলেও রাজ্যপরিচালনায়, বুদ্ধি ও মেধাপ্রধান বৃত্তিতে সে ম্রিয়মাণ।এ চরিত্র নির্মাণে দুটি মাত্র স্থানে কবির দৃষ্টি ঔচিত্যভ্রষ্ট হয়েছে। ছদ্মবেশী চন্ডীকে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত করবার জন্য পুরাণাদির উল্লেখ কালকেতুর পক্ষে যেমন অসঙ্গত, তেমনি অসম্ভব কলিঙ্গরাজের প্রশ্নের জবাবে তার সুচতুর বাক্যে আপন চণ্ডীভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করা।

'বুকভরা মধু বঙ্গের বধু'-এ উক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত ফুল্লরা চরিত্র। সে কালকেতুর সুখ-দুঃখভাগিনী গৃহিনী। সর্বত্রই তার সহিষ্ণু-সুন্দর মুর্তি অবিচল। তাই তার 'বারমাস্যা' দুঃখের উপাদানে গড়া নয়, সেখানে কৌতুকের সকল রসের ধারা প্রবাহিত। দারিদ্র্য অপেক্ষা সতীন নিয়ে জীবনযাপনে তার কঠিন আতঙ্ক। এই আতঙ্কই তাকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অশিক্ষিত পটুত্ব দান করেছে। বারমাস্যায় তার কৌতুকমিশ্রিত সুন্দর পরিচয় পরিস্ফুট। ছদ্মবেশী চণ্ডীকে বিদায় করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গোলাহাটে কালকেতুর কাছে তার বিপন্ন আগমনের মধ্য দিয়ে ফুল্লরা-চরিত্রের মধ্যে নারীত্বের চিরন্তন রুপ রুপাঙ্কিত। আবার কালকেতুকে দেবীর অঙ্গুরী দানের সময় চণ্ডীর কার্পণ্যে তার কালকেতুর প্রতি যে উপদেশ-

'এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম ।

সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।।'

প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়ে তার আপন বুদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা রেখায়িত। কিন্তু কলিঙ্গ সৈন্যের ভয়ে তার কালকেতুকে যে উপদেশ-

"যদি আছে জীয়ে আশা ত্যাজিয়া দেশের বাসা

প্রাণ লয়ে চল মহাবীর"

উক্তির মধ্য দিয়ে স্ত্রীবুদ্ধি যে প্রলয়ঙ্করী তা পরে প্রমাণিত হয়। সম্ভবত ফুল্লরা চরিত্রের এই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাংসারিক বুদ্ধিতে আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারী মাত্রেই যে আত্মন্তরিতা দেখা যায় তার প্রতি কবির কটাক্ষ এখানে প্রকাশিত হয়।

মুরারি শীল কালকেতু আখ্যানের অনশ্বর চরিত্র। সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে, স্বল্প ভূমিকায় পাঠকের মনের মানচিত্রে সে গভীর ছাপ রেখে যায়। তার চরিত্রের অসাধারণত্ব তিনটি কারণে স্বীকার্য; স্ত্রীর সাহচর্য,বাকবিন্যাসের পটুত্ব, কৌতুকরসের সংযোগ। মুরারি-চরিত্রের-চালচিত্রে তার স্ত্রীকে স্থাপন করায় সে আরো সজীব, আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তার পাওনাদারকে ফেরাবার চাতুর্য যেমন হৃদয় গ্রাহী-

‘কাষ্ঠ আন এক ভার হাল বাকি দিব ধার

মিষ্ট কিছু আনহি বদর’

তেমনি কালকেতুর কাছে আঙটি আছে শুনে-

‘সরস করিয়া বাণী হাসি কয় বাণ্যানী

দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন’

জীবনের প্রতিবেশী চিত্র হিসাবে মনোগ্রাহী। কিন্তু তুরূপের তাস এখনো দেখানো বাকি। স্বার্থে, ব্যাকভঙ্গিতে মুরারি সত্যই যে তার স্ত্রীর উপযুক্ত পতিদেবতা তার পরিচয় পাই যখন দেখি সে পুরাতন ধারের কথা না তুলে কালকেতুর কুশল সংবাদের জন্য আন্তরিক কাতরতা প্রকাশ করে। ছলনার পল্লবে কালকেতুর মত সহজবুদ্ধির মানুষ এই জালে সহজেই ধরা পড়ে। বিক্রেতার মনকে একটু নরম করে নিয়ে সে অপ্রত্যাশিতভাবে আসল জায়গায় আঘাত হানে—

‘সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল

ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।‘

কিণ্ডু চন্ডীমঙ্গলের বিবর্ণ পাতা থেকে যে চরিত্রটি বাঙালীর মানসলোকে স্থায়ী আসন নিয়েছে কবির বাস্তবোচিত অভিজ্ঞতার ধারক-‘ভাঁড়ু দত্ত'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম

ভিলেন চরিত্র। মুকুন্দরাম ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে দেখেছেন কাম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা না পাওয়ায় একটি বিপর্যস্ত চিন্তকেন্দ্র। নিজের বংশকৌলীন্য এবং বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্বন্ধে তার আকাশস্পর্শী দম্ভ-

'যতেক কায়স্থ দেখ ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ

কুলশীলে বিচার মহত্ত্বে

...ঝারী থালা অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার

কেহ নাহি করয়ে রন্ধন। '

কিণ্ডু তার ক্ষমতার সীমা কতদূর, তা তার ভাষায় প্রতিফলিত-

'উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার

জটে ধরি পত্নী মোরে করিলা নিস্তার।'

জীবনের কাম্য মর্যাদাপ্রাপ্তি না পাওয়ায় সামাজিক মানী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তার যে জাতক্রোধ হয়েছে ধূমায়িত, বুলান মন্ডলকে প্রজামুখ্যের সম্মান দেওয়ায় তা আত্মপ্রকাশিত। নগরের মণ্ডল না হয়েও বহুকাম্য মন্ডলত্বের ভূমিকাভিনয়ের ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ সে পেতে চায়। মৌলিক চরিত্র না হলেও রচনা-সৌন্দর্যে ও সহানুভূতির আলোকে ভাঁড়ু দত্ত কালকেতু-আখ্যানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সূক্ষ্ম মনস্তত্ববোধের মহিমায় জীবন্ত। আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকের মত তাঁর কাব্যে অঙ্কিত চরিত্রের অন্তরক্ষেত্রে অরণ্যের জটিলতা নেই, নেই সরীসৃপ সন্দেহ, আছে শুধু ফলশ্রুতিতে মানবপ্রেমের কল্যাণ-স্নিগ্ধ অভিব্যঞ্জনা।

ঔপন্যাসিকের পক্ষে যা প্রধান প্রয়োজন-ব্যাপক অভিজ্ঞতা, তার উপাদান মুকুন্দরামের কাব্যে সুপ্রচুর। নিদয়ার সাধভক্ষণ, কালকেতুর জন্ম, কালকেতুর নামকরণ সর্বত্রই কবির পর্যবেক্ষণ-ভাবনায় পরিস্নিগ্ধ। গুজরাট নগরের বর্ণনা চলমানতার সুরে বিধৃত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ সেখানে উপস্থিত। তাই

'মৎস্য বেচে চষে চাষ বৈসে দুই জাতি দাস

কলু নগরে পীড়ে ঘানি'

যেমন আছে, তেমনি আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকের মতো কবি-দৃষ্টির নিরপেক্ষতায় ধরা পড়েছে 'লম্পট পুরুষ আগেবারবধূগণ বৈসে

এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।।'

মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি নন, জীবনের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় তাঁর চিত্ত নিঃস্পৃহ। কিন্তু আমাদের দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রার ও সুপরিচিত ভাবসমূহের অভিব্যক্তিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মঙ্গলকাব্যের কবির শিল্পবোধ শিথিল ও অপরিণত । বিষয়-মহিমায় তাঁর চিত্ত থাকে অভিভূত। প্রকাশের মনোহারিতা তাঁর কাছে গৌণ ব্যাপার। কিন্তু একমাত্র মুকুন্দরামের কাব্যেই শিল্পবোধ ও চারুত্ব সৃষ্টি দৃশ্যমান। অতিপল্লবিত অহেতুক বাক্য-বিস্তারের স্তরে অর্থঘন সংক্ষিপ্তি, অনিয়মিত ভাবাবেগ ও ভক্তিবিহ্বল অস্বচ্ছতার স্থলে মিতভাষিতা ও তীক্ষ্ণ ভাস্বরতা, নির্বিকার প্রথানুবর্তনের স্থলে বাস্তব স্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধ-যান্ত্রিক পূর্ব রোমান্থনের স্থলে নতুন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক (দ্রষ্টব্য: 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', ভূমিকা, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) এইগুলি তাঁর রচনার ধ্রুব বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনা এক সচেতন, সমগ্র প্রসারিত মননের মৌন মধুরসে অভিষিক্ত।তাঁর শিল্পবোধ মার্জিত,জীবনবোধ সম্ভূত তার রসিকতা পূর্ববর্তীগ্রাম্য ভাঁড়ামোর যাবতীয় অশ্লীলতা স্বতন্ত্র।তাঁর কৌতুক কেবল কথার ঊর্ণজাল নয়, বঙ্কিম কটাক্ষে, অর্থগূঢ় মন্তব্যে ও মনোভাবে,জীবনদর্শনের নানা মুক্তির বিস্তার হতে তা ময়ূর কণ্ঠীর মতো সাত রঙে বিচ্ছুরিত হয়।

বায়ুমণ্ডলে বাস করে বাতাসের চাপ এড়ানো যায় না। মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত জীবনও তাই 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে ভাস্বর। সার্থক উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন প্রতিফলিত। 'মাদাম বোভারি-র বিশ্ব বিশ্রুত ঔপন্যাসিক 'ফ্লবেয়ার'-এর সত্যোচ্চারণ-_ "Madam Boveri c'est moi (madam boveri is me)"-'Oliver twist' এবং 'David Copperfield'-এর মধ্যে আমরা পাই ডিকেন্স কে । শরৎচন্দ্র,বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন অনায়াসলভ্য ।মুকুন্দরামের কাব্যেও ব্যক্তিগত জীবনরস প্রবাহিত। দারিদ্রের ক্রূর ব্যথার মূর্তি তাঁকে প্রতিনিয়ত

আলিঙ্গন করতে হওয়ায় তাঁর সেই নির্যার্তিত অভিজ্ঞতা এবং গোপন বেদনা কাব্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই তৎকালীন বঙ্গসমাজের বহু চেনা চরিত্র তাঁর কাব্যে একান্ত বাস্তব অনুভূতিতে ধৃত। তাদের বিচিত্র পৃথিবী সাধারণের মনে বিস্ময়ের দ্বার খুলে দেয়।,যুগ ও সমাজের যে চিত্রাঙ্কন তাঁর রচনাশৈলীতে সুস্পষ্ট তা সে কোন সাহিত্যের পক্ষেই ঐশ্বর্য বিশেষ। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে মুকুন্দরাম এক দীপ্তিমান নক্ষত্র ।

৩.৮- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্র

কবি জীবনানন্দ দাশ ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থে বলেছিলেন: “কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা, মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।”একথা অনস্বীকার্য, মঙ্গলকাব্য মাত্রেই সমাজের চিত্রাল্পনা। “চণ্ডীমঙ্গলকাব্য”ও তার ব্যতিক্রম নয়। তথ্যগত সাক্ষ্যে সুস্পষ্ট, মুকুন্দরামের কাব্যে সমাজচিত্র ইতিহাসের দিক থেকে ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশের এক মূল্যবান অ্যালবাম। আমরা জানি, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী কবির নিজস্ব কল্পনার ফসল নয়। ঐতিহ্যের ধারায় প্রাপ্ত কাহিনীর প্রথানুকুল পথেই কবির বিশ্বস্ত পদচারণা। তার মধ্যে কোন লেখকের লেখায় প্রথার প্রস্তরশৈল ভেদ করে আপন প্রতিভা ও জীবনাদর্শের বিশিষ্টতার জোরে কতটুকু নবীনতা অভিব্যক্ত তা সমালোচকের পক্ষে প্রায় আণুবীক্ষণিক অনুসন্ধানের কাজ। তবু মনে হয়' মুকুন্দরামের কাব্য মধ্যযুগের সমাজচিত্রের বৃহত্তম আশ্রয়ভূমি।

মুকন্দরামের কাব্যের নাম ‘অভয়ামঙ্গল’। এই কাব্যে সমাজদৃশ্য সর্বত্রই লক্ষ্যগোচর। তবু উল্লেখযোগ্য আলোচনার অংশগুলি হল-

(১) গ্রন্থোৎপন্তির কারণ-বর্ণনা অংশ।

(২) পারিবারিক প্রসঙ্গ।

(ক) হর-গৌরীর সংসার-বর্ণনা।

(খ) ব্যাধ-পরিবার তথা কালকেতু-ফুল্লরার জীবনযাপন চিত্র।

(৩) চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন।

(৪) কালকেতুর অঙ্গুরীয়-বিক্রয়ের সময় মুরারি শীল ও তাঁর পত্নী পরিচয়।

(৫) কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুদত্তের আগমন, মুসলমান-বীবর-কায়স্থ-গোপ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি-সম্প্রদায়ের আগমন।

(৬) গুজরাট নগরের বসতি বিবরণ।

(৭) হাটপত্তন ইত্যাদি।

মুসলিম শাসকশ্রেণীর প্রাথমিক অবস্থায় এদেশে অত্যাচারের ঘটনা ইতিহাসে সুবিদিত। সেই ধরনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশ ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে ঘুমন্ত ব্রত কথা মতো শান্ত পল্লীবাংলার জনমানসে নেমেছে আশঙ্কার ধ্বস। ডিহিদার-পোদ্দার-উজীরের অত্যাচার ক্রমশই বেড়েছে। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে মুসলমান শাসকশ্রেণীর বিদ্বেষ হয়েছে ঘনীভূত। এই বিদ্বেষের পরিচয় বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে। মুকুন্দরামের কাব্যে পাই এর ব্যাপকতম ও সুক্ষ্মতম প্রকাশ-

‘পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পালায় পাছে

দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।

প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরেরে কুড়ালি

টাকায় দ্রব্য বেচে দশ আনা।।’

যুগের এই সঙ্কটময় কালাপাহাড়ী মুহূর্তে কবিকে দেশত্যাগ করে যাত্রা করতে হয়েছে অজানার উদ্দেশ্যে। পথশ্রমে ক্লান্ত কবির সে সময়কার নিরাসক্ত বর্ণনাঃ

‘তৈল বিনা কৈল স্নান করিনু উদক পান

শিশু কাঁদে ওদনের তরে।‘

এ কথা অনস্বীকার্য, Proverty is very good in poems , but very bad in the house , very good in maxims and sermons , buty very bad in

practical life.-H.W.Beecher. বহু সমালোচকের তাই সুচিন্তিত অভিমত, এর মধ্য দিয়ে কবির 'না-বলা বাণীর গোপন ব্যথা রেখায়িত। কিন্তু মুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কবির সেই অন্তরবেদনার রক্তবিন্দু একাব্যে রসসিন্ধু হয়ে ওঠে নি। কেননা মুকুন্দরাম দুঃখের অভিজ্ঞতা হয়ত লাভ করেছিলেন, কিন্তু আজীবন যে তাঁকে দুঃখের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কাব্যের মধ্যে তার পরিচয় নেই। দেশত্যাগের পরে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ধন্য অবস্থার অস্বাচ্ছল্য যে কবিকে দুঃখ দিয়েছে তারও কোন প্রমাণ কাব্যে নেই। প্রকৃতপক্ষে, দুঃখের দু-একটি কথা থাকলেই কবিকে সম্পূর্ণভাবে 'দুঃখবাদী' বলে চিহ্নিত করা যায় না। প্রবল ঘটনা-তরঙ্গের শিখরকে দুই হাতের মুষ্ঠিতে প্রচণ্ড চেপে উল্লাসের বিপুলতাকে তিনি আকণ্ঠ পান করতে চান নি। তাই শান্তির দস্যুর প্রতি কবির সুশাণিত বিদ্রুপ বা ক্রোধোদীপ্ত অভিশাপ অনুপস্থিত। উদ্ধত স্বৈরাচারী রাজশক্তি কবি- মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল সেই ক্ষত আজ বিলুপ্ত, সেই ক্ষতের জ্বালাও হয়ত কবে মুছে গেছে, শুধু আছে সেই ক্ষতের একটি স্মৃতিচিহ্নরেখা। 'বিগলিত-করুণার-জাহ্নবী-যমুনায়' কবি চিত্ত অভিষিক্ত বলেই আধুনিক কবির মত তিনি বলতে চান নি- "ঘৃণায় সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায়" (বিষ্ণু দে)।

চণ্ডীমঙ্গলের সমাজচিত্র একান্তভাবেই বাস্তব। তৎকালীন জীবনে সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের সংস্কার ও বিশ্বাস তাই দ্বাদশী তিথিতে ধর্মকেতু ও নিদয়া ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর সেবা করায় নিদয়া দেবীর কাছে পুত্রবতী হবার বর লাভ করেন।

প্রসূতির সাধভক্ষণ সমাজের চিরপ্রচলিত বিশ্বাস। সন্তানসম্ভবা নারী নিদয়ার মুখে অরুচি। প্রিয়জনের সান্নিধ্য এই সময়েই মেয়েদের প্রয়োজন, তাই নিদয়া কালকেতুর ভাবী মাতা বলেনঃ

"জ্ঞাতিবন্ধু নাহি আর যে বহে ঘরের ভার।
নিয়তি আমার প্রতিকূলী।"

সাধভক্ষণের তালিকায় আছে বাঙালি সমাজের রন্ধন সংস্কৃতির পরিচয়। তাইঃ

'লবণ কিছু দিয়া বাড়া নকুল গোধিকা পোড়া

হংস ডিমে কিছু তোল বড়া।”

তীক্ষ্ণ সমাজবোধে কবি এভাবে নিদয়ার সাধভক্ষণকে করেছেন বাস্তবসম্মত। কালকেতু জন্মে বড় হল। পেশায় সে ব্যাধ। শারীরিক শক্তি তার হাতীর মতন। রূপ যেন কুঁদে গড়েছেন মদনদেব। ধর্মকেতু ঘটক লাগিয়ে সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন চিরকালীন বাঙ্গালি পিতার মতো। বিবাহের আচার, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি সবই বাঙালি সমাজের উৎসব। অনার্য বিবাহের কিছু “কিছু প্রথাও চণ্ডীমঙ্গলে আছে। বরকন্যার ছাউনি, বেয়াইয়ের পায়ে কড়ি দিয়ে প্রণাম করাটা Fertility cult- এর পর্যায়ে পরে। কালকেতুর ভোজনতালিকাও বিচিত্র।

পশুগণের দেবীর কাছে ক্রন্দন পযায়িটি রূপকধর্মী। তাই তাদের জবানীতে তৎকালীন সময়ের রাষ্ট্রনৈতিক দুর্বিপাকের ছবিটি প্রতিফলিত। পশুরা যা জানিয়েছে তা পশুদের কথা নয় আমাদের সমাজের অত্যাচারিত মানুষের অসহায় কাতরোক্তি। ভালুক বলেছেঃ

‘উঁইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।

নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।‘

এই কথায় দুর্বল অত্যাচারিত মানুষের করুণ অসহায় দিকটি পরিস্ফুট।

পশুশিকার ও পশুজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় ব্যাধসমাজের জীবিকা। পুরুষরা মৃগয়া করত ব্যাধনারীরা তা হাটে বেচত। ফুল্লরার বারমাস্যার দরিদ্র মানুষের গৃহস্থলীর বাস্তব ছবি চিত্রিত। বৈশাখ মাসে ব্যাধেদের ঘর ‘নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে’ । শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা ব্যাধের স্ত্রী মাংসের পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ যেদিন নিরামিষ ভোজন করত সেদিন মাংস বিক্রি হত না। মাংস-বিক্রয়ে সবসময় ব্যাধ-নারী ঠিক সময়ে দাম পেত না। ধার রাখার রেওয়াজ ছিল। মুরারি শীলের মতো লোকও মাংসের দাম বাকী রাখত। সাধারণ অনার্য নারীদের পরণে ছিল হরিণের ছড় ও খোসলা। মাটিতে গর্ত কেটে আমানি রাখা হত।

সতীন-সমস্যা ছিল মধ্যযুগে প্রবল। ফুল্লরা দারিদ্রের মধ্যেও দেবী চণ্ডীর মতো রূপসী নারীকে তাড়াতে চেয়েছে। চণ্ডী প্রতি ফুল্লরার উপদেশ ছিলঃ

"সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে

অভিমানে ঘর ছাড় কেনি"।

বহুবিবাহ করেছেন ধনপতি সওদাগর। দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তানহীনা ও বিগতযৌবনা হলে পুরুষরা বিয়ে করত।

কালকেতুর রাজত্বে বিভিন্ন জাতির আগমন সমাজ-কাঠামোরই পরিচায়ক। কায়স্থের মধ্য ঘোষ, বসু, মিত্র উপাধি ছিল। এছাড়া সমাজে গোপ, তেলি, গন্ধবণিক, কাঁসারি, সুবর্ণবণিক, ধীবর, বারুই, নাপিত, দরজী ও ডোম সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বারবধূগণও এক জায়গায় বসতেন। মালতী, মল্লিকা, চাঁপা, জবা, টগর, অশোক ফুলে বাগান ছিল সুশোভিত। বক, ডাহুক, সারস পাখিরা বাংলারই নিজস্ব পাখি। বণিক খণ্ডে দুর্বলা দাসীর মতো মেয়েরা দুই সতীনে ঝগড়া বাধিয়েছে। বাংলার বণিকরা যে সমুদ্রযাত্রা করত তার পরিচয় মনসামঙ্গলে আছে। চন্তীমঙ্গলেও ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত সমুদ্রযাত্রা করেছে।

৩.৯- অনুশীলনী

১) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি কয়টি ও কি কি? প্রত্যেক কাহিনী সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২) মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তির কারণ আলোচনা করুন।

৩) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৪) চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সর্ব শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কবি কৃতিত্বের মূল্যায়ন করুন।

৫) কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬) কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের মুরারী শীল ও ভাড়ুদত্তের চরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দরামের দক্ষতার পরিচয় দিন।

৮) কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দিন।

৯) চন্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সমাজ চিত্রের পরিচয় দিন।

৩.১০- গ্রন্থপঞ্জি

১. চন্ডীমঙ্গল- সুকুমার সেন

২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- (প্রথম খন্ড) সুকুমার সেন

৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫. কবি মুকুন্দরাম- ক্ষেত্র গুপ্ত

৬. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- সনৎ কুমার নস্কর

৭. কবিকঙ্কণচণ্ডী- তরুণ মুখোপাধ্যায়

৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা- সুখময় মুখোপাধ্যায়

১০. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৪- ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন দিক

বিন্যাসক্রম

৪.১- উদ্দেশ্য

৪.২- ধর্ম ঠাকুরের উৎস ও বৈশিষ্ট্য

৪.৩- ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

৪.৪- ধর্মমঙ্গলের কবিগন

৪.৫- ধর্মমঙ্গল : রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য প্রসঙ্গ

৪.৬- ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা

৪.৭- ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যতা

৪.৮- ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচার

৪.৯- ধর্মমঙ্গলের সমাজজীবন

৪.১০- অনুশীলনী

৪.১১- গ্রন্থপঞ্জি

৪.১- উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে কালের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি যুগে বিভক্ত করা- হয় প্রাচীন যুগ (৯০০-১২০০), মধ্যযুগ (১৩৫০-১৭৬০) এবং আধুনিক যুগ (১৭৬০-বর্তমান কাল পর্যন্ত) এবং মধ্যবর্তী কালে ১২০০-১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে (কোন সাহিত্য নিদর্শন না থাকায়) 'অন্ধকার যুগ' নামে অভিহিত করা হয়।প্রত্যেক যুগে সমাজ

কাঠামো ও মানব জীবনের রূপের ভিত্তিতে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কেননা কোন দেশের ও কালের সাহিত্য থেকে সেই দেশ ও কালের মানব জীবনের বিন্যাস সন্ধান করা যায়। মধ্যযুগের মধ্য পর্বে একটি বিশেষ লগ্নে 'ধর্মমঙ্গল 'কাব্যচর্চার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সূচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য চর্চার ধারা। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের ধারা তে ধর্মমঙ্গল একটি নবতর সংযোজন। আলোচ্য একক পাঠ থেকে কতকগুলি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে-ধর্ম ঠাকুরের উৎস, বৈশিষ্ট্য,কাব্য কাহিনী ,কবিগণের পরিচয়, রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য প্রসঙ্গ, ঐতিহাসিকতা , স্বতন্ত্রতা , চরিত্র বিচার ও সমাজপরিচয় ইত্যাদি।

৪.২- ধর্মঠাকুরের উৎস ও বৈশিষ্ট্য

"ধর্মঠাকুরের আদিতম রূপ যাই হউক না কেন, যে যুগে তাঁহাকে পাইতেছি তাহা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য –সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট"।-সুকুমার সেন।

ধর্ম ঠাকুর হচ্ছেন একখণ্ড পাথর। কোথাও এই পবিত্র পাথরটি কূর্মাকৃতি , কোথাও ডিম্বাকৃতি, বা এই দুইয়ের কাছাকাছি। এর কাছাকাছি। কখনো আবার তার লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে, আর তার গায়ে থাকে পিতলের পেরেক বসানোর চক্ষু-ভক্তদের দান।নির্জন স্থানে, চালাঘরে বা মন্দিরে তার স্থান, কোথাও তিনি ধর্মরায়,বুড়ারায়, কালুরায়, যাত্রাসিদ্ধি রায় ইত্যাদি নামে পরিচিত।ডোম জাতীর লোকেরা এর পূজারী হন- যিনি পন্ডিত বা দেবাংশী নামে পরিচিত এরা নিম্নবর্গের লোক গ্রাম-গঞ্জে 'দেয়াশী' নামে পরিচিত।এরা পূজারী হলেও ব্রাহ্মণ দের পৈতের পরিবর্তে তামার তাগা পরে। কোথাও নিত্য পূজা হয়, আবার কোথাও বাৎসরিক পূজা সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়।দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য মানত করলে ধর্ম ঠাকুরের স্থানে পাঁঠা ,হাঁস ,পায়রা ,মুরগি ,শূকর বলি দেওয়া হয়। এই ধর্ম ঠাকুরের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব নিয়ে নানা প্রকার মতভেদ আছে।ডঃ সুকুমার সেন ধর্ম ঠাকুরকে বরুণ দেবতা রূপে গ্রহণ করেছেন আবার তিনি ধর্মের পরিকল্পনায় সূর্য-তনয় যমেরও কিছু কিছু প্রভাব দেখেছেন। তবে এ ধরায় মূলতঃ হিন্দুর যমরাজ নন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি হলেন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের (বুদ্ধ –ধম্ম- সংঘ) মধ্যম রত্ন।

বৌদ্ধ ত্রিশরণে অন্যতম হলো ধর্মং শরণং গচ্ছামি। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ স্মৃতি বহন করেছেন এই ধর্ম ঠাকুর।বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক শূন্যপুরাণ প্রকাশ করে সেখানেও ধর্মঠাকুর বিষয়টিকে বৌদ্ধ যুগের বাংলা সাহিত্য ঘোষণা করা হয়। সুনীতি বাবু ধর্মকে কূর্ম দেবতা বলে মনে করেছেন।

ধর্ম ঠাকুর সূর্যদেবতা এইরকম মতবাদ একসময় খুব জনপ্রিয় হয়। ডঃ সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, এরা ধর্মকে সূর্যদেবতার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। ডঃ সেন মল্লসারুল থেকে পাওয়া তাম্রশাসনে একটি সূর্য মূর্তিকে ধর্মনগরের মূর্তি বলে মনে করেন। ধর্ম ঠাকুর যে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন এর পিছনে কতগুলি যুক্তি আছে-

১) সূর্য শুধু হিন্দু বা পারসিক দেবতা নন। দ্রাবিড়- অস্ট্রিক নানা আদিবাসীরাও বাংলার চারিদিকে সূদেবতার উপাসনা করেছেন-বাংলার মেয়েদের ব্রতকথা সূর্য বড় দেবতা। সুতরাং এই সূর্য ধর্ম হওয়া অসম্ভব নয়।

২)' ধর্ম' কথাটির উৎপত্তি অস্ট্রিক 'ধুম্' শব্দ থেকে। ধূম্=কূর্ম বা কচ্ছপ। ধর্ম দেবতা ও কচ্ছপের আকৃতি। আর আদিবাসীরা সূর্যের যে উপাসনা করে করে তাও কচ্ছপের মতো।

৩)ধর্ম ঠাকুর কুষ্ঠ এবং অন্ধত্ব রোগ নিরাময়কারী দেবতা এবং বন্ধ্যত্ব প্রতিকারের সমর্থক। কুষ্ঠ ইত্যাদি নিরাময়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূর্যের ভূমিকা কম নয়।

৪)উড়িষ্যার কোন কোনারকের সূর্য মন্দিরে সূর্য মূর্তি সঙ্গে ধর্ম ঠাকুর সম্পর্কিত এদেশীয় কবিদের বর্ণনা অনেকটা মিল আছে। কোনারকের সূর্য দেবতার বেশ-

'হাঁসা ঘোড়া জোড়া পায়ে দিয়া মোজা।

অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা।।'

৫)ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুর এবং সূর্য অভিন্ন রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় শালে ভর দিয়ে মৃত্যুবরণ করলে- স্ত্রী হত্যার পাপ যায় সূর্য গরাসিতে ।

রঞ্জাবতী ধর্ম পূজা করতে গিয়ে সূর্যকে অর্ঘ দিয়েছেন-

'অনুগ্রহ কর প্রভু শচলে দিব ভর।

অর্ঘ্য গ্রহণ কর ঠাকুর দেব দিবাকর।।'

লাউসেন হাকন্দে নিজদেহ নয় খন্ড করে ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন।

সূর্যের স্বাভাবিক গতির বৈপরীত্যে সাধন বা পশ্চিমোদয় দেখানো লাউসেনের উদ্দেশ্যে। আসলে ধর্ম বা সূর্য দেব সহায় বলেই তার পক্ষে অসাধ্য সাধন সম্ভব। এছাড়া ধর্মরায় রাজও ধর্মমঙ্গল গানে শ্বেত- অশ্ব- আরোহী সিপাহী রূপেও এই ধর্মরায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হয়তো ডোমের মতো দেশীয় যোদ্ধৃ জাতির এই যুদ্ধ দেবতা ধর্ম - বিজয়ের দিনে ভক্তদের চোখে বিজয়ী তুর্ক-সিপাহী পরিকল্পনাও এসে মিশেছে।

ধর্মঠাকুর বৈদিক দেবতা না হলেও বিবর্তিত হতে হতে আজ ধর্মঠাকুরে অনেকটাই আর্যীকরণ ঘটেছে। পণ্ডিতরা ধর্মঠাকুরকে জল এবং বরুণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ বরুণ ও ধর্ম উভয় আবার বৃষ্টির দেবতা । ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায় যে রাঢ় অঞ্চলের খরা প্রবণ এলাকায় বৃষ্টির জন্য ধর্ম ঠাকুরের পূজা করা হয়। রাঢ়ের কোন কোন গ্রামে ধর্ম ঠাকুরের নাম মেঘরায়। আবার যমের অন্যতম নাম ধর্মরাজ। বর্ধমান জেলার কোন কোন গ্রামে ধর্মের গাজনে মানুষের মৃতদেহ নিয়ে নৃত্যগীতি অনুষ্ঠিত হয় ।রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।লাউসেনও হাকন্দ তপস্যায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ।তাই মনে হয় ধর্ম ও যম এক না হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে

ধর্মঠাকুরকে শূন্যপুরাণে নিরঞ্জন বলা হয়েছে। কৃষিজীবী সমাজে তার প্রভাব ছিল তাই ধর্মমঙ্গলের শিবের কৃষিকার্যে বর্ণনা আছে। ধর্ম পূজা বিধান গ্রন্থে ধর্মের প্রনাম প্রনাম মন্ত্রটি প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয়-

'ওঁ অধো ন ঊধ্বং শিবো ন শক্তিঃ

নারী ন পুরুষো ন চ লিঙ্গ মূর্তিঃ

হস্তং ন পাদং ন রুপং ন ছায়া

তস্মৈ নমস্তে নিরঞ্জনায়।।'

ধর্ম ঠাকুর সার্বজনীক দেবতা গ্রামের বহু লোকের সহযোগিতায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর পূজা ডোম ,হাড়ি,মুচি শ্রেণীর মানুষ করেন বলে ধর্ম ঠাকুর বেদাচার বহির্ভূত । তবে আর্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রচেষ্টাও দেখা যায় । রামাই পণ্ডিত তাঁর শূন্যপুরাণে বলেছেন-

'রামাই নামেতে পন্ডিত পবিত্র কায়।

রক্তবর্ণের তাম্র করেতে চড়ায়।।'

এখানেও ' রক্তবর্ণ' শব্দটি থেকে সূর্যের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

ধর্ম ঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয়ের বিষয়টি নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও একথা মানতে হয় যে ধর্ম ঠাকুরের নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সর্বত্রই ধর্ম ঠাকুরকে আর্য দেবতা রূপে গ্রহণ করার জন্য প্রচুর ওকালতি করা হয়েছে। ধর্ম পূজা বিধান ধর্মকে নিরাকার সূর্য রূপে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে-

'বাড়ি মোর বল্লুকার।

পূজা শ্রী নৈরাকার।

শূন্য মূর্তি ধ্যান করি।

সাকার মূর্তি পূজি।'

সাকার - নিরাকার যাই হোক না কেন, ধর্মঠাকুরকে লৌকিক দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে পরাধীন বাঙালি(আর্য-অনার্য) সঙ্ঘবদ্ধ হবার সংকল্প গ্রহণ করে।

ধর্ম ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য-

ক) ধর্ম ঠাকুর এর মধ্যে আর্য, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলামের প্রভাব আছে।

খ) ধর্ম ঠাকুরের কোন নির্দিষ্ট অবয়ব নেই কোথাও আছে অশ্বারোহী বীর মূর্তি। কোথাও শিলা স্তুপ , কোথাও কূর্ম মূর্তি, কোথাও বা ধর্মঠাকুরকে শুন্য,অনাদি,অনাদ্য, নিরঞ্জন বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

গ)ধর্ম ঠাকুরের নামের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে যে রায় শব্দটি যুক্ত আছে তা 'রাজ' শব্দ থেকে এসেছে।

ঘ) বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পৃথক নাম আছে বেলডিহা গ্রামে বাঁকুড়া রায়, শ্যামবাজার গ্রামে দলু রায়, দেপুরে জগৎ রায়, গোপালপুরে কাঁকড়া বিছে, এবং পশ্চিম পাড়ায় ধর্ম ঠাকুর যাত্রাসিদ্ধি নামেই পরিচিত।

ঙ)ধর্ম ঠাকুর ক্রুদ্ধ হলে কুষ্ঠ রোগ হয়। ধর্ম সন্তুষ্ট হলে পশ্চিমে সূর্যোদয় হয় ।ধর্মের উপাসনায় বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে। কুষ্ঠ ব্যাধি দূর হয়। তিনি ফসল উৎপাদনেরও দেবতা।

চ) ধর্ম ঠাকুর কে সর্ব শুক্ল বলে কল্পনা করা হয়। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন -

' ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি

ধবল বরণে বাড়িঘর।

ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনি লোভা

আলো কৈলে পরম সুন্দর।।'

ছ) সূর্য দেবতা যেমন অশ্ব চালিত রথে আরোহন করেন ,ধর্মঠাকুরের সঙ্গেও তেমনি ঘোড়ার সম্পর্ক আছে ।কোথাও কোথাও ধর্ম ঠাকুরকে পূজায় মাটির ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়।

ধর্ম পূজা পদ্ধতি-

ক)ধর্মঠাকুর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবীর মত পূজা প্রতিষ্ঠা লাভের প্রতিযোগিতায় নামেনি । ক্রোধ হিংসা তার মধ্যে নেই ।ভক্তকে তিনি কোন লোভ দেখাননি ।তবে দুষ্টের দমন এবং প্রকৃত ভক্তকে কৃপা করা তাঁর বিশিষ্টতা।

খ)ধর্ম পুজায় উচ্চবর্ণের অধিকার ছিল না কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকলেও প্রধানত ডোম পুরোহিতই এই পূজা করে থাকেন। পূজারীদের পন্ডিত উপাধি দেওয়া হয়। অবশ্য ডোম ভিন্ন অন্য জাতীয়রাও ধর্ম পূজার অধিকারী।

গ)ভক্তিভরে পূজা করলে ধর্ম কি বা করবেন এই বিশ্বাস নিয়ে ভক্তরা কঠিন নিয়ম পালন করে থাকেন।

ধর্মের মন্দিরে, পীঠস্থানে, গাছ তলায় চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শ্রাবন্তী পূর্ণিমার মধ্যে যেকোনো বারোদিন আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা হয়,কখনও সাদা ফুল , সাদা পায়রা , সাদা পাঁঠা দেওয়া হয়।

ঘ)চড়ক এবং গাজনের সময় কঠিন নিয়ম পালন ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়েই ভক্তরা ধর্ম পূজা করে থাকেন আগুনেড় বঁটিতে ঝাঁপ দিয়ে জিভে এবং পিঠে বঁড়শি ফুঁড়ে শূন্যে আবর্তিত হয়ে কঠিন নিয়ম পালন করেন ভক্তরা।

ঙ) পূজা তিন রকম ভাবে হয়ে থাকে নিত্য পূজা,বার্ষিক পূজা এবং ঘরভরা পূজা বা গৃহভরণ পূজা।

রামাই পন্ডিতের শূণ্যপুরাণ-

ধর্ম ঠাকুরের পূজা পদ্ধতি পাওয়া গেছে রামাই পন্ডিতের নামে। তাঁকেই ধর্মপূজার আদি পুরোহিত বলে মনে করা হয়। প্রচলিত কাহিনী এই- আদিত্যদেব ধর্মের আদেশে ব্রাহ্মণ বংশে বিশ্বনাথ মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ধর্মঠাকুর স্বয়ং তামার উপবীত দিয়ে নিজের পূজারী করে দিলেন। অধিক বয়সে ধর্মের নির্দেশে রামাই পণ্ডিত বিবাহ করেন।তাঁর পুত্র ধর্মদাস ধর্মের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে কিছু অনাচার করলে পিতা অভিশাপ দেন, ‘হইবি ডোমের পুরহিত’ তবে একথাও বলেন যে

ডোমের পুরোহিত হলেও সে ও তার সন্তানেরা ব্রাহ্মণের মতোই শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করবে।

রামাই পন্ডিতের 'শূন্যপূরান'- এ বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের লেখা বলেই মনে করা হয়। গ্রন্থটি সম্ভবত সপ্তদশ -অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। এতে আছে সৃষ্টি পত্তন , ধর্মপূজার ব্রত, উপাসনা ইত্যাদি ।'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশটিতে সময়কালের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক , সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম উপাসক বৌদ্ধদের উপর হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যাচার চলেছিল তুর্কি আক্রমণের সময় মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে থাকলে বৌদ্ধরা খুশি হয়। তারা মনে করে স্বয়ং ধর্মরাজ তাদের রক্ষা করতে এসেছেন। এই বিরোধের বিষয়টি এখানে বর্ণিত হয়েছে-

'ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর আদম হৈল শূলপাণি।

গণেশ হৈল কাজী কার্তিক হৈল গাজী ফকির হৈল যত মুনি।

আপনি চন্ডিকা দেবী তিঁহ হৈল হায়া বিবি পদ্মা হৈল বিবি নূর।

যতেক দেবতাগণ হৈয়া সবে একমন প্রবেশ করিল যাজপুর।'

রামাই পন্ডিতের কাহিনী যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ 'অনাদ্যের পুঁথি' নামে ডঃপঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত আরেকখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থেও রামাই পন্ডিতের জীবন কথা , ধর্ম পূজার পদ্ধতি এবং মূল্যবান তথ্য আছে ।রামাই এর পুত্রের নাম এখানে ধর্মদাস নয় ,শ্রীধর।

৪.৩- ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

ক. প্রথম কাহিনী

রাজা হরিশচন্দ্র ও রানী মদনা নিঃসন্তান ছিলেন বলে সমাজ থেকে অনেক বিদ্রুপ সহ্য করতে হত। মনের কষ্টে রাজা রানী একদিন এক নদীর ধারে পেলেন ধর্মের ভক্তদের। তাঁদের পূজা দেখে ও ধর্মঠাকুরের মহিমার কথা শুনে পুত্র লাভের আশায় রাজরানী ভক্তিভরে ধর্ম ঠাকুরের পূজা করলেন।পূজোয় তুষ্ট ধর্মঠাকুর পুত্র লাভের দিলেন ।তবে একটি শর্ত ছিল, পুত্র জন্মালে

যথাসময়ে তাকে ঠাকুরের কাছে বলি দিতে হবে পুত্রের মুখ দেখবার আশায় রাজা হরিশচন্দ্র সে প্রস্তাব মেনে নেন। ধর্ম ঠাকুরের বরে রানীর যে পুত্র হলো তার নাম রাখা হল লুইধর। সে বড় হল। ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় লাউসেন বিজয়ী হন। আনন্দের আতিশয্যে রাজা-রানী ধর্মের কাছে পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হলেন তারপর একদিন ধর্ম ঠাকুর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেই দিন একাদশীর ব্রত। রাজা ব্রাহ্মণ কে ইচ্ছামতো খাবার দিতে চাইলে আর যায় কোথায়? ছদ্মবেশী ধর্মঠাকুর লুইধরের মাংস আহারের জন্য তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা প্রচন্ড বেদনা বুকে চেপে অবিচলিত চিত্তে কেটে মাংস রান্না করলেন ।রাজার নিষ্ঠায় খুশি হয়ে ধর্ম ঠাকুর পুনর্জীবিত করলেন লুইধরকে। মহানন্দে রাজারানি ধর্মঠাকুরের পুজো আরম্ভ করলেন।

দুঃখে বিমর্ষ রঞ্জাবতী ধর্মনগরের গাজনের উৎসব থেকে ধর্মঠাকুরের মহিমার কথা শোনেন। ধর্ম ঠাকুরের পূজায় অপুত্রক পুত্র লাভ করেন। রঞ্জাবতী পুত্রের আশায় ধর্মের তপস্যা করে শেষ পর্যন্ত শালে ভর দিয়ে প্রাণ দিলেন। অবশেষে ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে পুত্র হবার জন্য বরদান করলেন। যথাসময়ে রঞ্জাবতীর পুত্র জন্মালো -পুত্র একজন শাপভ্রষ্ট দেবতা ।নাম লাউসেন। এই সংবাদে গৌড়েশ্বর খুশি হলেও মহামদ জ্বলে উঠলেন রাগে। লাউসেনের অনিষ্ট করার জন্য তিনি নিয়োগ করলেন সর্বশক্তি। তাঁর নির্দেশে ইন্দা মেটে নামে এক চর লাউসেনকে অপহরণ করে। পুত্রশোকে রঞ্জাবতী তখন উন্মাদ। ধর্মঠাকুর তাকে আরেকটি পুত্র দান করেন, সে পুত্রের নাম কর্পূরধবল । ধর্মঠাকুরের আদেশে হনুমান লাউসেন কে উদ্ধার করে এনে রঞ্জাবতীর কোলে তুলে দিলেন ।

লাউসেন ক্রমে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া অস্ত্রবিদ্যা বিশেষ দক্ষ হন। মল্লবিদ্যায় লাউসেন পটু। গৌড় পৌঁছেই মহামদের চক্রান্তে লাউসেন কারারুদ্ধ হন। কিন্তু দ্রুত বাহুবল দেখিয়ে গৌড়েশ্বর কে সন্তুষ্ট করে কারামুক্ত হলেন লাউসেন। ময়নাগর পেলেন লাউসেন। দেশে ফেরার পথে কালু ডোম ও লখ্যার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল। লাউসেন এদের নিয়ে ফিরলেন ময়নাগড়ে কালু হলো তাঁর সেনাপতি।

মহামদ চক্রান্ত করে লাউসেনকে দমন করতে পাঠালেন কামরূপরাজকে মহামদ ভেবেছিলেন কামরূপ রাজের হাতে পরাস্ত ও নিহত হবেন লাউসেন। কিন্তু কামাখ্যা দেবীর কৃপায় কামরূপের রাজাকে হারিয়ে তার কন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করলেন। মাহমদ জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলো ।মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর শিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া কে বিয়ে

করার জন্য উৎসুক হন ।লোহার গণ্ডার কেটে কানাড়াকে বিবাহ করলে লাউসেন। মহামদের ক্রোধ বাড়ল দ্বিগুণ হয়ে। অজয় নদীর তীরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের তুমুল যুদ্ধ হয়।

খ) দ্বিতীয় কাহিনী

ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক লাউসেন ।ধর্মঠাকুর মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক। স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতীর তাল ভঙ্গ হওয়ায় শাপভ্রষ্ট হয়ে তিনি মর্ত্যে বেনুরায়ের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করলেন। নাম হল রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর বড়দি গৌড়েশ্বরের পাটরানি ।আর বড় ভাই মহামদ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী।

ঢেকুরগড়ের অধিপতি কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের অধীন একজন সামন্ত রাজা। ইছাই ঘোষও গৌড়েশ্বরের আরেক সামন্ত রাজা। ইছাই চণ্ডীর বরপুত্র । অসীম তাঁর শক্তি। প্রচন্ডভাবে ইছাই বিদ্রোহী হয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে ।গৌড়েশ্বরের নির্দেশে তাকে দমন করতে গিয়ে কর্ণসেন হলেন পরাজিত। ছয়জন পুত্র ও পুত্রবধুরা যুদ্ধে নিহত হন। কর্ণসেন শোকার্ত হলে তাঁর সঙ্গে গৌড়েশ্বর নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়েছেন। বিয়ের পর কর্ণসেন রঞ্জাবোটীকে নিয়ে ময়না গড়ে নতুন সামন্ত রাজা হন।

কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ হওয়ায় মোহাম্মদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। রঞ্জাবতী মহামদের বোন। কর্ণসেন বৃদ্ধ বলে এই বিয়েতে মহামদের ঘোর আপত্তি ছিল। গৌড়েশ্বরের সভায় কর্ণসেনকে মহামদ আঁটকুড়া অর্থাৎ পুত্রহীন বলে বিদ্রুপ শুরু করে। ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের গোষ্ঠীর কাছে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

এবার অন্যভাবে মহামদ লাউসেনকে জব্দ করার জন্য সচেষ্ট হন লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাতে আদেশ দিলেন মহামদ। না পারলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হাকন্দ নামক স্থানে ধর্মঠাকুরের তপস্যা করে এই অসাধ্য সাধন করলেন লাউসেন।

লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ আক্রমণ করে ময়নাগড়। যুদ্ধে মারা যান কালু ডোম, ও লখাই ডোমণী ও তার পুত্রগণ। লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কলিঙ্গাও নিহত হন ।অবশেষে বীরঙ্গনা কানাড়ার কাছে পরাজিত হন মহামদ। দেশে ফিরে লাউসেন ধর্মের তপস্যা করে পত্নী ও অন্যান্যদের পুনঃজীবন দান করেন।মর্ত্যে ধর্ম পূজা প্রচলিত হয়। মহাপাপের জন্য মহামদের কুষ্ঠ হয়। দয়াপরবশ হয়ে বীর লাউসেন ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে সারিয়ে

তোলেন মাহমদকে। পরম গৌরবে কিছুকাল রাজত্ব করে লাউসেন সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করেন। পুত্র চিত্রসেন লাউসেনের সিংহাসনের অধিকারী হন।

৪.৪- ধর্মমঙ্গলের কবিগন

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয় গৌরব অতুলনীয়। কিন্তু কবিপ্রতিভা সেই তুলনায় নগণ্য মাত্র। এর একটি কারণ সম্ভবত দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে উচ্চবর্ণজাত প্রতিভাধর কবি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, বীররসাত্মক কাব্য হয়ে ওঠায় বাঙালির সংসার জীবন এবং অশ্রুভারাতুর হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবকাশ দেখা যায় নি। তৃতীয়ত, যুদ্ধ বর্ণনার অনভিজ্ঞ কল্পনা এবং পুরুষদেবতার নিরাকার কাঠিন্য কবিমনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। চতুর্থত, চন্ডী,মনসা ইত্যাদি অন্যান্য দেবী কল্পনায় মঙ্গলকাব্যের কবিরা ভারত- পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহের যে সুযোগ পেয়েছিলেন, ধর্মঠাকুর অবৈদিক হওয়ায় এই কাব্যের কবিরা কাব্য নির্মাণে সেই উপাদান স্বল্পতার অভাব বোধ করেছিলেন বলে মনে হয়। এই কাব্যধারা পঞ্চদশ শতক থেকেই ছড়া ও ব্রতকথা রূপে প্রচলিত ছিল।আঙ্গিক রীতিতে ছিল গান, পরে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সেগুলি কাব্যাকারে সংগ্রথিত হয়।

এই কাব্যধারার আদি কবির কাব্য নির্ণয়ে বিতর্ক আছে। তবে কবি মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, সীতারামদাস প্রমুখ পরবর্তী কবিদের কাব্যে প্রদত্ত তথ্যগত সাক্ষ্যে জানা যায় কবি ময়ূরভট্টের নাম। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রী ধর্মপুরাণ' নামে ময়ূরভট্টের কাব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ভাষা বিচারে প্রমাণিত হয় গ্রন্থটি অর্বাচীন ব্যক্তির রচনা। আবার 'সূর্যশতক' রচয়িতা সংস্কৃত কবি ময়ূরভট্টের সঙ্গে নাম সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন- " মনে হয় ময়ূরভট্ট কোন বাঙালি কবির প্রকৃত নাম নহে। সংস্কৃত সূর্যশতক রচয়িতা ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙালি কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।"

রূপরাম চক্রবর্তী:- সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত ধর্মমঙ্গল কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। লাউসেনের জন্ম থেকে আখড়ায় তাঁর মূল্ল বিদ্যা শিক্ষা পর্যন্ত কাহিনী- অংশ বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির নাম ' অনাদি মঙ্গল'। কবির জন্ম বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত কাইতি শ্রীরামপুর গ্রাম (এই শ্রীরামপুর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর নয়)। কবির পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী ছিলেন বড় পন্ডিত। কৈশোরে কবির পিতৃবিয়োগ হয় । দাদা রামেশ্বরের রুক্ষ মেজাজে কবি অতিষ্ঠ হয়ে গৃহত্যাগ

করে পাষণ্ড গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে এক ভট্টাচার্যের টোলে আশ্রয় নিয়ে বিদ্যা চর্চা করেন। কোন এক কারণে গুরুর সঙ্গে বিবাদ বাদে এবং কবি গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কৃত হন। সেখান থেকে তিনি উপস্থিত হন নবদ্বীপে পলাশনের বিলের কাছে। সেখানে ব্যাঘ্ররূপী ধর্ম ঠাকুর কবিকে দেখা দিয়ে কাব্য রচনার আদেশ করেন। অসম্মত দ্বিধাগ্রস্থ কবি এরালবাহাদুরপুর গ্রামে আসেন এবং সেখানে গোপভূমের এক গোস্বামী গণেশ রায়ের গৃহে আশ্রয় পান। এই আশ্রয়ে থেকে রূপরাম কাব্য রচনা করেন।

এই কাব্যে বর্ণিত কবি রুপরামের আত্মজীবনীতে তৎকালীন সমাজের পরিচয় আছে। কাব্যে কোন কোন পুঁথিতে আছে শাহ সুজার উল্লেখ। কাব্যের রচনাকাল সংশয়াছন্ন। সমালোচকেরা ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করেছেন। সে ক্ষেত্রে মনে হয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমে কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। এমনকি আদিরূপ রাম নামে আর এক কবির নাম পাওয়া গেছে ।

রূপরাম এর কবি প্রতিভা ছিল। তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘরোয়া সুরে কথা বলা। সেই জন্য পাঠক বা শ্রোতা তাঁর কাব্যে সহজে আকৃষ্ট হয়। আবার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও আছে , যেমন:

‘কপালে সিঁদুর পরে তপন উদয়।

চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়।।

চন্দ্র কোলে শোভা যেন করে তাঁরা গন।

ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ।।’

চরিত্রচিত্রণেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ইছাই ঘোষের ভবিষ্যৎ পরাক্রমের কথা যেমন তার বাল্য চিত্রে আভাসিত হয়েছে, তেমনি মহামদ চরিত্রের বিকৃতি না দেখিয়ে তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্দেশ করেছেন।মহামদ তাঁর প্রিয় পাত্রী রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ কর্ণ সেনের বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অভিমান সঞ্জাত স্নেহই তাকে লাউসেনের সর্বনাশ সাধনের প্রবৃত্ত করেছিল।

রুপরামের কাব্যে সপ্তদশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাসের আঞ্চলিক পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন বিনিময় -মাধ্যম হিসেবে তখন কড়ির প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের পণ্ডিতদের টোলে অভিধান, ব্যাকরণ, কালিদাস, পিঙ্গল এর ছন্দ সূত্র, নব্যন্যায়, মাঘ, মহামতি যাস্কের নিরুক্ত,

ইত্যাদি কবি ও লেখকদের রচনা পড়ানো হতো ।শিক্ষার কেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধ ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, জৌগ্রাম। সামাজিক রীতির পরিচয় পাওয়া যায় 'ষেটের ব্রত',একুশশা এবং অন্নপ্রাসন এর উল্লেখে সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় কোন রঞ্জাবতী বিবাহ উপলক্ষে মেয়েদের রঞ্জাবতী চোখে পুরুষ আকর্ষণকারী মন্ত্রপুতঃ কাজল (দুর্গাপূজায় সংগৃহীত) দানে।কবি রূপরাম কাব্যটির নাম 'অনাদ্যমঙ্গল' রূপে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের অংশ মাত্র প্রকাশিত হওয়াতে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থ বিচার সম্ভবপর নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে রুপরামের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। যে লাউসেনের কাহিনী -ছড়া ও- পাঁচালী ও ব্রত কথার সীমায় আবদ্ধ ছিল, রূপরাম সম্ভবত তাকে সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যের জগতে উন্নীত করেন। চরিত্র সৃষ্টি,বর্ণনাভঙ্গি এবং আত্মকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির কৃতিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন –"কোন কোন সময়ে তাঁকে প্রায় মুকুন্দরাম এর মত প্রতিভাশালী মনে হয়, বিশেষত করুন রস ও হাস্য পরিহাস তিনি মুকুন্দরাম এর সমকক্ষ। তাঁর প্রতিভা ছিল বলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী কবিরা অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন "রুপরামের আত্মকাহিনী মূলক অংশ বিষয়ে ডঃসুকুমার সেনের অভিমত বিশেষ মূল্যবান-" পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্পের মতো কোনো জীবন -রস -নিটোল রচনা থাকে তবে তাহা রূপরাম এই আত্মকাহিনী।

ঘনরাম চক্রবর্তী: ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বজন পরিচিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম পরিচয় স্বল্প,তুলনায় তাঁর 'অনাদি মঙ্গল' কাব্যের আয়তন এবং ইতিবৃত্ত সুবিস্তৃত ।অষ্টাদশ শতকে আবির্ভুত সম্পর্কে সবিশেষ সংবাদ দিয়েছেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং ড. সুকুমার সেন। বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরে অবস্থিত কইয়ড় পরগনার অন্তর্গত বাঁকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম হয়। পিতার নাম গৌরী কান্ত ,মাতার নাম সীতাদেবী ।কবি শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কবির পিতা গৌরীকান্ত তাকে রামপুরের টোলে পাঠান। সেখানে সুসংসর্গে ঘনরামের স্বভাবের পরিবর্তন হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন:

'অখিল বিদ্যার কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্তী

কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।'

মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ছিলেন সম্ভবত কবির পৃষ্ঠপোষক।

'শক লিখে রাম গুন রস সুধাকর' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখিত শ্লোক দেখে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, ঘনরামের কাব্য সমাপ্তির কাল ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর।অবশ্য এই সময় উল্লেখ করা হয়েছিল সমাপ্তির অনতি পূর্ববর্তী মুহূর্তে। কবি সত্যনারায়ণ পাঁচালী ও রচনা করেছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কিত জীবনী কথায় ঘনরামের ব্যক্তি বিবরন বিরলদৃষ্ট। সেখানে আছে কবির গুরু ভট্টাচার্যের কথা, নীলাচল গমন, রামচন্দ্রের দর্শন লাভ। গুরুর নির্দেশমতো রামায়ণ রচনা চেষ্টা ,শেষে ধর্মমঙ্গল লেখার নির্দেশ প্রাপ্তি ইত্যাদি তথ্যসমূহ।ঘনরামের কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল তবে অনেক স্থলে 'শ্রী ধর্ম সংগীত', ' মধুর ভারতী' ইত্যাদি নামেও অভিহিত কাব্যটি ২৪টি সর্গে ও বিভিন্ন পালায় বিন্যস্ত। মোট শ্লোক সংখ্যা ৯১৪৭টি। কাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত-

ক) হরিশচন্দ্র - লুই চন্দ্রের কাহিনী

খ) লাউসেনের কাহিনী।

কাব্যের আয়তন প্রায় মহাকাব্যের মত বিশাল। যদিও ভাব-গাম্ভীর্যে ও রচনা ভঙ্গিতে পাঁচালীর চিহ্ন সুস্পষ্ট।

কাব্যের স্থাপন পালায় 'নবীন নীরদশ্যাম জিনি কত কোটি কাম ' ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রেম জলরাশির উপর তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শেষ প্রস্থানের চিত্ররূপ বর্ণনা জীবন্ত। কিন্তু কবি দৃষ্টি রোমান্টিক কল্পনায় ভাবস্নাত হয়নি বরং লাউসেনের পৌরুষদীপ্ত জীবনের পরিচয়, তাঁর যোদ্ধা রূপের বিবরণে এই কাব্য উদ্দীপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কবির ঘনরামের শব্দ সচেতন কল্পনা শক্তি পাঠককে বিস্মিত করে:

'টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ ঢাল চাল ঢ়ন ঢ়ন

ঝন্ ঝান্ ঘন রণ ন।

দিঘিতে বিপরীত চৌদিকে চমকিত

মামুদা ভাবে পরমাদ।।'

ধর্মের বরপুত্র লাউসেন যেমন বীরযোদ্ধা তেমনি মানবিক গুণে মণ্ডিত । পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্ম পক্ষের নিষ্ঠা, নির্ভীকতা এবং চরিত্র রক্ষায় শুচিতায় সদা ভাস্বর। লাউসেন জননী রঞ্জাবতী স্নেহময়ী পুত্রের কল্যাণ কামনায় মগ্ন মাতৃমূর্তি:

‘কালি অতি শুভ দিন গৌড়ে তুমি যাবে।

অভাগীর রন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে।।’

পক্ষান্তরে লাউসেন জায়া কলিঙ্গা কানাড়ার মধ্যে বীরত্বের দিকটিকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।শঠতা ক্রুরতা ও প্রতিহিংসায় মহামদ চরিত্রটিও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।দুর্মুখা দাসী , কালু সেন, লখাই ডোম ,হরিহর বাইতি প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্র নির্মাণে ও কবি ঘনরাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন অর্থলোভী হরিহরের স্ত্রী প্রতি উক্তি:

‘হরিহর বলে শোনো বাইতির ঝি।

বসে কর বিলাস তোমার লাগে কি।।

ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।

অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাবো তোকে।।

অধর্মের বাধ্য বসু ধর্মের অকার্য।

আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য।।‘

লাউসেন ভ্রাতা কপূর সেনের চরিত্র নির্মাণে ও কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন ।জামতি নগরে বন্দী লাউসেনকে

দেখে স্বার্থপর কর্পূর পালিয়ে যায়। পরে লাউসেন মুক্ত হলে সে ফিরে এসে দাদাকে বলে-

‘কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।

কালি কোথা ছিলে ভাই কি বা দশা ।।

কর্পূর বলেন যবে বন্দি হলে ভাই ।

রাতারাতি গেছেনু ধাওয়া ধাই ।।

রাজার আদ্দানা করি জামতি লুঠিতে ।

লইয়াছি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে ।।

পথে শুনি বিজয়, বিদায় দেনু ভাই ।

লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ।।'

ধর্মমঙ্গল মুখ্যত বীর রসাত্মক কাব্য।তাই বীররসের প্রাধান্য এই কাব্যে বিশেষভাবে দেখা যায়; যেমন-

'মারমার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।

সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ।।

দুদল করে হানাহানি।।'

বীভৎস রসের বর্ণনায় ও শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। যেমন ডাকিনি পেত্নীরা-

'কাঁচা মাংস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে।

মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে।।'

কিন্তু করুন রসের বর্ণনায় আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস:

'শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে।

নিশায় নিধণ রণে, পিতামাতা বন্ধু গণে

দেখিতে না পেনু শেষকালে।।'

ঘনরামের রচনারীতি সংস্কৃত- নির্ভর ও মার্জিত। তাঁর কৌতুকরসে স্থূলতা থাকলেও ভাঁড়ামী নেই, বরং তির্যকতা আছে।

'চঞ্চল চরণ চারি চলনি

নির্মল বরণ বাড়ি বিনোদ মন্দির'

প্রভৃতি অনুপ্রাস অলংকারে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও দেখা যায় ঘনরামের কাব্য ত্রুটিমুক্ত নয়। এই কাব্যের ত্রুটি দেখা যায়: ক) বিশাল আয়তন এবং সুবিপুল ঘটনাসমূহ সুগ্রথিত করে প্রকাশের মতো উপযুক্ত কবিত্বশক্তি ও নৈপুণ্যের অভাব।

খ)অলৌকিক ঘটনা সমাবেশের ফলে কাব্যটির প্রধান চরিত্র লাউসেনের বীরত্ব ও শক্তি প্রকাশ অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হয়; যেমন তাঁর মৃত শিশুর মুখ দিয়ে কথা বলানো, নিজের মৃত সৈন্যদের জীবিত করা, পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানো ইত্যাদি।

গ) শাস্ত্রের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত দানে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা অব্যক্ত থেকে যায়।

ঘ) বর্ণনার মধ্যে এক যুদ্ধ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্র ক্লান্তিকর নীরস বিবৃতি চোখে পড়ে।

তবে সমকালের রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনের বাস্তব পরিচয়ে এই কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য ।ধর্মমঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে ঘনরামের গ্রন্থই প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে।

শ্যাম পন্ডিত: ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই রাঢ় অঞ্চলের বাসিন্দা। তাই বীরভূম বর্ধমান অঞ্চল থেকেই তার অধিকাংশ পুঁথি পাওয়া গেছে। কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে ধর্ম দেবতার আরেক নাম নিরঞ্জনের নামে- ' নিরঞ্জন মন্ডল'।এই পুঁথি গুলি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে খন্ডিত। তাছাড়া অন্যান্য কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত অংশও তার মধ্যে বিদ্যমান। সেই কারণে রচনায় প্রাচীনত্ব এবং আঞ্চলিকতা থাকলেও অন্যান্য কবির রচনাংশ থেকে পৃথক করা অসম্ভব। শ্যাম পন্ডিত লাউসেনের আত্মবিবরণীতে বল্লাল সেনের উল্লেখ করেছেন।

ধর্মদাস: শ্যাম পন্ডিত এর কাব্যে আত্মগোপন করে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এই কবি 'ধর্মদাস' ভনিতায়। এঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'। কবি নিজে ছিলেন বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। জন্মস্থান বসর গ্রাম। তবে ড. সুকুমার সেন বৈদ্য জাতিভুক্ত মন্দারণবাসি আর এক ধর্মদাস এর নাম উল্লেখ করেছেন। ধর্মদাসের 'নিরঞ্জন মঙ্গল'কাব্যে সৃষ্টি পত্তন বর্ণনা বিস্তৃত। রচনারীতি সহজ ও বাস্তবধর্মী। ইনি প্রধানত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের আদর্শেই কাহিনী বিবৃতি করেছেন।

রামদাস আদক: ১৩১১ সনে জনৈক মধুসূদন অধিকারী 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় 'অনাদি মঙ্গলের কবি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানেই প্রথম কবি রামদাস আদকের নাম জানা যায়। তিনি কবি রচিত পুথি সবটা সংগ্রহ করতে পারেন নি। মৌখিকভাবে সংগৃহীত বাকি

অংশ শুনেছিলেন রামদাসের উত্তর পুরুষদের কাছে। আরও পরে ১৩৪৫ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে গবেষক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বসন্ত বাবুরও এই কাব্য সংস্থানের উৎস ছিল কবির বংশধরদের স্মৃতিবাহিত পয়ার-ত্রিপদীতে আবদ্ধ কবিতাবলী এবং গায়েনদের ব্যবহৃত একটি খাতা। আবার এই খাতায় রূপরামের রচনার সঙ্গে এক অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। যে কারণে ড. সুকুমার সেন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন- " ইহার বারো আনাই রূপরামের শুধু ভণিতা রামদাসের।" দ্বিতীয়ত, মধুসূদন অধিকারীর সংগৃহীত 'আত্মপরিচয়' অংশের সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তৃতীয়ত, রামদাস তাঁর আত্মপরিচয়ে ধর্ম ঠাকুরকে বলেছিলেন:

'পাঠ করি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া

গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া।।'

কিন্তু বসন্ত বাবুর পুঁথিতে রামদাস পণ্ডিত বাগবৈদগ্ধ্যের পরিচয়ে শক্তিমান।কাজেই " রামদাস আদকের মুদ্রিত অনাদি মঙ্গল সর্বাংশে প্রাচীন কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়"।(' বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

কবি রামদাসের কাব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ হল আত্মজীবনী।ভুরসুট পরগনার রাজা প্রতাপনারায়নের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের কাছে হায়াৎপুর গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। কবিরা ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। পিতার নাম রঘুনন্দন। শৈশবেই কবি মাতৃহীন। পৌষের কিস্তি খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারার অজুহাতে জমিদারের লোক চৈতন্য সামন্ত কবিকে তিনদিন কয়েদ করে রাখে। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যান মামার বাড়ি। পথে দেখেন শঙ্খচিল, মাথার উপরে মালা ইত্যাদি নানাবিধ শুভ চিহ্ন এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের ছদ্মবেশে সিপাহী।সিপাহী বালক- কবির মাথায় মোট চাপিয়ে তাড়না করে, কিন্তু শেষে অদৃশ্য হয়। তারপর ব্রাহ্মণ বেশে আবার ধর্ম এসে দেখা দিয়ে কবিকে বলেন:

'ধর্ম বলে রামদাস মূর্খ নও তুমি।

জারগ্রামের কালু বামন হই আমি।।

আসরে জুড়িবে গীত আমা সঙরণে।

মুখেতে ঠেকিলে গীত চাইও কর পানে।।

এত বলি ঠাকুর ধরিল তারি কর।

মহামন্ত্র লিখি দিল দ্বাদশ অক্ষর।।'

রামদাসের কাব্যে যে সন তারিখের উল্লেখ দেখা যায়, তার ভিত্তিতে মনে হয় ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কাব্যটি লেখা শেষ হয়েছিল। রামদাসের 'অনাদ মঙ্গল' কাব্যের ভাষারীতি পরিচ্ছন্ন ও কবিত্বময়, যেমন-

'চিনিতে রোপিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।

জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে।।'

কিংবা-

'যুবক স্বামীর কথা পীযূষের কণ।

বৃদ্ধ সোয়ামীর কথা ছেঁচা ঘায়ে নুন।।'

তবে ভাষায় আধুনিক স্বচ্ছতা এবং কবি রূপরামের আছন্নতায় কবি রামদাসের কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত থেকে গেছে সমালোচকদের কাছে।

সীতারাম দাস:- অষ্টাদশ শতকের প্রাপ্ত পুঁথির ভিত্তিতে আলোচিত এই কবির কাব্য আত্মকাহিনী অংশটুকুই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।কবির পৈত্রিক বাড়ি বর্ধমান জেলা খণ্ডঘোষের অন্তর্গত সুখ সাগর বা শভুসাগর গ্রাম। তবে কবির জন্ম মাতুলালয়ে, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে। পিতার নাম দেবীদাস, মায়ের নাম কেশবতী। গজলক্ষী ছিলেন গৃহদেবী।মল্লভূমিতে রচিত তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১০০৪ বঙ্গাব্দ ধরে ১৬৯৮ থেকে ৯৯ খ্রিস্টাব্দ বলে মনে করা হয়।

ডোমের ঠাকুর ধর্মের পূজাপ্রচারে ও কাব্য রচনায় প্রথমে কবি ছিলেন অনিচ্ছুক। কিন্তু ধর্ম ঠাকুরের 'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে' প্রতিশ্রুতি পেয়ে এবং স্বপ্নে গজলক্ষী অনুমতি পেয়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইন্দাস গ্রামে পুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিতও কবিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন ।কবির আত্মকাহিনীর সাক্ষ্যে ৪০দিনে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

সীতা রামের ক্যাবের কাহিনী অংশ নতুনত্ব বর্জিত। তবে রচনারীতি সহজ এবং বিবৃতিমূলক। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণনা চিত্রধর্মী এবং শব্দময়, যেমন বৈশাখের মধ্যাহ্নে বনের শোভা বর্ণনা:

'বৈশাখ সময় তার কুড়চির ফুল।

ঝুপ ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল।।

কত কত কাননে হরিণী কালসার।

ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার।।'

শোনা যায়, সীতারাম মনসামঙ্গল কাব্যও লিখেছিলেন।

যদুনাথ বা যাদব নাথ পন্ডিত:ধর্মমঙ্গল কাব্য শাখার এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর জন্ম হাওড়া জেলার দোসগ্রামে (বর্তমানে ডোমজুর গ্রাম)।ড. পঞ্চানন মন্ডল এক তাঁতির বাড়ি থেকে পুঁথিটি উদ্ধার করে বিশ্বভারতী থেকে 'ধর্মপুরাণ' নামে প্রকাশ করেন। কবির পিতার নাম ধর্মদাস, পিতামহ বিনোদ দাস। কবি খুব সম্ভবত ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত।কিন্তু তবু যাদবনাথ পণ্ডিতের কাব্যের অসাম্প্রদায়িক পরিচয় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এখানে যেমন আছে চৈতন্য বন্দনা, চণ্ডীর বন্দনা তেমনি ধর্ম নিরঞ্জনের দশ অবতার বর্ণনায় বৃদ্ধকল্কি ও ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে পতিশাহ রূপে দিল্লিতে শাসনের কথা:

'দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার।

সত্য শূন্য নাম তার মেলেস্চ আকার।।

যবন রূপে দিল্লিয়ে কৈলে পাৎসাই ঠাকুরালি।

যবন রূপে একাকার সংহারিলে কলি।।'

তাঁর কাব্যে বর্ধমান রাজ কৃষ্ণ রামের উল্লেখ দেখে মনে হয় ১১০৩ বঙ্গাব্দে বা ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাব্যটি সমাপ্ত হয়।

যদুনাথ পরবর্তী কবিদের মতো লাউসেনের কাহিনী শোনাতে চান নি। এখানে রামাই পন্ডিত এবং হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কথা বলা হয়েছে। করুনরস সৃষ্টিতে এবং লুইচন্দ্রের মাতা মদনার বাৎসল্যময়ী চরিত্র নির্মাণে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রচনারীতি সংযত আবেগ ও পান্ডিত্যের পরিচয় উজ্জ্বল ।বস্তুত কাহিনীর নতুনত্বেই তিনি স্মরণীয়।

ময়ূর ভট্ট:- ধর্মমঙ্গলের এই প্রাচীন কবির কথা সব কবি বলেছেন। এঁর লেখা পুঁথিও পাওয়া যায়নি।তবু মনে হয় তিনি এই শাখার আদি কবি ।১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদ থেকে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামে একটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এই গ্রন্থটি ময়ূরভট্টের নয়। এই পুঁথিটি আসলে অষ্টাদশ শতকের রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ।

খেলারাম চক্রবর্তী: ১৩০২ সালে হারাধন দত্ত 'জন্মভূমি' জ্যৈষ্ঠসংখ্যার 'গড় মান্দারণ ও প্রাচীন জাহানারা দের ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে এই কবির কথা লেখেন। পুঁথিটি তিনি হাতে পাননি ,তবে হুগলি জেলার আরামবাগ এর নিকট বদনগঞ্জ এর কাছে শ্যামবাজার গ্রামে এক জেলে পুরোহিতের কাছে দেখেছিলেন কাব্যের নাম 'গৌড়কাব্য'।

কাব্যের রচনাকাল ১৪৪৯ শকাব্দ কার্তিক মাস বা ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু সপ্তদশ শতকের আগে কোন ধর্ম মঙ্গলকাব্য ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ফলে অনুমান করা হয়, এই গ্রন্থ জাল।

পরবর্তীকালে ড. পঞ্চানন মন্ডল ওই অঞ্চলে খেলারামের নাম শোনেন। গবেষকরা দেখেন ওই নামে এক কবি ছিলেন। কেননা রুপরামের কাব্যে এবং যদুনাথের কাব্যে খেলারাম নামক কবির নাম আছে। তবে খেলারাম গায়েন কবি কিনা তা নির্ণয় করা এখনো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অষ্টাদশ শতকে ধর্মমঙ্গলের অপ্রধান কবি গোষ্ঠী: মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য শাখার জন্ম সপ্তদশ শতক হলেও এর বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে অষ্টাদশ শতকে এই শতকের উল্লেখযোগ্য ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা হলেন যথাক্রমে

১) ঘনরামচক্রবর্তী - আদিনিবাস কৃষ্ণপুর (বর্ধমান),কাব্য রচনাকাল ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ।

২)নরসিংহ বসু – বাসস্থান বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রামে ,রচনাকাল ১৭১৪- ১৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩) রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা দ্বিজরামচন্দ্র- বাসস্থান-চামোট,বিষ্ণুপুর রচনাকাল ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

৪) সহদেব চক্রবর্তী- আদিনিবাস হুগলির রাধানগর, রচনাকাল ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দ।

৫) প্রভুরা মুখোপাধ্যায়- বাসস্থানের উল্লেখ নেই রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

৬)হৃদয়রাম সাউ- বাসস্থান বর্ধমানের খুরুল গ্রাম, পরে স্থান পরিবর্তন হয় বীরভূমের উচকরণ গ্রামে। রচনাকাল ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ।

৭) মানিকরাম গাঙ্গুলী- বসবাস হুগলির বেলডিহা গ্রাম ,কাব্য রচনা কাল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ।

৮) রামকান্ত রায়- আদি নিবাস বর্ধমান জেলার সেহারা গ্রাম, রচনাকাল ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

এই ৮ জন কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দুজন -ঘনরাম চক্রবর্তী এবং মানিকরাম গাঙ্গুলী। এর মধ্যে ঘনরামের অনাদিমঙ্গল বা শ্রীধর্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর ধ্রুপদী সাহিত্য বলে পরিগণিত হতে পারে। এমন কথাও কেউ বলেছেন।

মানিক রাম গাঙ্গুলী: ইনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের অদ্বিতীয় কবি না হলেও তাঁর স্থান অতৃতীয় বলা যেতে পারে। কাব্যটি লোক চিত্র জয়ী এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ।বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

ক)ধর্ম পূজার এক স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর কাব্যে আছে। ধর্মের উৎস কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব কে স্বীকার করে কবি তাঁকে 'শূন্যমূর্তি' বলেছেন।

'শূন্যমূর্তি স্মরণ করিয়া সাতবার

অশ্ব চেপে লাউসেন হল্য আগুসার।।'

অথবা

'সবিস্ময়ে লাউসেন শূন্যমূর্তি ভাবে।

তুরঙ্গ উপরে তূর্ণ আরোহন করে।।'

বলাবাহুল্য , এই শূন্যমূর্তি হিন্দু দেব-দেবী নন, ইনি বৌদ্ধদের শূন্য বা মহাশূন্য তত্ত্বের প্রকাশ রূপ।

খ) মানিকের কাব্যে ডোম , হাড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষদের দ্বারা ধর্ম পূজার বিবরণ আছে।ধর্মের পুরোহিতরাও প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন

'কম্মকার নাপিত মালাকার।

কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর।।'

গ)তাঁর কাব্যে কালাচাঁদ ধর্মের কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন যে নুয়াদা ভাঙ্গা মোড়ের পাশে গোয়ালুগ্রামে এই কালাচাঁদ রুপী ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন । এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিতরা সকলে গোয়ালা শ্রেণিভুক্ত। মানিক রামের কাব্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ) ভাষায়, শব্দসজ্জায়, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে কাব্য কুশলতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বিষয় সন্নিবেশে মৌলিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। মানিকরামের সমস্ত কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত পুরান -উপপুরাণের কাহিনী নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঙ)হরিহর বাইতি , কালু ডোম , লখা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কনে কবির চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন -ধর্মের পূজা দান উপলক্ষে লাউসেন রাজধানী ময়না ভার কালুর হাকন্দে জায়।এই সময় গৌড়ের রাজা উৎকোচ দিয়ে কালুকে বশীভূত করে ময়না দখলে উদ্যত হলে তার পত্নী লখা তাকে তীব্র শ্লেষে তিরস্কার করে এইভাবে:

‘এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে।

কাঞ্চন বেচবে কেন কাঁচের বদলে।।

ধিক ধিক তোমার বীরত্বে ধিক ধিক।

ভেকের নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক।।

সুধির সেনের নুন সাধিবো কামনা।

মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না।’

এ ধরনের চরিত্র নির্মাণে দক্ষতা তাঁর কাব্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। মানিক গাঙ্গুলীর কাজ ত্রুটিমুক্ত নয়। সেটি হল আদিরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর কাব্যে দেখা যায়। বিশেষ করে ‘সুরিক্ষা’ পালায় তাঁর লেখনী শ্লীলতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে।

৪.৫- ধর্মমঙ্গল: রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য প্রসঙ্গ

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গলের বিশেষ বিশেষত্ব হল আঞ্চলিকতা। কেননা সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে নয় পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন ছিল। আর ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য নিয়ে শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার ধারা।ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পন্ডিত সমালোচক ও গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং ধর্ম ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করেছেন। তবে পূর্বেই উল্লেখ করেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষিত বাঙালির কাছে সর্বপ্রথম ধর্ম ঠাকুরের পরিচয় এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য কাহিনী যথাযথভাবে তুলে ধরেন। মূলত দক্ষিন রাঢ়ের

জীবন- ইতিহাস নির্ভর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সার্বিক বিচার করে একাধিক পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সমালোচক ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলে উল্লেখ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যীয় রীতি মেনেই ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু এর বিশেষত্ব হল কিছুটা হলেও দেবতা কেন্দ্রিকতা ছেড়ে বাস্তব মুখীনতা। বাংলাদেশে ও বাঙালি জাতির সমাজ ইতিহাসের একটি বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে । এর পাশাপাশি রাঢ় বাংলার সাধারন জনজীবনের সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম একটি অধ্যায় কাব্যে ফুটে উঠেছে। কেননা ধর্মমঙ্গল কাব্যে অধিকাংশ কবি মূলত দক্ষিণ রাঢ়ভূমে জাত কবি। বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীর রূপরাম চক্রবর্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্তী উভয়ই ধর্মমঙ্গলের সার্থক কবি এবং উভয়েই দক্ষিণ দামদরের তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের কবি। এজন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের রাঢ় অঞ্চলের জনজীবনের অনেক অবলুপ্ত ইতিহাস কাব্যের স্থানে পেয়েছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রাঢ় বঙ্গের মানুষের জীবনের নানা উত্থান-পতনের বিবর্তন ধর্মী ইতিহাস ফুটে উঠেছে।নৃতাত্ত্বিক ধারণা অনুসারী মানবজাতির বিবর্তনের ধারায় জানা যায় - আর্য ও আর্যেতর সভ্যতার মিলনের আগে রাঢ় অঞ্চলে আদিম অস্ট্রিক সভ্যতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। অস্ট্রিকগোষ্ঠীর মানুষেরাই হাড়ি , বাগদি , ডোম , প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের রূপান্তরিত হয়েছে। এই অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এই ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলন ছিল।আর অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের জীবন বৃত্তান্ত নিয়েই গড়ে উঠেছে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পটভূমি প্রেক্ষিত ভূমি। একারণেই ধর্মমঙ্গল কে একান্তভাবেই রাঢ়বঙ্গের জীবনভাষ্য বা রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা যায়।

বিশ্ব সাহিত্য বিচারে মহাকাব্যের সন্ধান করলে দেখা যায় গ্রিসের জীবন বৈশিষ্ট্য নির্ভর জাতির ওঠা-নামার বিশেষ বিশেষ ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে হোমারের মহাকাব্য ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’; আর ভারতীয় জীবন ধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে বেদব্যাসের ‘মহাভারত’ এবং বাল্মিকীর ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যে। অর্থাৎ সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে মহাকাব্যের কাহিনীতে দেখা যাবে একটি সমগ্র জাতির জাতীয় উত্থান-পতন মূলক বীরত্বব্যঞ্জক নানা রহস্য সমৃদ্ধ বিশেষ জীবনালেখ্য ।পৌরাণিকতা মহাকাব্যের কাহিনীকে বিশেষ মাত্রা দেয়। এছাড়া মহাকাব্যের চরিত্র হবে ধীর ধীরোদাত্ত ।এজন্য মহাকাব্যে বীররসের পাশাপাশি শৃঙ্গার রস ও করুণ রসের প্রাধান্য বজায় থাকবে। অতীত ইতিহাস গাথা সম্বলিত এই মহাকাব্যের কাহিনীগুলিতে এক ধরনের এডভেঞ্চার ধর্মও লুকিয়ে থাকে। যখন কোন কাব্যে নির্দিষ্ট জনজীবনের বসবাস ভূমির নিরিখে ভৌগোলিক ,

ঐতিহাসিক , ও রাষ্ট্রীক ভাবে কোন জাতির জীবনবোধ প্রতিফলিত হয় ,তখন তা জাতীয় কাব্য বলে বিবেচিত হতে পারে ।এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গত বিচার করা যেতে পারে। ধর্ম ঠাকুর ও তাঁর পূজা প্রচার পদ্ধতির লক্ষ্যেই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত। প্রচলিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী অপেক্ষা এই কাব্যের কাহিনী বিশাল ও ব্যাপক উল্লেখিত দুটি মঙ্গলকাব্যের বিশেষ অঞ্চলে , বিশেষ গোষ্ঠী জীবনের ইতিহাস বর্ণিত নেই। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে কাহিনী কাঠামো উপাদান হিসাবে রাঢ় অঞ্চলের ডোম , বাগদি , দুলে ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন কথাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মধ্যযুগের রোমাঞ্চের মত এর মূল বক্তব্য হলো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীররস এবং ধর্ম ঠাকুরের পূজায় যারা নিয়োজিত তাঁরা হলেন রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। তারা রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ।এই অন্ত্যজ শ্রেণির দেবতাদের ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য রচনায় এই কাব্য করা হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী নিজে ছিলেন রাঢ় অঞ্চলের মানুষ। তিনি তাঁর কাব্যে রাঢ় ভূমির অবলুপ্ত ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। তবে এটা ঠিক যে পুচ্ছানুগ্রাহীতার ফলে তাদের পাত্র-পাত্রীদের আচরণ ও রীতিনীতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য রাঢ় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। তাই কাব্যটি কে ‘national epic of Rarha’ বলা হয়ে থাকে।

এটা ঠিক যে কাব্যের কাহিনীতে পুরান এবং রাঢ় অঞ্চলের লোকশ্রুতি মিশ্রণ ঘটেছে তবে কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিফলিত। যেমন গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ রাজ্য শাসনের সর্বেসর্বা হয়ে ভাগিনা লাউসেনের উপর অত্যাচার প্রবল অত্যাচার শুরু করে। এই ঘটনার আংশিক সত্যতা আছে যদি এর কাহিনী সত্য হয় তাহলে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কে শুধু রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কারণ লাউসেন কে অবলম্বন করে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তা পুরোপুরি রাঢ় বঙ্গের সীমাবদ্ধ নয় এটা কামরূপ থেকে কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত বিস্তারিত। দ্বিতীয়ত,ব্রাহ্মণ ও অভিজাত সমাজে ধর্ম ঠাকুরের উপাসনা তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারে না । ধর্ম ঠাকুর এখনো ডোমদের ঠাকুর বলে প্রচলিত ।তাই রাঢ়ে সমগ্র মানুষের কাব্য হিসেবে ধর্মমঙ্গলের গুরুত্ব স্বীকার করা যায় না।

রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা যায় কিনা এই নিয়ে মতামত থাকলেও এটা ঠিক যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সামাজিক উপাদান এর মত রাঢ়বঙ্গের একটি সামাজিক প্রতিচ্ছবি আছে। গৌড় এর কথা বলা হলে গৌড় এখানে মুখ্য নয় ।যে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে সেই

চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য রাঢ়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি চিত্রণেও কবি রাঢ়বঙ্গ কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন । যেমন পাখির বর্ণনায় তিনি রাঢ়ের পাখিদের কথা বলেছেন-

'কাক কঙ্ক কোকিল কৌতুকে কাল পেঁচা।

খঞ্জনী খঞ্জন খগ আর কাদাখোঁচা।।'

তাই কাব্যটিকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বললে খুব একটা দ্বিধা থাকার কথা নয়।

মঙ্গলকাব্য ধারায় অর্বাচীন এই শাখাটির উৎসভূমি রাঢ় অঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে অবলম্বন করে এই কাব্যের কাহিনী কাঠামো রচিত হয়েছে। রাঢ় অঞ্চল হলো পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুর এর সীমানা দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ । বর্তমান এই অঞ্চলটি হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের কিছুটা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা কাব্যটি কে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে ।বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

১) শ্রীধর্ম্মমঙ্গল –এ এমন কিছু ছবি আছে যার মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের অবলুপ্ত ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় ।এই কাব্যে বর্ণিত স্থান ঘটনা ও চরিত্র বিচারে রাঢ় অঞ্চলের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। লাউসেনের কাহিনী সঙ্গে পাল যুগের ইতিহাসের সংযোগ আছে। স্থানীয় গ্রাম জনপদ ও নদ-নদীর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা একান্ত ভাবে রাঢ়ভূমির। যেমন মঙ্গলকোট ,বর্ধমান, মান্দারণ, গঙ্গাবাটী ,উচালন ইত্যাদি জনপদ ও দামোদর, দারকেশ্বর, কালিন্দী ইত্যাদি নদ-নদীর কথা বলা হয়েছে। মহামান্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামক একসামন্ত রাজার বর্ধমান জেলার ঢেক্করী নামক স্থানে রাজত্ব করার কথা ড. নিরঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থের স্বীকার করেছেন-

"ঢেক্করীর ঈশ্বর ঘোষ যে মহা মাণ্ডোলিক ছিলেন তাহার রামগঞ্জ লিপিতে সপ্রমাণ। ঢেক্করীর এক মন্ডলাধিপতি রামপালের সামন্ত রূপে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ঘোষ, খুব সম্ভব সেন -রাষ্ট্রেরই অন্যতম সামন্ত ছিলেন।" তিনি আরো জানিয়েছেন- 'কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে মহামহওক বা মহামওক নামীয় রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি .....মহামওক মনে হইতেছে সেন -রাষ্ট্রেরও রাজার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী।"

সম্ভবত এই মহামহওকই ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহামদ চরিত্র হয়েছেন। সুতরাং এর ঐতিহাসিকতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

২) রাঢ় ভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে আজও ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে এই ঠাকুরের উদ্ভব সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন আর্যদের আগে অনার্যরা যে সূর্য দেবতার পূজা করতেন তিনি কালক্রমে ধর্ম দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। আবার কারো মতে বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যমূর্তিই হলেন ধর্ম ঠাকুর। তিনি কখনো কালুরায় ,ডোম রায়, বাঁকুড়া রায়, প্রভৃতি নামে চিহ্নিত। সে নাম গুলির সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের পরিচিতি। তাছাড়া ধর্মপূজার যে ডোম , জেলে , নাপিত বাগদী প্রভৃতি তারাও রাঢ় অঞ্চলেরই লোক।আজও পর্যন্ত ধর্ম ঠাকুরের পূজায় ডোম শ্রেণীর আধিপত্য।

৩) ধর্মমঙ্গল কাব্যের একাধিক কবি ময়ূরভট্ট, মানিগ্রাম গাঙ্গুলী, রূপরাম , খেলারাম প্রমুখ কবিরা রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের কাব্যে রাঢ় অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন ।

৪) রাঢ় অঞ্চলের লোকেদের ভাষা ব্যবহারের চিত্তাকর্ষক নিদর্শন রেঢ়ো বুলি।শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাখাই এর উক্তিতে পাওয়া যায়-‘ জাতি রাঢ় মু রে করমে রাঢ় তু।’- ধর্মমঙ্গলের এই কবির উক্তি থেকেই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, এই কাব্য স্থানীয় বীরত্ব বর্ণনা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাপন এর বাহন ছিল।

৫) শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্যের রাঢ় অঞ্চলের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি স্থান পেয়েছে। অমার্জিত রূঢ়তা , উচ্ছ্বাস উদ্দমতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি রাঢ় সমাজের নিম্নসমাজের পরিচয়বাহী, যেমন লখাই তার পুত্রকে বলেছে-

‘মোর দুগ্ধ খেয়ে রণে ভীত হলি।

তু ব্যাটা তখনি হয়ে না মরলি।।’

৬) ধর্মমঙ্গল কাব্যে একাধিক খাদ্যের নাম আছে। যেগুলি রাঢ় অঞ্চলের মানুষের খাদ্য। যেমন-

‘শাক শুক্তা রন্ধনে সম্বরে সেই কাঠি।

বলকে পিঠালি জ্বাল মন্দ মন্দ তটি।।’’

৭) রাঢ় অঞ্চলএকদা বীরের আবাসভূমি বলে পরিচিত ছিল ।এই অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরা অপার্থিব অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর না করে মনস্কাম সিদ্ধির জন্য আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেছে। সেই সূত্রে পরবর্তীকালে শক,হূণ ,মোগল, পাঠান প্রভৃতি গোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

৮) গৌড়েশ্বর এর প্রতি ইছাই ঘোষের প্রতিবাদ ও গোঁয়ারতুমি রাঢ়বঙ্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

বলা যায় বিশেষ অঞ্চলের অলোক জীবনের নির্ভর সাহিত্য হলেও ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ,রূপরাম প্রভৃতি কবির হাতে আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে ।একই সঙ্গে দেশাত্মবোধ ও লোক জীবন ধারা মিশে গেছে এছাড়া ইছাই ঘোষের প্রতিবাদ কাব্যটি কে অন্য মর্যাদা দিয়েছে। তাই ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা হয়।

৪.৬- ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা

প্রথমেই স্মরণ করি আশুতোষ ভট্টাচার্য তার বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন সৃষ্টি ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মমঙ্গল নামক এক অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য নামে এক শ্রেণীর আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল প্রধানত তাদের আদর্শের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইহার ভিত্তিক যেমন ঐতিহাসিক তেমনি রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র ইহার অবলম্বন ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্যের পাশে রাঢ়ের বিশিষ্ট লোক চরিত্রের মহিমা ব্যাপ্ত হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে উক্ত সমালোচকের বক্তব্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী মূলত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা কবির কল্পনায় বিশেষভাবে পল্লবিত হয়েছে আমরা এই পল্লবী ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের চেষ্টা করব ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী ভাগে উল্লেখিত হয়েছে ধর্মপালের পুত্র গৌড়ের অধিপতি হলে সামন্ত রাজপুত্র বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মপালের পুত্রের নাম নেই

‘ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর

প্রসঙ্গে প্রসাবে পূর্ণ পাপ যায় দূর।

পৃথিবী পালিয়ে স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর

বীর্য বন্ধ পুত্র তার গৌড়ের ঈশ্বর।।'

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে সরাসরি নাম উল্লেখ নেই আর কিংবদন্তির কাহিনী হল কাব্যে উল্লেখিত গৌড়েশ্বর হলেন সিন্ধু বা সমুদ্রে ঔরসে রাণী বলল ভার গর্ভজাত জারজ সন্তান এছাড়া আরো অনেক কিংবদন্তি আছে তবে ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর কে তার পরিচয় স্পষ্ট নয়।অন্যদিকের কাহিনী ধর্মপালের পুত্র দেবপাল আনুমানিক ৮১০ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ বিজয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে, আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন লাউসেন ও বিদ্রোহী হোসেনের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন এটা তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং ইতিহাসে প্রমাণ মেলে রাঢ়ের সামন্ত রাজাদের সঙ্গে পাল রাজাদের প্রায়শই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। সম্ভবত মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য গুলি পাল রাজাদের রাঢ়ের সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ দমনে কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে এটাকে মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বলে উল্লেখ করা যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তিকে স্বীকার করলেও তার চরিত্রের যথাযথ ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে বাংলা পঞ্জিকার কলিকালের রাজচক্রবর্তীদিকের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে লাউসেনের নামও উল্লেখ করা হয়। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে লবসেন গৌড়ের রাজা ছিলেন এবং জনশ্রুতি অনুসারে পাল রাজ্ যক্ষপালের মন্ত্রী সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু গবেষণায় যক্ষ পালের নাম পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর দক্ষিণে ইছাই ঘোষের দেউল ও এর কাছে 'লাউসেন কুন্ড' পুকুর আছে সে অঞ্চলের ডোমেরা ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে স্নান করে স্বজাতির কালুবীরের তর্পণ করে। এছাড়া ধর্মের কাছে মানসিক করে রাঢ় ভূমিতে যে পুত্র সন্তান লাভ হয় তার নাম রাখা হয় লুইধর কিংবা লাউসেন। এ সকল কারণে অনুমান করা হয় লাউসেন অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না।

অন্য একটি সূত্র অনুসারে গৌড়ের রাজা দেবপাল তার বিজিত রাজ্যের সামন্ত রাজা নিযুক্ত করেছিলেন লাউসেনকে এবং তার রাজধানী ছিল ময়না নগরে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায় মহানগর ভূমির একেবারে দক্ষিনে সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে অবস্থিত মহানগর বাটি সাগর সমীপ, এ থেকে অনুমেয় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত তমলুক মহকুমার দক্ষিনভাগ মহানগর অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ময়না নামে একটি স্থান আছে। অন্যদিকে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুরই ময়না নগর। রামাই পন্ডিতের বংশধরগণ এখানে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন। গ্রামের পাঁচ ধর্মশিক্ষা যাত্রাসিদ্ধি বাঁকুড়া

ক্ষুদিরাম শীতল ও চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী বিচার করে লাউসেন নিয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান নানা সময় হয়েছে এবং এ সম্পর্কে নানা অভিমত ব্যক্ত হয়েছে আবার অনেকে হরিশচন্দ্রের কাহিনী কে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তবে সর্বশেষে আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিচার করে প্রকাশ করেছেন রামাই পন্ডিত ও রঞ্জাবতী সমসাময়িক লোক তারা গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলে তাদেরকে খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর মানুষ বলে অনুমান করা যেতে পারে এর পরবর্তীকালে রামাই পন্ডিত ধর্ম ঠাকুরের পূজা পদ্ধতি রচনা করেন আর ময়ূর ভট্ট মঙ্গলকাব্য রীতি মেনে প্রথম ধর্মমঙ্গল কাহিনী মঙ্গলকাব্য রূপে তুলে ধরেন এই সূত্রেই সপ্তদশ শতাব্দীর কবিগন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

৪.৭- ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যতা

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানত বৌদ্ধ পাল রাজবংশের রাজত্বকালে নাথ সম্প্রদায় নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায় এদেশে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোক শ্রুতি অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের 'নাথ সাহিত্য' নামে একটি সাম্প্রদায়িক সাহিত্য শাখা সৃষ্টি হয়েছিল ।সম্ভবত বাংলার বাইরে উদ্ভূত নাথ ধর্ম ক্রমে বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে সেন রাজত্বকালে সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাব প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। একদিকে আর্যদের আগমন ও তাদের সংস্কৃতির প্রসার; অন্যদিকে বাংলাদেশে অনার্য জাতির বসবাস ও তাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস এই দুইয়ের সংমিশ্রণে মিশ্রিত সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল ।পরিমণ্ডলে বাংলার লৌকিক দেবদেবী উদ্ভব ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং এই সকল দেবদেবীগণের আর্যীকরণ অর্থাৎ সাধারণের কাছে পূজা প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এর কাহিনী নিয়ে রচিত হলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ধারা মঙ্গলকাব্য গুলি।এই ধারার প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্য গুলি হল- মনসামঙ্গল ,কালিকামঙ্গল প্রভৃতি এবং অনেক অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা দেখব অন্যান্য মঙ্গলকাব্য গুলি অপেক্ষা ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য কোথায়।

বাংলাদেশের মধ্যযুগের মুসলমান শাসনের অধীন সমাজ ব্যবস্থা তে হিন্দু জীবনপ্রবাহ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এসময়ই চৈতন্য দেবের আবির্ভাব এ প্রেম ও ভক্তি ধর্মের প্রবাহে হিন্দুসমাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা অনেকটা স্বাভাবিক স্রোতে ফিরে আসে। এমন এক সামাজিক পটভূমিতে রচিত হতে শুরু করেছিল বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলি ।একদিকে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব ও আদর্শ ;অন্যদিকে লোকধর্মাশ্রয়ী অনার্য দেব দেবীর পূজা অর্চনা ও প্রচলিত ছড়া –ব্রতকথা- দুই এর সংমিশ্রণে গড়ে উঠল মঙ্গলকাব্যের ভিত্তিভূমি। সর্গ –প্রতিসর্গ মিল না থাকলেও দেব মাহাত্ম্য রাজবংশ বা অনুরূপ অভিজাত বংশের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলের কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করে রাজত্ব লাভ, ধর্মমঙ্গলের বীরপুরুষ লাউসেনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর পুরাণ অনুষঙ্গে মনসামঙ্গল কে ‘পদ্মাপুরাণ’ এবং ধর্মমঙ্গলের অংশবিশেষ কে ‘হাকন্দপুরাণ ‘ ,’শূন্য পুরাণ’ বা ‘শ্রীধর্মপুরাণ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এসব ভাবনার মধ্যেই ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য সন্ধান করা যায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলি সংস্কৃতি পুরানাশ্রয়ী হওয়ার কারণে কাহিনী ভাগের সূচনায় দেব দেবীর লীলা এবং ঋষি বংশ রাজবংশের বিস্তারিত পরিচয় আছে। পুরাণ ও উপপুরাণ হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে দৈবীমহিমার গ্রন্থ। এই অনুসরণে পদ্মাপুরাণের দেবী পদ্মবনে জাত মনসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে । এই কাব্যে মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধ এবং সর্বশেষে মনসার জয় মর্ত্যে পূজা প্রচারের কাহিনী দিয়ে কাব্য শেষ হয়েছে ।অন্যদিকে মঙ্গলচন্ডীর মহিমা মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী হল চন্ডীমঙ্গল। দেবী দুর্গা চণ্ড নামক অসুরকে বিনাশ করে চন্ডী হয়েছেন। এই কাহিনী বিবৃত। অন্যদিকে’ ধর্মমঙ্গল’- এর কথা বলতে গেলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় ধর্ম সম্প্রদায় বা কাল্ট -এর কথা। বাংলাদেশের বিশেষ একটি অঞ্চলের বিশেষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বা বিশেষ এক জাতির মানুষ ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত। এখানে কাব্য ভাবনা গত দিক থেকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য ।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ভাগে দেখা যায় সামন্তরাজ কর্ণসেনের স্ত্রী রঞ্জাবতী ধর্ম ঠাকুরের সালে ভর দিলে পুত্র লাউসেনের জন্ম হয়েছে। সমগ্র কাহিনী লাউসেনের বীরত্বগাথা রূপ অ্যাডভেঞ্চারধর্মী রোমাঞ্চকর ।বর্ণনা কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয় লাউসেন যেন বাংলাদেশের রাঢ়ভূমির বীরত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এছাড়া কালু ডোম এবং লখা ডোম এর কাহিনী যেন সমগ্র রাঢ় বঙ্গের ডোম জাতির বীরত্বগাথার প্রতিনিধিত্ব করেছে । এর সঙ্গে মিশ্রিত

ধর্মঠাকুরের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। কেননা ধর্ম ঠাকুরের আশীর্বাদে লাউসেনের জন্ম; গৌড়েশ্বর এর কাছে লাউসেন বীরত্ব প্রদর্শন করতে এলেই সংযোগ ঘটেছে কালু ডোম ও লখা ডোমের সঙ্গে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম ঠাকুরের পূজার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একেবারে আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষ অনার্য ডোমসম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রচলন ছিল। ঠাকুরের পৌরহিত্যে ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণদের পাওয়া যায়নি। এসকল বাংলা ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পরিচয় কে স্পষ্ট করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের থেকে ঐতিহাসিক বৃত্তে ধর্মমঙ্গল স্বতন্ত্র কাব্য ।কেননা ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বর্গ গৌড়েশ্বর ,লাউসেন, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে পরিগণিত। রাঢ়ের জনজীবনের সার্বিক চিত্র নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গলকে একারণেই অনেকের রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য অভিধায় ভূষিত করেছেন। সব মিলিয়ে মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় 'ধর্মমঙ্গল' স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন।

৪.৮- ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বিচার

চরিত্র চিত্রণে ঘনরামঃ

মধ্যযুগের অন্যান্য শাখা গুলি তুলনায় মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ বেশি এবং মঙ্গলকাব্যের শক্তিশালী লেখকরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে ঘনরাম এর ব্যতিক্রম নন। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী এমনিতেই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় বিশাল ও চরিত্র বিপুল। ঘনরাম পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শে কাহিনীরচনা ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যের চরিত্র বিপুলতা থাকলেও প্রত্যেকটি প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র কে সার্থক রূপ দিয়েছেন। কাব্যে দেবতার অনুগ্রহ পুষ্ট চরিত্রের মহিমা যেমন প্রকাশিত তেমনি সাধারণ মানুষগুলো কেউ তাদের সমস্ত তুচ্ছতায় ক্ষুদ্রতা ও সুখ-দুখ দিয়েই চিত্রিত করেছেন। এমনকি মনুষ্যতর চরিত্র সৃষ্টিতে প্রথম ।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গলের দেবতাদের যতখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুরের ইচ্ছে ছাড়া তাঁর উপস্থিতি ও ক্রিয়া-কলাপের দিকটি কাহিনী কাঠামোর দিক থেকে অন্য দুই মঙ্গলকাব্য একটি কাহিনীকে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে ।সেই কাহিনীর পটভূমি বিন্যাস ও পরিণতি স্বল্পপরিসরে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে পৃথক।

লাউসেন:

চরিত্র সৃষ্টি হল আখ্যানকাব্যের অন্যতম প্রধান বিষয়। সেক্ষেত্রে ঘনরাম চক্রবর্তী যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এই পূজা প্রচার ও দেবতার অলৌকিক ক্ষমতাকে বহন করেছেন লাউসেনের চরিত্র টি। কবি পূর্ববর্তী মহাকাব্য পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের আদর্শেই লাউসেনের চরিত্রকে সার্থক রুপায়ন দিয়েছেন। সমগ্র ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্লট বিন্যাসে লাউসেন বেসি গুরুত্ব পেয়েছে। কবি দেখাতে চেয়েছেন যে দেবতার অনুগ্রহ পুষ্ট চরিত্রটির বীরত্ব ও মহিমা কম নয়। সেই অর্থে লাউসেন সমস্ত কাহিনীর বাহক।তাঁর অভিযানের উপর ভিত্তি করেই ধর্মমঙ্গল কাব্য বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের বীরত্ব, সততা ,নির্ভীকতা ,ধীরোদ্ধাত প্রতিফলিত। ভক্তিতে, বিশ্বাসে , সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সে সর্বগুণে অধিকারী একটি বীর কাহিনী প্রধান অবলম্বিত চরিত্র। এই কাব্যের অন্যতম চরিত্র গুলি তার মত এতটা উজ্জ্বল নয়। কারণ মঙ্গলকাব্যের কাঠামো অনুযায়ী আসলে শাপভ্রষ্ট দেবতা। ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্য তাঁর মর্ত্যে আগমন। তাই লাউসেনের চারিদিকে দেবতাদের একটা পরিমণ্ডল আছে ।বলা বাহুল্য অধিকাংশ প্রধান চরিত্ররা দেবতা অনুগ্রহপুষ্ট। ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্রকে রাবণ বধ করার জন্য অকালবোধন করতে হয়েছিল। ঘনরাম চক্রবর্তী লাউসেন ও কর্পূর সেনকে ভাগবতে কৃষ্ণ বলরাম এর সঙ্গে তুলনা করেছেন-'কৃষ্ণ বলরামে যেন নাচিয়া বেড়ায় '। বোঝা যায় ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্যমূলক রচনায় কবি লাউসেনকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এটা ঠিক যে লাউসেনের নির্ভীকতা ও মহত্ব আদর্শের জন্য কাব্যটি পাঠকের কাছে এত আকর্ষণীয়। লাউসেনের মাতা ছিলেন রঞ্জাবতী ভক্তিবশে পুত্রকে ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ,মৃত পুত্রকে জীবিত রূপে আবার ফিরে পান। ধর্মের কৃপায় এই পুত্রলাভ করে তিনি পুত্রের নাম রেখেছিলেন লাউসেন ।কিন্তু কাহিনী র অগ্রগতিতে বৈপরীত্যের বিন্যাস ঘটিয়ে কবি লাউসেনকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। লাউসেন মাতা রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মহামদ লাউসেনের শত্রু ছিলেন। তিনি লাউসেন কে চুরি করলে হনুমান কর্তৃক লাউসেন উদ্ধার পায় ।ধর্মের প্রতি কৃপা থাকার জন্য বাল্যকালে লাউসেন শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন সে মল্লবিদ্যাও শিক্ষা করে উল্লেখযোগ্য যে কবি নিজে মল্লবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ।

এরপরই লাউসেনের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কাহিনী শুরু ।মামা মহামদের সঙ্গে পরিচয় করার জন্যই তার গৌড় যাত্রা। এই অভিযানে কামদল বাঘের আক্রমন ও কুমিরের আক্রমণে তার প্রাণ বিপন্ন হলেও ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় তিনি সাহস ও শক্তি নিয়ে এগিয়ে গেছেন।গৌড় যাত্রাকালে জামতি নামকস্থানে দুশ্চরিত্রা নারীর প্রলোভনের জাল পেতেছিল।সুরিক্ষা নামে একটি পতিতা রমণীর হেঁয়ালির উত্তর দিয়ে লাউসেন তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চরিত্র বলের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর গৌড়ে উপস্থিত হয়ে লাউসেন আবার বিপদে পড়েন। মহামদ কিছু কিছু মিথ্যা ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে তাকে বন্দী করে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন মুক্তি পান।

গৌড় প্রদেশে লাউসেনের বীরত্ব প্রদর্শন শুরু হয় যখন মহামদ গৌড়েশ্বর কে কামরুপ আক্রমণের পরামর্শ দেয় সেই যুদ্ধে লাউসেন সেনাপতি নির্বাচন হন কারণ মদের আশা ছিল কামরুপ যুদ্ধের নিহত হবেন ।কিন্তু ভক্ত রক্ষা করলেন কে তাকে বিপদে ফেলবে? প্রভূত শক্তির অধিকারী এবং শক্তিশালী লাউসেন দুস্তর ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে কামরুপ জয় করলেন তার প্রবল প্রতাপে-

‘কেউবা কাতর হয়ে দাঁতে করে কুঠা।

কেউ কেন্দে ছেন্দে ধরে পা লুটা।’

দৈবশক্তিতে বলিয়ান হলেও ঘনরাম চক্রবর্তী লাউসেনের যে বিরক্ত বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর দৈবী উদ্দেশ্য অনেক সময় চাপা পড়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লাউসেনের বীরত্ব কাহিনী।

রামের হরধনুভঙ্গ অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি পৌরাণিক ধারাকে সামনে রেখে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে অনুরূপভাবে সাজানো হয়েছে। শিমুলার কন্যা কানরা সুন্দরী হিসেবে পরিচিতা ছিলেন ।গৌড়েশ্বর কাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এদিকে কানরা প্রতিজ্ঞা করে সে তাকেই বিয়ে করবে যে লোহার গন্ডারকে এক আঘাতে দ্বিখন্ডিত করতে পারবে সবাই ব্যর্থ হলে লাউসেন কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক আঘাতে শিরশ্ছেদ করেন এবং সফল হয়ে কানড়া কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে লাউসেন অসম্মত হয় ।তখন দেবী পার্বতীর চুক্তি মতো যুদ্ধে দেবীর কাছে পরাজিত হয়ে কানড়াকে বিবাহ করে।

সমগ্র কাব্য জুড়ে লাউসেনের বীরত্ব প্রদর্শন কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।তবে তাঁর গৌড় যাত্রার কাহিনী এবং গৌড়ের বিভিন্ন ঘটনাগুলি কাব্যকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে

তুলেছে ।মহামদের পরামর্শে বিরুদ্ধে পাঠানো হলে ইছাই ঘোষের সেনাপতি নিহত হন। ইছাই ঘোষ পরাজিত হন। এরপর লাউসেন ধর্মের বলে বলিয়ান হয়ে পশ্চিমে সূর্যোদয়, দেশে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন এর জন্য তপস্যায় রত হলেন ।সুতরাং ধর্মমঙ্গল কাহিনী কাঠামো শীর্ষবিন্দুতে বা মূল প্লট বিন্যাসে লাউসেনের কাহিনী গুরুত্ব পেয়েছে।

এই কাব্যের নায়ক চরিত্র লাউসেন। সাপভ্রষ্ট কশ্যপ কুমারকে ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্যই তার মর্ত্যে আগমন। তাঁই এই চরিত্রটি চতুর্দিকে দেবদেবীর পরিমন্ডল লক্ষ করা যায়। অবশ্য সব পৌরাণিক সাহিত্য এবং প্রাচীন মহাকাব্য গুলিতে দেখা যায় সব বীর চরিত্রই দেবতার অনুগ্রহে পুষ্ট ঈশ্বরের অবতার স্বয়ং রামচন্দ্রকেও রাবণ বধ করার জন্য অকালবোধন করতে হয়েছিল। মহাভারতে কর্ণের বীরত্বের মূলে ছিল তাঁর কবচকুণ্ডল অর্জুন একান্তভাবে কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু এতে যদি তাঁদের বীরধর্মের মহিমা ক্ষুন্ন না হয় তাহলে লাউসেনের ধর্ম নির্ভরতা ও তার চরিত্র মহিলাকে খর্ব করতে পারেনা ।লাউসেন ধর্ম ঠাকুরের অনুগ্রহপুষ্ট। তাকে ধর্মঠাকুর সব রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন বটে, কিন্তু বিপদে পড়ার আগে কিছুই করেন নি। এখানে লাউসেনের মহিমা প্রকাশিত ।যুদ্ধে ধর্ম ঠাকুরের সাহায্য লাউসেনের বৃহত্তম মহিমাকে ক্ষুন্ন করেনি, কারণ ইছাই ঘোষও দেবী পার্বতীর কৃপা পুষ্ট হয়ে যুদ্ধ করেছে।

কিন্তু এই দৈবী অনুকুলের কাহিনী বাদ দিলেও লাউসেনের মধ্যে এক মানবীয় চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়। নৈতিকতা ও আদর্শ তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। আখড়া পালায় দেবীর ছলনা কে জয় করে তিনি জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। 'জামতি পালা' ও ' গোলাহাট পালা'য় লাউসেনের মোহমুক্ত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ধর্ম ,পথ অবলম্বন এবং নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি আদর্শ মানবীয় গুণ এর পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে লাউসেনের মহিমাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। পৃথিবী ত্যাগ করে স্বর্গে যাবার অনিচ্ছা তার সাপভ্রষ্ট চরিত্রের মর্ত্য -মমতা সঞ্চার করে চরিত্রটির সামগ্রিক আবেদন অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে।

কর্ণ সেন

কর্ণসেন চরিত্রালোচনায় পীযূষকান্তি বলেছেন –কর্ণসেনের মধ্যে দিয়ে একজন সামন্তরাজ এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। গৌড়ের আদেশ তিনি সবসময় মেনে চলেছেন ইছাই ঘোষ তার সর্বনাশ করেছে- গৌড়েশ্বরের কৃপাতেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ।কিন্তু তাই বলে তাকে দুর্বল

চরিত্রের পুরুষ বলা যায়না লাউসেনের গৌড় গমনে রঞ্জাবতীর আপত্তি থাকলেও তাঁর আপত্তি নেই কারণ তিনি জানেন –'পুত্রের প্রতাপে হয় পৌরুষ পিতার ।'লাউসেন তার পিতা আদর্শের দ্বারা অনেকাংশেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। লাউসেনের বিপদসংকুল যাত্রায় তিনি বাধা দেননি। কেবল ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়রাজের আদেশে লাউসেনের যুদ্ধযাত্রা তিনি বাধা দিয়েছেন। ইছাই ঘোষের পূর্বস্মৃতি তাঁর মনে জাগ্রত আছে বলেই তাঁর এই বাধাদান ।একপুত্র স্নেহাতুর চিরন্তন পিতার চরিত্র বৈশিষ্ট্যই এখানে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

গৌড়েশ্বর

গৌড়েশ্বরএর চরিত্রটিও জীবন্ত ।লাউসেনের মতোই সে দুর্বল স্নেহশীল অথচ অন্যদিকে মন্ত্রী মহামদের পরামর্শ ও তিনি আগ্রহ্য করতে পারেননি। একটি ঘটনায় রাজার চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। লাউসেন যখন অশেষ বিক্রমে রাজার পাট হস্তি বধ করেছেন তখন লাউসেনের অপূর্ব বীরত্বে তাঁর আনন্দ হয়েছে; তিনি তাঁকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি বেদনাবোধ করেছেন-

'হরিশে বিপদের রাজা ভালোভাবে বলে।

হরির উদ্বগে অন্ন অন্তরে উথলে।।'

এখানে ভালো-মন্দ মিশিয়েই গৌড় রাজার চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।

মহামদ

কলির অংশ থেকে মহামদ এর জন্ম হবে এই ভবিষ্যৎ বাণী সৃষ্টি পত্তনে করা হয়-

'জন্মেছে কলির অংশে পাত্র পাপমতি।

সে হবে তোমার ভাই, কর্ণ সেনাপতি।।'

ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের বিপরীত ভূমিকায় সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র মহামদ। লাউসেনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তই চরিত্রকে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। মহামদ ধর্মমঙ্গলের কেন্দ্রবিন্দু, তাকে কেন্দ্র করে ধর্মমঙ্গলের দ্বন্দ্ব এবং ঘটনা সংঘাত অনিবার্য বেগে পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। রামায়নের রাবণ ও মহাভারতের দুর্যোধন চরিত্রের সঙ্গে মহামদ চরিত্রের তুলনা করা যায়। গৌড়েশ্বর তার অমতে তার ভগ্নির সঙ্গে বৃদ্ধ বরের বিবাহ দিয়েছে, আর এখান থেকেই

তাঁর ক্রোধের উদ্রেক ।এই ক্রোধ গিয়ে পড়েছে রঞ্জাবতী তাঁর স্বামী ও তার পুত্রের উপর। তাই নিদারুণ ক্রোধে সে কর্ণ সেন কে বলেছে-

'দৈব কি হৈলা বন্ধা উগ্রসেন তুমি।

সবংশ করিতে ধ্বংস কংসরুপী আমি।।'

শ্রীমৎভাগবত এর কংস চরিত্রটির প্রভাব মহামদ চরিত্রের মধ্যে এসেছে ।লাউসেনকে হত্যা করার জন্য তাঁর পরিকল্পনাও কংসের পরিকল্পনার মতোই-' রোগ ঋণ রিপু নারাখিব অবশেষে'। লাউসেন কে মহামদ পরোক্ষভাবে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করেছে। লাউসেনের অবর্তমানে ময়না ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে ,এবং একেবারে অসম্ভব পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় ঘটানোর জন্য পাঠিয়েছে। এই সমস্ত নিষ্ঠুরতার আড়ালেও এক গোপন স্নেহধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

কামরূপ থেকে ফিরে এসে মহামদ প্রথমেই –'রঞ্জাবতী ভগ্নী বলে ডাকেন সোহাগে।' প্রিয় ভগ্নি রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়নি, পিতা মাতা আছে তাই গৌড় রাজের আদেশে। বাইরে গিয়েও মহামদ স্বস্তি পায়নি। পিতা-মাতার প্রতি তার কর্তব্যবোধ আর ভগ্নিপতি তাঁর স্নেহ শ্রীলতা ও মমত্ববোধ তার চরিত্রকে মধুর করেছে। তাঁর সব চক্রান্তের মুল এসে থাকলেও তাঁর ভগ্নি স্নেহ কম নয়।এদিক থেকে মহামদ পাঠকের সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। তাই তাঁর নিষ্ঠুরতার মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা আছে।

ইছাই ঘোষ

ঘনরামের বাড়ির কাছাকাছি থেকে অর্থাৎ আমরা বর্ধমান জেলার থেকে ইছাইয়ের গৌড়েশ্বর বিরোধিতাকে খানিকটা সমর্থন করতে পারি। বিশেষ করে জাতিভেদ না করে তার ঢেকুর প্রতিষ্ঠা সমর্থনযোগ্য। তাছাড়া কর দিতে না পারায় তাঁর পিতা যেভাবে ,মহামদ দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে পুত্র হয়ে তার যথার্থ প্রতিবাদ করতে পেরেছে। ইছাই ঘোষের চরিত্র জটিলতা হীন। পীযূষকান্তি মহাশয়ের মতে- সে প্রথমেই কর্ণসেনকে দমন করে দেবীর সহায়তা নতুন রাজ্য স্থাপন করেছে ।পরে যখন লাউসেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেছেন তখন দেবীর সহায়তা এসে প্রচন্ড যুদ্ধ করেছে কিন্তু দেবতাদের চক্রান্তে লাউসেনের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে ।ইছাই দেবীর আনুকূল্য পেলেও দেবীর প্রতি তার সন্দেহ জেগেছিল এবং

সেজন্যই তার পতন ঘটল। এই ধরনের চরিত্র চিত্রণেই খুবই বাস্তবানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রটি খানিকটা ট্র্যাজিক চরিত্র।

কালু ডোম

ঘনরামের কৃতিত্ব হল চরিত্র গুলির বাস্তব চিত্রনে ।তাঁর চরিত্র গুলিকে তিনি নিজস্ব জগতে এবং পরিমণ্ডলে রেখেছেন অহেতুক আদর্শ বোধের অত্যুজ্জ্বল বর্ণে লিপ্ত করেন নি। তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো কালু ডোমের চরিত্র। বিভিন্ন যুদ্ধে তার বীরত্ব তার চরিত্রকে বিকশিত করেছে। তার বীরত্ব অলৌকিকতা অপ্রাকৃত বীরত্বের কাহিনী নয় ।দুর্জয় কামরূপ দেখে তাঁরও বুকে কেঁপেছে। কিন্তু পরে সে এগিয়ে গেছে এবং কামরুপ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। কামরূপ রাজাকে বন্দী করেছে। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে ও তার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কালুডোমের প্রবল বীরত্বের মধ্যে তার দুর্বলতাগুলো রয়েছে। এই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে জাগরণ পালায় কিছু কালুর চরিত্র অসামান্য ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে তার সত্য রক্ষায়। তার বিশ্বাসঘাতক ভাই বলেছে যে শক্তিতে তাকে আনা যাবেনা ,ছলনা করে আনতে হবে তাই সে প্রথমে কালুকে দিয়ে সত্যবন্ধ করায়, যে কালুর কাছে যা চাইবে তা কালুকে দিতে হবে। কালু তাতেই রাজি হওয়ায় সে কালুকে নিজের মাথা কেটে দিতে বলেছে-

‘কি করিব কোথায় হতে পরকাল মজে।

এপাপের পরশ পাছে সে মহারাজে।।

এপাপের না হয় পাছে পশ্চিমে উদয়।

সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়।।

সত্য না লঙ্ঘিব আমি ইহা কারণ।

অতএব অধম তোর বাঁচুক জীবন।।’

লাউসেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয় তাই সে নিজের মায়ার বিনিময়ে সত্য রক্ষা করেছে। এতে লাউসেনের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠাই প্রমাণ দেয় ।লাউসেন স্বর্গারোহণ করার সময় কালুকে সঙ্গে দেখেছে কিন্তু মাংস মদ ছেড়ে সে স্বর্গে যেতে রাজি হয়নি।মর্ত্যের প্রতি তার এই আসক্তি তার চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে।

রঞ্জাবতী

কাব্যের শুরুতে 'স্থাপনা পালা'র গীতারম্ভে জানানো হয়েছে ইন্দ্রের নটী অম্বুবতী স্বর্গে নাচতে গিয়ে তালভঙ্গ করলে সে মর্ত্যে আসার ছাড় পায়। এই অম্বুবতীই লাউসেনের মা রঞ্জাবতী,স্বর্গের সাপভ্রষ্ট অপ্সরা ।ঘনরামের কাব্যের মধ্যে তাকে মানবী রূপেই চিত্রিত করেছেন। একমাত্র সালে ভর দেওয়া ঘটনা ছাড়া তার চরিত্রের অন্য কোথাও অলৌকিকত্ব নেই। বাঙালি পরিবেশের এক স্নেহসন্তাপ বাস্তব জননী রূপেই চিত্রিত হয়েছে। বিবাহের পর পতিগৃহ থেকে প্রতি গৃহের পরিবার-পরিজনের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়েছে। ভাইয়ের কুশল সংবাদ না পেয়ে সে স্বামীকে ভাইয়ের সংবাদ নেওয়ার জন্য জোর করে গৌরে পাঠিয়েছে। কিন্তু যখন শুনলো যে ভাই তাকে নিঃসন্তান বলে গঞ্জনা দিয়েছে তখনই সে বলেছে –'আজ হতে ও পথে আপনি দিন কাঁটা।' স্বামীর প্রতি মমত্ব এবং সেইসঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধ এখানে রঞ্জাবতী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। লাউসেনের গৌড় যাত্রার সংকল্প জেনে রঞ্জাবতী আশঙ্কায় ভীত হয়ে তাকে যেতে বারণ করেছে এবং বলেছে-

'দুর্গম গৌড় যাবে আশা নাহি করি।

দেখো বাপু দাঁড়ায়ে অভাগি আগে মরি।।'

কিন্তু কোনমতেই যখন পুত্রকে নিবৃত্ত করা গেল না তখন রঞ্জাবতী তাকে বলেছে-

'কালী অতি শুভদিনে গৌড় তুমি যাবে।

অভাগীর মতে বাপু আজি কিছু খাবে।।'

এক বাঙালী মায়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যই তার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। শাপভ্রষ্ট দেবতার জননী হয়েও রঞ্জাবতী সারা জীবন দুঃখ আর বেদনায় কেটে গেছে। সন্তানবতীর সময় তার মত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন যে স্বামীকে ত্যাগ করে সে স্বর্গে ও যেতে চায় না নারী হিসেবে সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। কোন দেবী চরিত্রের মহিমা তার মানবিক চরিত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারেননি। স্নেহময়ী জননীও পতিপরায়ণা নারী রূপেই এক অনির্বচনীয় মহিমায় রঞ্জাবতী চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লখাই

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ডোম সম্প্রদায়ের রমনীরা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। তবে লখাই বীর রমণীর ভূমিকা পালন করলেও সে পতিব্রতা রমণী , বীরাঙ্গনা হয়েও দেবতার ভক্তিতে অটল। কবির বর্ণনা পারদর্শীতায় লখাই মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রমীলা চরিত্রের পূর্বসূরি হয়ে উঠেছে.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ বীরঙ্গনা চরিত্র কালু ডোমের পত্নি লখাই। পীযূষ কান্তি মহাপাত্রের মতে- এই চরিত্রটির মধ্যে নিষ্ঠা ,স্নেহশীলতা ,কর্তব্যবোধ, শুষ্ক বিচারবুদ্ধি, অসাধারণ ধৈর্য ও বিবেচনাবোধের সমন্বয় ঘটেছে।লখাই এর পরিচয় দিতে গিয়ে কালু লাউসেন কে বলেছে –গৃহিণী সনকা লখে সমর সিংহিনী।' অর্থাৎ কালুর প্রথমা পত্নী সনকা গৃহিণী আর দ্বিতীয় পত্নী লখাই সমরে নিপুণা।

লাউসেন রাজার আদেশে পশ্চিম উদয় দিত হাকন্দে গেলে কালু লখাইকে ময়না রক্ষার ভার দিয়ে যায়। অর্থাৎ একজন মহিলা দায়িত্ব পাচ্ছে যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। যদিও বাল্যকালের সেই শক্তি না থাকলেও লখাই-এর মনের শক্তি প্রবল। তাই প্রথমে স্বাভাবিকভাবে গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেও স্বামীর অনুরোধে সে অস্ত্র ধারণ করে নিজের শক্তিসত্তার পরিচয় দিয়েছে। তার বীরত্ব দেখে কালু বলতে বাধ্য হয়েছে-'শুভক্ষণে সেবেছিলে ওস্তাদের পা।'

কালু মদ্যপান করে কর্তব্য অবহেলা করেছে আর লখাই সব দায়িত্ব গ্রহণ করে মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। মহামদকে বলেছে-

'বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম।

বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।'

এই উক্তিতে সে তেজস্বিনী নারীর পরিচয় দেয়। যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার জন্য মহামদ লখাইকে প্রলোভন দেখালে সে মহামদকে বলেছে-

'ডোম হল আপন ভাগিনা হল পর।

এই যুদ্ধে এতকাল রাজার পাত্তর।।'

'ঘাস হেন বাসি পাত্র তোর পারা বাদী' অর্থাৎ তোর মতো শত্রুকে তৃণ বা তুচ্ছ জ্ঞান করি। তাছাড়া বলেছে,'জাতি রাঢ় আমি রে কর্মে রাঢ় তুঁ।'

একক উদ্যোগে রণসজ্জা করে সে যুদ্ধে অগ্রসর হলো। যুদ্ধ থেকে ফিরে সে প্রমত্ত নিদ্রিত কালুকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য উত্তেজিত করে, আঘাত করে-

'বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমারা থাক সাক্ষী ।

চাপড়ে চিয়ার পতি না হব পাতকী।।'

এর পরেও কালু যুদ্ধে যেতে না চাইলে লখাই স্বামীকে গঞ্জনা দেয়। পুত্রকে যুদ্ধে যেতে বলেছে। পুত্র দ্বিধাগ্রস্থ হলে পুত্র অসম্মতি শুনে বলে –'মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।' কর্মেও কথায় বর্তমান চরিত্রটি পাঠকের আত্মীয়তা অর্জন করতে পেরেছে।

লখাই চরিত্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাঙালি নারী গৃহচারিনী রূপের পাশাপাশি প্রতিবাদী সত্তার সংস্থাপনে চরিত্র নতুনত্বের সৃষ্টি করেছে। বিশেষতঃ মঙ্গল কাব্য ধারায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। স্বামী পুত্রকে যেভাবে নিশ্চিত মরণের মুখে পাঠাবার সংকল্প করেছে তাতে লখাইকে সাধারণ নারী বলে মনে হয় না। এই নারীর মধ্যে যে শক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে। তাতে করে তাকে ডোম রমণী বলে মনে হয় না।

কানড়া

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্য একটি বীররমণী হল কানড়া চরিত্র।সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়া যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিনী। তার ঘোষণা-'সেজে গেলে সংহারিব সহস্র অর্জুন'।তার পিতৃ রাজ্য আক্রান্ত হলে সে অশ্বারোহনে স্বয়ং সৈন্য চালনা করেছে। গৌড়েশ্বর তাঁর পাণিপ্রার্থী;কিন্তু সে মনে মনে বীরত্বের জন্য লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে বিজয়িনী হয়ে সে বাঞ্ছিত বরকে লাভ করতে পেরেছে।

কলিঙ্গা

কলিঙ্গা চরিত্রটির মধ্যে ঘনরাম গৃহচারিনী নারীর অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। তার স্বামী প্রেম, স্বপত্নী প্রেম , দেবভক্তি ও প্রভুভক্তি তাকে স্বাতন্ত্য বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরেনি।

তবে তার মহিমা সমুদ্ভাসিত। এটা ঠিক যে ধর্মমঙ্গলে ঘনরাম নারী চরিত্রগুলিকে গৃহচারিনী রূপের পাশে প্রতিবাদী সত্তার বীর রমণী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। নারী চরিত্রের এই একটি বিশেষ দিক ধর্মমঙ্গল কাব্য গুলির গতানুগতিক ধারায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

৪.৯- ধর্মমঙ্গলের সমাজ জীবন

সাহিত্য ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রচয়িতা নিজের সামাজিক মানুষ বলে সামাজিক বিষয়েও উপাদান কে উপেক্ষা করতে পারেননি। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য মূলত ধর্মমঙ্গল প্রচারক মঙ্গলকাব্য হলেও অষ্টাদশ শতাব্দী কবির সমকালীন সময়ের সমাজ ইতিহাস সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এই কাব্যে সমাজ চিত্র সন্ধান করার একটু অসুবিধা আছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সুখ-দুঃখের বর্ণনায় কবির কল্পনা মিশে যায়। এই কল্পনা থেকে যথার্থ সামাজিক প্রসঙ্গটি নির্ণয় করা কিছুটা দুঃসাধ্য বটে। তবুও কবিতার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলন ঘটাতে ভোলেননি।

প্রজাদের অবস্থান:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে শাসকবর্গের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মহামদ কর্তৃক প্রজাগণ এর উপর অত্যাচারের কাহিনীতে। যার মধ্যে স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের চিত্র প্রতিফলিত। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সেইসময় প্রজাসাধারণের ঘর-বাড়ি লুঠ করাতে, অসৎ ব্যক্তি ক্ষমতা পাওয়ার ফলে সৎ ব্যক্তিরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা লাঞ্ছিত হয়েছিল।কবির কথায়-

‘রাজ কর লোকের তে-সনি নিল বাড়া।

অতেব সকল প্রজা হলো দেশ-ছাড়া।।’

প্রজাদের দেশ ছাড়ার ফলে সামাজিক অস্থিরতা দেখা যায়।

জীবিকা:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে নগরপত্তন বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোকের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইছাই ঘোষের ঢেকুর গড়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ,ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বিভিন্ন ধরনের মানুষ পাশাপাশি বসবাস

করত।পসারি ,তামুলী , তাঁতি, তেলী , মালী , বণিক , কুমার , শাঁখারী , কর্মকার , কলু, কৈবর্ত্য , ছুতার , বাইতি , জালু , রজক প্রবৃত্তি ধারী মানুষ।এছাড়া যুদ্ধে বাদ্য বাজানোর জন্য কিরাত এবং পুরী রক্ষা করার জন্য চোয়াড় , খয়রা , কোল প্রভৃতি মানুষের কথা বলা হয়েছে। কাব্য অনুযায়ী

‘ইছাই দুর্ব্বার করিল রাজার।

দোহাই দূস্তর দূর।।

চৌদিকে পাহাড় বেড়ী বাড়ী গড়।

দুর্গম গহন কাটি।

করিয়া চত্বর বসাল নগর

রাজার বসতবাটী।।

করিয়া আসন গাড়িল নিশান

সম্মানে বসান পদ্য।

স্বধর্ম্ম মন্ডিত বিধর্ম্ম খন্ডিত

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য।।

সমাদরে তস্য বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য।

ধন্য ধরা ধর্ম্মপাল।

সম্মুখ সমর মাঝে অকাতর

বীরবিক্রমে বিশাল।।

করি বন্দোবস্ত বসিল সমস্ত

কুলীন কায়স্থ কত।

পবিত্র চরিত্র ঘোষ বসু মিত্র

মাজ্জিত মৌলিক যত।।

সিংহ দাস দত্ত আদি যে মহত্ব

বসিল উত্তর রাঢ়ী।

গোপ অবতংশ কত রাজবংশ

কুমার করিল বাড়ী

তিন কুল রাজ পুরে সুসমাজ

মহত্ত্ব মর্যাদাবান।

গণ্য গোপ যত করিল বসত

পাল ঘোষ কলে পাণ।।'

সামাজিক অবস্থান:

ব্রাহ্মণ থেকে রজক পর্যন্ত প্রভৃতি মানুষ যেমন একই সঙ্গে বসবাস করত তেমনি হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানেরাও বসবাস করত। কবি জানিয়েছেন-

'পাইয়া মর্যাদা কত মীরজাদা।

সৈয়দ পাঠান কত।'

তারা 'পেলে এক রুটি সবে খায় বাঁটি' অর্থাৎ এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো বিরোধ ছিল না।

পারিবারিক সম্পর্ক:

ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের বাঙালির পারিবারিক সম্পর্কের মধুর ছবি এঁকেছেন। মায়ের আশীর্বাদই ছিল পুত্রের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি-

'লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।

জননীর আশীষে জগতে হয় জয়।।'

মাতা পিতার সঙ্গে ভ্রাতার সম্পর্কটিও তুলে ধরা হয়েছে-

'শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।

শক্রতো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব।।'

বিবাহ:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে যে বিবাহ চিত্র তুলে ধরেছেন তার মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালির বিবাহ চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রঞ্জাবতীর বিবাহে বিচিত্র চন্দ্রাতক সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল, নিচে সপ বিছানো হয়েছিল এবং এই বিয়েতে কুটুম্ব ও বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে মঙ্গলদ্রব্য কন্যার কপালে ছোঁয়ানোর কথা বলা আছে। বিয়ের জন্য সেই সময় ধান-দূর্বা, কুসুম,ঘৃত, দধি, চন্দন, সিন্দুর, তাম্র, রুপা,সোনা,হরিদ্রা,দর্পণ ইত্যাদি নানা উপাদানের কথা বলা হয়েছে। নানা রত্ন ও বসন দিয়ে কন্যাকে বরণ করা হত-

'বসন ভূষণ গুয়া মনআপ মালা।

সবাই জোগান রঞ্জা বরণের ডালা।।

কপালে চন্দন দিয়ে বর কে বরণ করা হত-

বিধিমতে বরণ করয়ে রঞ্জাদাসী।।'

এবং বিবাহে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল

লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার:

সেই সময়ে সমাজে নানা প্রকার লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার মানা হত। কলিঙ্গর বিবাহ বর্ণনায় বলা হয়েছে-' আটদিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।' তন্ত্র মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকে মানুষের বিশ্বাস ছিল।সন্তান কামনার নানারূপ অনুষ্ঠান ও ব্রত পালন করা হত, এমনকি মানত পর্যন্ত করা হত-

'শিবার্চনা,শান্তি কত ব্রত উপবাসে।

কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে।।'

এছাড়া দৈবজ্ঞকে হাত দেখানোর প্রচলন ছিল।সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। কর্ণ সেনের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে- 'চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা।'

বশীকরণের জন্য ঔষধের ব্যবহার ছিল। অন্নপ্রাশনের কথা বলা হয়েছে- 'সাধে অন্নপ্রাশন করিল ছয় মাসে।' মেয়েদের সাত মাসে। কোথাও যাত্রা করলে শুভ-অশুভ ব্যাপারটি দেখা হত-

'অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্মচীল

শকুনি গৃধিনী আগে করে কিল কিল।।'

বিদ্যাচর্চা:

লাউসেনের বিদ্যাচর্চার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্যাচর্চার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর যুক্তাক্ষর, বানান শিক্ষা ও ব্যাকরণ শেখানো হত। অংক শিক্ষার পর ধাতুরূপ ও শব্দরূপ এবং বেদবানী শেখার জন্য পাণিনি পড়ানো হত।

প্রসাধন ও অলংকার:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে নারীদের প্রসাধন ও অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন। 'আখড়া পালা'য় পার্বতীর প্রসাধন অলংকারের বর্ণনায় সুচিত্রিত কাঁচুলি, কপালে সিন্দুর, চোখে কাজল, ভ্রুর উপর বিন্দু বিন্দু গোরোচনা দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকার সজ্জা, গজমতির হার, পুঁতির হার, নাকে কানে অলংকার, বাজুবন্ধ, ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। এইভাবে ঘনরাম তাঁর কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

সমাজ চিত্র:

ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা হয়।ডোম জাতির বীরত্বে, বাঙালি বীরাঙ্গনাদের চরিত্রচিত্রণে ধর্মমঙ্গল বিষয়বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নতুন। গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্য। এক একটি বাক্য প্রবচনের মত- 'কলি কালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।'

লখাইর সপত্নী সনকার মুখ দিয়ে মাত্র একটি কথায় কবি বাঙালি সংসারের যে চিত্র এঁকেছেন তা উল্লেখযোগ্য। শত্রু এসে নগর আক্রমণ করলে লখাই তার সপত্নীর কাছে নগর রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করল। এই সপত্নী কালু ডোমের উপেক্ষিতা পত্নী, সে শোনালো-

'মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।

দাসীটে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া।।'

বাঙালি সমাজের পুরুষেরা ভ্রাতৃবৎসল তাই যুদ্ধে বড় ভাই শাকার মৃত্যুসংবাদ শুনে যুদ্ধ সজ্জা করতে করতেও ছোটভাই শুকোর চোখ অশ্রুসজল-

'শত্রু তো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব।।

যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।

হেন শোক বুকেতে বাজিলো বজ্রাঘাত।।'

প্রাচীন বঙ্গের সমাজের জাতীয় বীরের ছবিতে পূর্ণ ধর্মমঙ্গল। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল আয়তনের প্রায় মহাকাব্যের সমান।রাঢ় জাতির আশা-আকাঙ্খা এ কাব্যে মূর্ত। পৌরাণিক প্রসঙ্গ আনায় এটিকে অনেকে পৌরাণিক মহাকাব্য বলেন।রাঢ়ের সমাজ, দেবদেবী, ঐতিহ্য ও মধ্যযুগের বীরত্বের কাহিনীতে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পূর্ণ। ধর্মদেবতার পাশাপাশি ভাগবতে কৃষ্ণ ও কংসের সঙ্গে লাউসেনের তুলনা কবির মৌলিক সংযোজন। ইছাই ঘোষের আরাধ্যা দেবী চণ্ডীও এ কাব্যের অন্যতম মুখ্য চরিত্র। শাস্ত্রজ্ঞ কবি বহুশাখা কাহিনীতে ভরিয়েছেন তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য। অপ্রধান চরিত্রও আছে প্রচুর। মহাকাব্যসুলভ অলৌকিকতা ঘনরামের কাব্যে লভ্য , তাই এটিকে জাতীয় মহাকাব্য বলা সমীচীন।

৪.১০- অনুশীলনী

১) ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২) ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর পরিচয় দিন।

৩) ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁদের কবি কৃতিত্ব আলোচনায় করুন।

৪) ধর্মমঙ্গল কাব্যকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলার উপযুক্ত কারনগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৫) ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুরের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দিন।

৬) ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

৭) ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার ধারায় ঘনরাম চক্রবর্তীর অবস্থান ও কৃতিত্ব বিচার করুন।

৮) ধর্মমঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি অপেক্ষা স্বতন্ত্র কাব্য- উক্তিটির যথার্থতা বিচার করুন।

৯) ধর্মমঙ্গল কাব্যের বীরনায়ক লাউসেন- আলোচনা করুন।

মন্তব্য

১০) ধর্ম ঠাকুরের উপাসিকা ও আদর্শ মাতৃ চরিত্র হিসেবে রঞ্জাবতীর পরিচয় দিন।

১১) একদিকে খল স্বভাবের চরিত্র মহামদ ও অন্যদিকে দেবী চণ্ডীর বর প্রাপ্ত ইছাই ঘোষ- এই দুই চরিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

১২) কালু ডোম ও লখা ডোমনি চরিত্রের পরিচয় দিন।

১৩) ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সমাজ জীবনের পরিচয় দিন।

৪.১১- গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন

২. শ্রীধর্মমঙ্গল - শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু

৩. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস - ক্ষেত্র গুপ্ত

৫. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল - পীযূষ কান্তি মহাপাত্র

৭. বাঙালির ইতিহাস:আদি পর্ব - নীহাররঞ্জন রায়

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয় - ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৯. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পুরুষ - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একক ৫.১- শিবমঙ্গল বা শিবায়ন

বিন্যাসক্রম

৫.১.১: দেবতা শিবের উৎস

৫.১.২: শিবায়নের বৈশিষ্ট্য

৫.১.৩: শিবায়নের কাহিনী পরিচয়

৫.১.৪: শিবায়নের কবিগন

৫.১.৫: শিবায়ন কাব্যের চরিত্র বিচার

৫.১.৬: শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্যের পার্থক্য

৫.১.৭: অনুশীলনী

৫.১.৮: গ্রন্থপঞ্জি

৫.১.১- দেবতা শিবের উৎস

শিব সম্বন্ধীয় আলোচনার সূচনাতেই আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য ''ভারতীয় যেসকল প্রাগবৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজে ও নিজের প্রতিষ্ঠাতা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান।'' প্রাগবৈদিক শিব দেবতার মূল রূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বাংলার লোকো জীবনে বৃষভধ্বজ শিব প্রথমেশ অপেক্ষা গঞ্জিকাসেবী ,পরস্ত্রীতে আসক্ত কৃষ্ণ-শিবেরই প্রাধান্য বেশি। এই শিব গবেষকদের মতে অস্ট্রিক সংস্কৃতি সঞ্জাত কৃষি দেবতার প্রতীক। আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতি সমন্বয় এর যুগে পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীরূধুপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব একাত্ম হয়ে যান । এখনো লোকায়ত জীবনে, নানা ব্রত কথায় ,শিবের গাজনের এই অনার্য শিবের প্রভাবই বাংলাদেশে বেশি। কাব্যের শিবায়ন এ নরখন্ড ও দেব খন্ড নেই। শিবায়ন কাব্যে কৈলাস বাসি শিবের ঘর-গৃহস্থালির কথা বিবৃত। কোনো তাঁর পূজার প্রচার করেছেন, এরকম

কাহিনী শিবায়ন নেই।'মৃগলুব্ধ' ধরনের ব্রতকথা জাতীয় আখ্যানে শিবের কথা আছে।চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের দেবখন্ড লৌকিক শিবের ঘর-গৃহস্থালির বর্ণনা আছে যা বাঙালি চরিত্র সংসারের প্রতিরূপ ।মঙ্গলকাব্য হিসেবে শিবায়ন কে ধরা যায়না এর কাহিনী ও অন্য। মঙ্গলকাব্যের মতো এতে বিষয় বৈচিত্র নেই।

মঙ্গলকাব্য শিবায়ন প্রভৃতি অর্বাচীন সাহিত্যে শিব চরিত্রের পৌরাণিক রুপটি পাওয়া যায়। পরিপূর্ণ দেবশক্তি সম্পন্ন রূপে নয় , মর্ত্যলোকের মানব রূপে এই শিবের আবির্ভাব। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য মিশে আছে এই শিবের মধ্যে। পৌরাণিক কাহিনী মূলত শিবপুরাণ, শাক্তপুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর লৌকিক শিব উঠে এসেছেন লোকসমাজ থেকে। বিভিন্ন পুরাণে শিবের বিভিন্ন রূপ। বামন পুরাণ এ তিনি মেঘ বাহন। ঋকবেদে পঞ্চ জন বা পঞ্চ জাতী ছিল।এই পাঁচটি জাতির উপাসিত বলেও শিবকে পঞ্চানন বলেও শিবকে মনে করা হয়। তন্ত্র শাস্ত্রে তিনি অর্ধনারীশ্বর, সদাশিব, মৃত্যুঞ্জয়, নীলকণ্ঠ, বর্ণনার সাদৃশ্যে বৈদিক দেবতা রুদ্রকে শিবরূপে গ্রহণ করা যায়। রুদ্র ধ্বংসের দেবতাউগ্র হিংস্র পশু তুল্য । সেই বজ্রবাহু রুদ্রদেবতাকে রোগমুক্তি সন্তান লাভের আশায় প্রীত করার জন্য বৈদিক ঋষিগন স্তব গাণ গাইতে শুরু করলেন। ধিরে ধিরে ভয়ঙ্কর দেবতা রুদ্র হলেন শিব বা কল্যাণময়। হলেন মঙ্গলের দেবতা। যজুর্বেদ এর সময় থেকে আর্য শিব অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজা লাভ করেছেন। তারপর থেকেই নানা জাতি নানা শ্রেণীর শিবকে বহুরূপে আরাধনা করে চলেছে ।সর্বত্যাগী মহাযোগী শিব নানা ধর্মগ্রন্থের সাহিত্যে বিচিত্রভাবে চিত্রিত হয়েছেণ. মহাভারতে ,সমুদ্রমন্থনের বিষপান করে শিব নীলকণ্ঠ। তারপর থেকে তিনি গাঁজা, ভাঙ,ধুতুরায়, আবিষ্ট। কখনো শ্মশানচারী, কখনো কিরাত। যুদ্ধ করেন অর্জুনের সাথে। কখনো সংসারের দারিদ্র মোচনে তার হাতে ভিক্ষাপাত্র।

বিভিন্ন পুরানে শিবকে কামুক এবং কিছু শিথিল রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে,শিবায়নে শিবের সঙ্গে কোচ রমণী ও বাগদীনির যে চিত্র আছে, তাতে তারই প্রভাব লক্ষ করা যায়। এভাবেই শিবের সঙ্গে নিম্ন জাতির মানুষের একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। লোক কাহিনীতে শিব ক্রমশ বাংলার নিতান্ত আপনজন হয়ে উঠেছেন। গাজনে ,চড়কে জড়িয়ে আছেন শিব ।মঙ্গলকাব্যের হরগৌরী সংসার জীবনে কবিগন বাংলার গৃহস্থের সংসারকেই তুলে ধরেছেন।

৫.১.২- শিবায়নের বৈশিষ্ট্য

পৌরাণিক শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই যদি 'শিবায়ন' কাব্যের বিষয়বস্তু হত,তবে এটিকে আর মঙ্গলকাব্য বলা সঙ্গত হত না। এটি হত তবে বাংলা পুরাণ অথবা পুরাণের অনুবাদ কিংবা সারসঙ্কলন। কিন্তু শিবায়ন কাব্যের কাহিণী বিশ্লেষণ করলে আমরা পৌরাণিক শিব ছাড়াও অপর এক লৌকিক শিবের সন্ধান পেয়ে থাকি। মঙ্গলকাব্যের লক্ষণযুক্ত এই কাহিনীটির জন্যই 'শিবায়ন' কাব্য মঙ্গলকাব্য বলে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

যাবতীয় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ‘শিবায়ন’ কাব্যকেই সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন বলে মনে হলেও,সম্ভবত শিবায়ন কাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল চৈতন্যপূর্ব যুগেই। চৈতন্য-জীবণীকার বৃন্দাবন

দাস তৎকাল প্রচলিত ‘শিবের গায়েন’-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং শিবের গান শুনে স্বয়ং মহাপ্রভু যে শংকর মূর্তি ধারণ করতেন, এই দুর্লভ সংবাদটি বৃন্দাবন দাস আমাদের জানিয়ে গেছেন। এ থেকে পরোক্ষভাবে আমরা শিবের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রেরও একটি পরিচয় পেয়ে থাকি। বস্তুত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এবং বৈষ্ণবোত্তম চৈতন্যদেবের মনে শিবের এই মর্যাদাবোধ হেতু শিবকে আমরা ‘জাতীয় দেবতা’র আসনে স্থান দিতে পারি।

পূর্বে শিবের উদ্ভব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যে প্রাগার্য, অনার্য ও আর্য ধারণার সংমিশ্রণের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব। এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন- “গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ হইতে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেইজন্য বাংলার বৌদ্ধগত পৌরাণিক শৈব ধর্মমতের মধ্যে নিজের আদর্শেরই সন্ধান পাইল। জৈন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শ ও গৌতম বুদ্ধ এবং এই পৌরাণিক শিবের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিল না সেইজন্য এই বিরাট জৈন সম্প্রদায়ও ক্রমে নব-প্রতিষ্ঠিত শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে বাংলার শৈবধর্ম এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।” বাংলার সর্বসম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য এই 'জাতীয় শিবই বাংলার

যাবতীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্যসমূহের দেবখণ্ডে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। তবে 'শিবায়ন" কাব্যে শিবের এক স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলেই এত সব মঙ্গলকাব্যে শিবকাহিনী বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পৃথক শিবায়ন কাব্যের সার্থকতা রয়েছে।

৫.১.৩- শিবায়নের কাহিনি পরিচয়

বাংলার শিব বিষয়ক কাহিনীগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১)মৃগলুব্ধ কাহিনী ২) শিবায়ন কাব্য -প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পর্যায়ের অংশ পৌরাণিক আদর্শ প্রধান।

মৃগলুব্ধ-

মৃগলুব্ধ কাব্যের এপর্যন্ত জ্ঞাত কবি রতিদেব। এর বিষয়বস্তু নিম্নরুপ । প্রথমে দেব দেবী বন্দনা ও আত্মপরিচয় বর্ণনার পর মধু কৈটভ বধ এর গল্প আছে। শিব মুনিপত্নীকে লঙ্ঘন করায় শিবের শাপে শিবের লিঙ্গচ্যুতি,ভ্রষ্ট লিঙ্গের প্রভাব ইত্যাদি ঘটনা হরগৌরী সংবাদে ব্রতের আকারে বিবৃত। রাজা মুচুকুন্দ ও রানী রুক্মিণীর কথোপকথনে মূল উপাখ্যানটি বর্ণিত। একদিন রাজা মুচুকুন্দ শিবচতুর্দশীর পুজো সাঙ্গ করে রানী রুক্মিণীর কাছে ব্রত কথা শোনেন। রানীর গল্প এরকম-বিদ্যাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রের সভায় নৃত্যের সময় হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখে তালভঙ্গ করেন। তাকে নরলোকে ব্যাধ জীবন-যাপনের অভিশাপ দেন। ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ লাভ করলে চিত্রসেনের শাপমুক্তি হবে- এ নির্দেশও ইন্দ্রের ছিল। সারাদিন হরিণ খুঁজে ব্যর্থ, শ্রান্ত ,অবসন্ন, উপবাস ক্লিষ্ট, ব্যাধ চিত্রসেন রাত্রিতে আত্মরক্ষার জন্য বেল গাছে ওঠে ।সেদিন ছিল শিবচতুর্দশী। চিত্রসেন গাছে ওঠার সময় একটি সজল বিল্বপত্র বৃক্ষের তলায় শিবলিঙ্গের উপর পড়ে। শিব তখন পরিতুষ্ট হয়ে ব্যাধকে বর দিতে আসেন ।ব্যাধ তার কাছে পরদিন সকালে পশুর লাভের বর পায়। পরদিন ভদ্রসেন মৃগ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়। এদিকে ভদ্রসেনের সঙ্গিনি মৃগী কিছুতেই তাকে ত্যাগ করে যেতে চায়নি। নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও স্বামী মৃগটীকে উদ্ধারের জন্য কৃত সংকল্প। এমন সময় ব্যাধ চিত্রসেন সেখানে উপস্থিত হন।

মৃগী বলেন জীব হত্যার তুল্য পাপ নেই। কেবল শিবরাত্রি ব্রতে সেই পাপমোচন সম্ভব এমন অনেক কথা বলে মৃগী তাকে ধর্মউপদেশ দিলেন।মৃগীর বাক্যে চিত্রসেনের জ্ঞানোদয় হয়। চন্দ্রভাগা তীরে শিবমন্দিরে আরাধনা করে চিত্রসেন পাপমুক্ত হন। ভদ্রসেন ও তাঁর পত্নী

মৃগীও শিবলোক পেলেন। রুক্মিণীর এই কথা শুনে মুচুকুন্দের শিবরাত্রি ব্রত উদযাপিত হয়। পরদিন সকালে চন্দ্রভাগা তীরের শিব মন্দিরে পূজা শেষ করে রাজা লোকান্তরিত হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

লৌকিক শিবায়ন কাব্য সমূহের গল্পাংশে দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের চেয়ে লোক জীবনাশ্রিত গল্পরস আছে। প্রাথমিক অংশে পৌরাণিক কাহিনী আছে। ইন্দ্র সভায় শিবের দ্বারা নমস্কৃত না হয়ে দক্ষ প্রজাপতি ক্ষোভ,শিব হীন দক্ষ যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ,দক্ষের বিড়ম্বনা , গৌরীরূপে হিমালয় ও মেনকার ঘরে সতীর পুনরায় জন্মগ্রহণ,পার্বতীর সাধনা ও শিবকে পতিরূপে লাভ ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গের শেষেই আরম্ভ হয়েছে বাঙালির লোকায়ত গল্প। অবশ্য এই অংশে মৃগলব্ধ অনুযায়ী বাধ্যকথা শিবরাত্রি মাহাত্ম্যের বর্ণনাও রয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। শিবায়ন এর মুখ্য গল্প এরকম-

গাহস্থ্যজীবনে পার্বতীর বড় দুঃখ ভিক্ষান্নে সংসার আর চলে না।মহাদেবকে তিনি কৃষক হওয়ার পরামর্শ দেন। বিশ্বকর্মা চাষের জোয়াল,লাঙল,মই তৈরি করে দিলেন। কুবেরের ভান্ডার থেকে এলো বীজ ধান।ক্রমে শিবের কৃষিকর্ম সার্থক হয়ে উঠল- বসুন্ধরা হল শস্যপূর্ণা। আনন্দে নিজের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত পরিবারের কথা ভুলে গেলেন।শিব ঘরে আসেন না পার্বতী দুঃখ-দুর্দশা অবধি নেই। নারদের কথায় শিবকে জব্দ করার জন্য তিনি উঙানি মশা,মাছি,ডাঁশদের পাঠালেন। শিবের পাকা ধানে পোকা পড়ল কিন্তু শিব নির্বিকার। অবশেষে মোহিনী বাগদিনীরূপে দেবীও মহাদেবকে বিভ্রান্ত করলেন। শিবের মন এবার টলল। বাগদিনীররূপে পাগল ভোলানাথ। ঠিক সেইসময় পার্বতীর ঘরে ফিরে এলেন।শিবও অনেকদিন পরে ঘরে এলেই পার্বতী সধবার ভূষণ শাঁখা চাইলেন শিবের কাছে। শাঁখা পড়লেই স্বামী আর বিমুখ হবেন না এই বিশ্বাসেই গৌরীর শাঁখা পড়ার অভিলাষ। শিব ভিখারি পাবেন কোথায় অর্থ যে গৌরীকে শাঁখা পড়াবেন। দুঃখে পার্বতী পিত্রালয়ে চলে গেলেন।হিমলয় গৃহে তখন দুর্গোৎসব।শিব শঙ্খ বণিকের বেশে শ্বশুরালয়ে উপনীত হন। পরে পার্বতী বিশ্বনাথের কাছে নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ শঙ্খ পরিধান করে মহাকালী রূপে আবির্ভূত হন।হরপার্বতীর বিবাদ মিটে গেল,তাঁরা ফিরে এলেন কৈলাসে।

৫.১.৪- শিবায়নের কবিগন

শিবায়ন কাব্যে আছে দুটি ধারা- একটি চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মৃগলুব্ধ মূলক উপাখ্যান, বা শিবমাহাত্ম্য কাহিনী, অন্যটি শিবপুরাণ নির্ভর শিবায়ন কাব্য।

চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত শিবমাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্যের সংখ্যা দুটি। একটি দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', অন্যটি রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ'। দুটিরই প্রকাশকাল ১৩২২ বঙ্গাব্দ। আবিষ্কারক আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাঁর সংগ্রহে ছিল আরো একটি নাম পরিচয়হীন পুঁথির অংশ বিশেষ। দীনেশচন্দ্রের মারফৎ রঘুনাথ রায় নামে আরও এক কবির নাম পাওয়া যায়, যদিও তাঁর অস্তিত্ব পুঁথি সমর্থিত নয়।

রতি দেব:

করিম সাহেবের মতে, রতিদেব অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের কবি। রতিদেব চট্টগ্রামের চক্রশালা পরগনার অন্তর্গত সুচক্রদন্ডী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে-

'পিতা গোপীনাথ মাতা মধুমতী।

জন্মস্থান সুচক্রদন্ডী চক্রশালা খ্যাতি।।'

রতিদেবের নামে প্রচলিত দুখানি পুঁথির (একটি অনুলিখিত ১২০৩ ও অপরটি ১২১৩তে)সন-তারিখ এবং ভাষা ও রচনাবলী ভিত্তিতে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন। কাব্যে আছে-

'রস অঙ্ক বাউশশী শাকের সময়।

তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হত্র।।'

অর্থাৎ ১৫৯৬ শকাব্দের কার্তিক মাসে (১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে) এই কাব্য রচিত হয়। রামরাজার মৃগলুব্ধ সংবাদের দুখানি পুঁথির একটি ১১৪২ মাঘীসনে এবং অপরটি ১১৯৬ মাঘীসনে অনুলিখিত।

রাম রাজা:

রামরাজার ব্যাক্তি পরিচয় মাত্র ভনিতাতেই সমাপ্ত- "শংকর কিংকর রামরাজা"। ড.সুকুমার সেনের মতে, কবির নাম শিশুরাম রায়। কারণ 'শংকর কিংকর রামরাজ গাএ'। তবু শেষ পর্যন্ত সবই অনুমান, অনুমান করিম সাহেবের কবিকে মগ বংশদ্ভুত বলে প্রমানের প্রচেষ্টা পর্যন্ত। বিপরীতভাবে রতিদেবের কাব্যে পারিবারিক পরিচয় বিস্তৃত-পিতা গোপীনাথ, মাতা মধুমতী, জ্যৈষ্ঠ ভাই দুজন রামচন্দ্র ,নারায়ন ইত্যাদি। জন্মস্থান চন্দ্রশালা বা পটিয়া বাকলা গ্রাম।

রামরাজা ও রতিদেবের কাব্যের বিষয়বস্তু একইপ্রকার ,ঘটনা বিন্যাসেও সাদৃশ্য বর্তমান। বলা হয় রতিদেব রামরাজার অনুকরণকারী। তবু কথা ঠিক, রামরাজা অপেক্ষা রতিদেবের কাব্যে কাহিনী অনেক সংহত এবং প্রসাদগুণ মণ্ডিত। তুলনা করলেই তা ধরা পড়ে-

প্রথমোক্ত কবির কাব্যে সতীহারা মহাদেবের বিলাপ-

'আপ্ত বিস্মরিলুম মুঞি তোহ্মার বাপের শাপে।

সেই হেতু তোহ্মা লয়ি ভ্রমি শোকতাপে।।'

আর রতিদেবের হাতে যমদ্বারের চিত্র-

"যমের দক্ষিণদ্বার অবিশ্রাম হাহাকার

যেন ডাকে সমুদ্রের জল।

সদাএ ঘোর অন্ধকার নিশিদিন কাটমার

রাত্রিদিন করে হাহাকার।।'

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) :

শিবায়ন শাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ভারতচন্দ্রের অর্ধশতাব্দী আগে এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের দেড়শত বৎসর পর কবি আবির্ভূত হন। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতায়, দৈনন্দিন জীবনের চিত্রাঙ্কনে, পরিহাসরসিকতায় তাঁকে প্রায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের মতো সমকক্ষ কবি বললে অত্যুক্তি হয় না।'ভব্যকাব্য ভদ্রকাব্য' প্রণেতা রামেশ্বর মুকুন্দের মতো কবি প্রতিভার অধিকারী নন। ভারতচন্দ্রের মতো রচনা বৈদগ্ধ্যও তাঁর ছিলনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগলক্ষণ তাঁর কাব্যে পরিপুষ্ট।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে রামেশ্বরের শিবায়নের 'বঙ্গবাসী' সংস্করনের সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু, আধুনিক সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীলাল হালদারের শিবায়নের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করন শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী তাঁদের সম্পাদকীয় ভূমিকায় রামেশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে কবি জীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত কথাটাই জানা যায়।

রামেশ্বর কাব্যের মধ্যে নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন 'সাকিম বরদাবাটি যদুপুর গ্রাম'। রামেশ্বরের কোনো বংশধর নেই। সম্ভবত তিনি নিঃসন্তান। কবির পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী ছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। কবির দুই পত্নী- সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী।

রামেশ্বর শিবায়নে নানাস্থানে রাজারামসিংহ তার পুত্র যশোবন্ত সিংহের প্রতি জানিয়েছেন তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি-

'রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নরনাথ

তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।'

মোগল আমলে বর্ধমান-মেদিনীপুর-হুগলি অঞ্চল শোভাসিংহ নামক এক দুর্দান্ত জমিদারের হাতে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্ত সিংহ সিংহসনে বসেন। রামেশ্বরের সঙ্গে এই রাজার মনোমালিন্য হওয়ায় কবি মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহের আশ্রয়ে রাজসভায় পুরাণ পাঠক হন।

রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে পুরাণের ঘনিষ্ঠ অনুকরণ আছে। কিন্তু শিবায়ন এর ঘটনা বিন্যাসে কবি মৌলিক। তৃতীয় পালার মাঝামাঝি থেকে রামেশ্বর অনুসরণ করেছেন লৌকিক শিবের কাহিনী। শিবের মোহনমূর্তি ধারণ- হরগৌরী বিবাহ ও তৃতীয় পালার বিশেষ আকর্ষণ। হরগৌরীর নানা তত্ত্বকথা আলোচনা ,রাম নাম মাহাত্ম্য ও হরিনাম মাহাত্ম্যের ঘোষণায় চতুর্থ বালা সমাপ্ত হয়েছে।পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় জাগরন অংশটি বর্ণিত। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণ ও সমস্ত পালায় বাগদিনী বেশী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মৎস্য ধরার পরিচয় আছে। কিন্তু যথার্থ লৌকিক কাহিনী আছে ষষ্ঠ পালায়।ষষ্ঠ পালায় মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করে কৃষকরূপে অবতীর্ণ।সমস্ত পালায় বাগদিনী বেশিনী মহামায়া সঙ্গে শিবের মাছ ধরার ও শিবকে ছলনা করে দেবীর কৈলাসে প্রস্থান বর্ণিত। শিবেরও কৈলাস যাত্রার কাহিনী এই পালায় পাওয়া যায়।

জাগরন পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর স্বামীর কাছে শাঁখা পরার বাসনা, শিবের সে ব্যাপারে দারিদ্র্যজনিত অক্ষমতা জেনে দেবী সাভিমানে চলে যান পিত্রালয়ে। এরপর শিব গৌরীকে শাঁখা পরিয়ে পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টায় সফল হন। হর-পার্বতীর মিলনে কাব্যটি সমাপ্ত। এটাই লৌকিক কাহিনীর ধারা। এই লোকায়ত কাহিনী কোন পুরাণে নেই। কেবল নন্দিকেশ্বর পুরাণের কিছু অংশে শিবের কৃষিকাজের বর্ণনা আছে। ধর্মমঙ্গলেও শূন্যপুরাণে

অংশে শিবের চাষবাসের বর্ণনা আছে। পূর্ব ভারতের নিষাদ যুগ থেকে(অস্ট্রিক)ধান্যক্ষেত্রের দেবতারূপে ক্ষেত্রপাল ধরনের কোন কৃষিদেবতার পূজা তদানীন্তন আর্যেতর কৃষকসমাজে প্রচলিত ছিল।এইজন্য মধ্যযুগীয় লৌকিক বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশে ধানের এত বিচিত্র রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

পার্বতী কৃষিকার্যে নিরত মহাদেব কে উত্যক্ত করার জন্য ডাঁশ মশা পাঠালেন। এই মশা-

'সূক্ষ্ম বটে শরীর সামর্থ্যে নহে ত্রুটি।

হাতি পারা জন্তুকে হারাতে পারে দুটি।।'

মহাদেব কি ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে পার্বতী বাগদিনী বেশ ধরে মহাদেবের ধানক্ষেতে উপস্থিত হন। ডাঁশ মশা,মাছি,জোঁক পাঠিয়ে মহামায়া যা করতে, পারেননি শুধু বাগদিনী বেশ ধরেই পার্বতী মহাদেবকে বশীভূত করলেন তাঁর মনমোহিনী রূপে-

'কামিনী কটাক্ষ শরে

অস্থির করিলা ভূতনাথে।'

শিবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে যে এই মোহিনীরুপা নারী তাঁর স্ত্রী। তাই ভৃত্য মহাদেবকে বলেন- 'মোর মনে হেন লয় কদাচিত হবে তোর মামী।'

বাক্যচ্ছলে মহামায়া নিজ পরিচয় দিলেও শিব বাগদিনীকে সাঁগা করার জন্য উৎসুক। শেষে মহেশ্বর হাটু জলে নেমে জল সেঁচে মাছ ধরলেন-

'সোলশাল রোহিত মৃগাল ধরে তাড়্যা।'

শিবকে বাসর নির্মাণ করতে বলে ছদ্মবেশিনী দেবী কৈলাসে ফিরে নিজ মূর্তি ধরলেন। এদিকে বাসর সাজিয়ে অপেক্ষা করতে করতে হতাশ।গৌরি সক্রোধে ছেলেদের দিলেন করা হুকুম-

'তোর বাপ বাগদি হঅ্যছে ছাড়্যা মোকে।

তার ঠাঞি যাস নাই ছুঁস নাই তাকে।।'

নারদের প্ররোচনায় দেবী মহাদেবের কাছে শঙ্খ পরার অভিলাষী। দেবীর শাঁখা পরার বাসনায় মহাদেব ব্যঙ্গের সুরে বললেন-

'ভিখারির ভার্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।'

ব্যাপার এত দূর গড়াবে তা শিব বোঝেননি। দেবী পিত্রালয়ে চলে গেলেন। শাঁখারির ছদ্মবেশে হিমালয় শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে শাঁখারি শিব পার্বতীর হাতে শাঁখা পড়ালেন। শেষে ধ্যানের তালিকা দিয়ে গীত শেষ করলেন রামেশ্বর।

রামেশ্বরের শিবায়ন পন্ডিত ব্যক্তির রচনা হলেও হরপার্বতীর লৌকিক লীলায় গ্রাম্য ধুলোট উৎসব ও গাজনের রঙ্গরসে ভরপুর।এই কাব্যকে মধ্যযুগের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কাব্য বললে ভুল হবে। দরিদ্র শিবের ঘর-সংসার ও তার বর্ণনা বাস্তব।দেবি রণচণ্ডী মূর্তিতে বাগদিনী সংস্পর্শের অপরাধে খোদ মহাদেবকেও ঘর থেকে ভাগিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু ঘটনার মধ্যে জমাট ভাব নেই। নারদ ও ভীম চরিত্র ও লোকায়ত ভাবনার স্পর্শে অনেকটাই লৌকিক। কোন কোন স্থানে কবি ভারতচন্দ্রের মতোই সরস-

'তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক অন্ন দেন সতী।

দুই সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।।

তিন জনে একুনে বদন হইল বার।

গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।।'

বিবাহের পর কন্যা বিদায়ের পূর্বে শাশুড়ি জামাতা শিবকে যা বলেছেন তা বাঙালির মর্মকথা-

'কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।

বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি।।

আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয়ে পেট ভরা ভাত।

প্রীত কর যেমন জানকী রঘুনাথ।।'

এক যুগের সম্পন্ন গৃহস্থের চিত্রটি কবি লেখনীর এক আচঁড়ে মূর্ত।

কবির কিছু কাব্যবিন্যাস প্রশংসনীয়-

১) দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলাকাটা।

২) হাঁড়ির মুখের মতো মিলি গেল সরা।

৩) পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

৪) মরণ অধিক দুঃখ মাগ্যের বাখান।

৫) নামের নিমিত্তে লোক নানা কর্ম করে।

রামেশ্বরের অনুপ্রাসগুলিও তাঁর কারুকলার পরিচায়ক-বিশেষত তাঁর কাব্যেঃ

১)খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।

কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মূরছিত।

২) কর্জ কর কত্যায়ানী কুবেরের কাছে।

কবির শিবায়নের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবশক্তি। কিন্তু রামেশ্বর ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী।

‘শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা সেই স্মরে।

বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে।।’

গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমি অঙ্কনে রামেশ্বরের কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য।

রামচন্দ্র কবিচন্দ্র:

জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্বীকৃত সম্মান না পেলেও শিবায়ন কাব্য ধারার স্মরণীয় ব্যক্তি রামচন্দ্র রায় কবিরত্ন। দুখানি মাত্র পুঁথির ভিত্তিতে তাঁর কাব্য সম্পর্কে পরিচয় লাভ। তার মধ্যে একটি খণ্ডিত এবং খুবই অর্বাচীন কালের লিপিকৃত রামচন্দ্রের প্রথম পুঁথিটির আবিষ্কারক বিশ্বকোষ পর্যায়ের তত্বাবধায়ক নগেন্দ্রনাথ বসু। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে মৃণালকান্তি ঘোষের সহযোগিতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তাঁর এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত। পুঁথিটির লিপিকাল ১০৯১ বঙ্গাব্দ। ১১ শ্রাবণ (১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ) কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ সম্পাদক ড.দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই তারিখ মানতে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয় পুঁথিটির আবিষ্কারক কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়। তাঁর পুঁথিটির লিপিকাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৭২৬ খ্রিস্টাব্দ)। পুঁথিটি প্রমানিক এবং পূর্ণাঙ্গ।

কবির পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান হাওড়া জেলার আমতার কাছে দামোদরের তীরে অবস্থিত রামপুর গ্রাম। তাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ বংশীয় , কৌলিক উপাধি দেব পরে ‘রায়’ উপাধি ধারণ। শিবায়নের আর এক কবি রামকৃষ্ণ রায়ের পুঁথি থেকেই জানা যায়, কাব্য রচনার পূর্বেই

রামকৃষ্ণ 'কবিচন্দ্র' খ্যাতি অর্জন করেন- 'শ্রীকবিচন্দ্র বিরচিতা শিবসঙ্গীত পুস্তক সমাপ্ত'(পুষ্পিকা)। কবির পিতার নাম কৃষ্ণ রায়। পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায় মাতা রাধারদাসি ,মাতামহ সূর্যমিত্র পিতার পান্ডিত্যের দুর্লভ উত্তরাধিকার রামকৃষ্ণ অর্জন করেন। সম্ভবত পরিণত যৌবনেই তাঁর কাব্য রচিত হয়।

বাড়িতে রক্ষিত দলিল-পত্রাদির ভিত্তিতে পাঁচুগোপাল বাবুর অনুমান, কবির জন্ম ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দেরও আগে। কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদকদ্বয়ের মতে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে কবির জন্ম, মৃত্যু ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুর কারণ বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের রসপুর গ্রামের কবি গৃহদেবতাকে বলপূর্বক হরণ শোকে-লজ্জায়-অপমানে কবির মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্রের কাব্যের নাম লিপিকরের বিচারের 'শিবসংগীত'। কিন্তু মুদ্রিত কাব্যের মধ্যে শিবমঙ্গল এবং শিবায়ন নামটিও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে-'রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল', 'রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন'। কাব্যটির কাহিনী দীর্ঘায়ত, মোট ২৬ টি পালায় বিভক্ত। প্রথম তিনটি পালায় সৃষ্টিতত্ত্ব, কাল বিভাগ ও তীর্থ মাহাত্ম্যের বিস্তারিত বর্ণনা, চতুর্থ ও পঞ্চম পালায় সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ ,ষষ্ঠ -সপ্তম –অষ্টম পালায় তারকাসুর বধ,মহাদেবের তপভঙ্গ ,মদনভস্ম, পার্বতীর তপস্যা, মহাদেবের গৌরী লাভের ইচ্ছা পর্যন্ত বর্ণিত ।নবম থেকে বিশ পর্যন্ত পালায় হরগৌরীর বিবাহ, মনসা উপাখ্যান, সমুদ্র মন্থন, বলি রাজার কাহিনী রাজার কাহিনী,সগর রাজা ও গঙ্গার কাহিনী আছে। বাকি ছটি পালাতে আছে ত্রিপুরাসুর ও তারকাসুর আখ্যান , শিব দুর্গার ঝগড়া ,অন্ধকের গল্প, অন্ধকবধ, পরশুরাম ও রাবণের কথা, বাণ রাজের কন্যা ঊষা ও কৃষ্ণ-নন্দন অনিরুদ্ধের মিলনের কাব্য সমাপ্ত হয়েছে।

রামচন্দ্রের সুবিশাল কাব্যটির মধ্যে মোটামুটি ভাবে তিনটি ধারা লক্ষণীয়- প্রথমত ,মন্বন্তর - সৃষ্টির রহস্য প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধারা। দ্বিতীয়ত, শিব কাহিনী এবং তার আনুষঙ্গিক পৌরাণিক উপকাহিনীর ধারা। তৃতীয়ত, লৌকিক শিবায়ন শ্রেণীর রঙ্গধামালি। পৌরাণিক প্রজ্ঞা ও লৌকিক ভাবনায় প্রকাশ থাকলেও দেখা যায় চিরায়ত পুরাণের প্রতি কবির ঝোঁক বেশি। শৈব শাক্ত পুরাণের সঙ্গে বৈষ্ণব পুরাণ পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। হরিহরের মিলন প্রচার ছিল তাঁর কাব্যে অন্যতম উদ্দেশ্য – 'হরিহর দোঁহে এক শরীর অভেদ '।তবু সামগ্রিকভাবে ব্রহ্মের প্রতি এবং মীননাথ-গোরক্ষনাথ- চৈতন্যদেব -নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে কবি ছিলেন অকুণ্ঠিত।

শিবায়ন কাব্যধারার মধ্যে রামচন্দ্রের কাব্যটির প্রধান লক্ষণীয় বিশেষত্ব , প্রচলিত লৌকিক শিব কাহিনী ছেড়ে যথাসম্ভব পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণ। এই কাব্যধারায় অপর দুই কবি রামেশ্বর এবং শংকর কবিচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের একটি অন্যতম কারণ এখানেই নিহিত। হরগৌরীর বিবাহ প্রসঙ্গ ছাড়া দেবীর বাগদিনী রুপে শিবকে ছলনা,শিবের কুচনী পাড়ায় যাত্রা প্রভৃতি লৌকিক কাহিনী রামচন্দ্রের কাব্যে একেবারেই লক্ষণীয় নয়। তাঁর কাব্যের রুচি সমুচিত, সংহত এবং রীতিমত প্রশংসনীয়। পুরাণের আবহে নানা নীতি, তত্ত্ব ও দর্শনের পটভূমিতে বহু উপকাহিনী পরিব্যপ্ত।এই বিদগ্ধ কাব্য যতখানি উপলব্ধির বিষয়, ততখানি উপভোগের নয়।

রামকৃষ্ণের কাব্যের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিশেষত্ব ভাষা, শব্দ সম্পদ এবং ছন্দ ব্যবহারে নিপুণতা। যেমন কৃষ্ণ প্রশস্তি বন্দনা-

'নীপ সমীপ নব নীরদ

তড়িতলতা তথি অঙ্গ।

রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন

পীতাম্বর তিরিভঙ্গ।।'

কুমারসম্ভব কাব্য অনুসরণে রতিবিলাপ অংশও-

'অনাথ করিয়া মরে যাও প্রভু কোথাকারে।

আর না দেখিব চান্দমুখ।।'

পান্ডিত্যের প্রতিবাদীতায় রচনা ভঙ্গি মাঝে মাঝে যে বেশ নীরস এবং তত্ত্ব মুখ্য হয়ে উঠেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। কবি রামেশ্বরের কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্য ব্যবহারের প্রথম প্রয়াস এখানে দেখা যায়। পয়ার- ত্রিপদীতে কাব্য ঘটনা বলতে বলতে তিনি পরিচ্ছন্ন অন্বয় এবং স্বাভাবিক বাক্যবিন্যাসে গদ্য ব্যবহার করেছেন। যেমন-'মহিষ পর্বতে গিয়া পূর্ব গল্পের কথা ক্রৌঞ্চকে কহিতেছেন ,অবধান করহ।' 'অথবা পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন, এমন সময় শংকর মনের দুঃখে নারদ কে কহিতেছেন, অবধান করহ' ইত্যাদি। বাংলা সাধু গদ্যের প্রথম স্রষ্টায় সম্মান তাকে দেওয়া যায়।

শংকর কবিচন্দ্র:

সপ্তদশ শতকের শিবায়ন কাব্য ধারায় স্মরণীয় হয়ে আছেন শংকরকবিচন্দ্র ।কবি কৃষ্ণ রামের মতো শংকরের কবি প্রতিভা বহু কাব্য সৃষ্টিতে বিভক্ত। শিবায়ন ছাড়া ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, শীতলা মঙ্গল, প্রভৃতি কাব্যেরও তিনি রচয়িতা ।সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণ কবির জন্ম হয়। গ্রামের নাম পানুয়া। বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিংহের তিনি ছিলেন সভাকবি। আবার এই বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ এর রাজত্বকালে (১৭০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) তিনি রামায়ণ পাঁচালি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

শঙ্করের শিবায়ন কাব্যের পুরো পুঁথি পাওয়া যায়নি ।তবে প্রাপ্ত 'মচ্ছধরা পালা' এবং মাখনলাল মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত 'শঙ্খপরা পালা'টি তাঁর রচনার বলে জানা যায়। মচ্ছধরা পালাটি শিবায়ন এর লোক প্রচলিত কাহিনীর প্রথম লিখিত রূপ বলা যায়। কৃষাণ ও জালিক শিবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাঙ্কনের কৃতিত্ব শংকর কবিচন্দ্রের প্রাপ্য। বাগদিনী বেশিনী দেবীর বর্ণনা-

'বাগ্দিনী বেশ করি উভ করি খোঁপা।

পুষ্পমালা তাতে সোভে সুবর্ণের ঝাঁপা।।

কান্ধেতে ঘুনসি জাল ইসাদের কড়ি।

পরিপাটি কান্ধে সাজে মচ্ছের চুপড়ি।।'

পালাটির মধ্যে ভণিতা পাওয়া যায় একাধিক নামে -শ্রীকবিকঙ্কণ, শ্রীকবিশংকর, সুকবিশংকর,দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রভৃতি। লিপিকর প্রমাদে কখনো কখনো 'কবিচন্দ্র' 'কবিকঙ্কনে' রূপান্তরিত হয়েছে।

৫.১.৫- শিবায়ন কাব্যের চরিত্র বিচার

শিব-

শিব বৈদিক রুদ্র প্রলয়ের দেবতা। পৌরাণিক দেবতারূপে তাঁর একটা ধ্যানী রুপ আছে। শিব যখন রুদ্র ও নটরাজ তখন তিনি সংহারের দেবতা। শিবের নটরাজ মূর্তিটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয়। কুমারসম্ভবের শিব যোগী তাঁর সেই প্রসন্ন বরদ আশুতোষ রূপটিই সকলের প্রিয় তবু মানতেই হয় পৌরাণিক শিবের আর্য দেবোচিত মহিমা থাকা সত্বেও অনার্য ভাবা আনুষঙ্গ

ঘোচেনি। তিনি শ্মশানবাসী, সর্প ভূষণ , ব্যাঘ্রচর্মই তাঁর পরিধেয় বাস। নিত্যসঙ্গী ভূত-প্রেতের নিয়ে যজ্ঞ পশু করে সুখী। তিনি কামচারী। প্রলুব্ধ করেন শিব ঋষিবধূদের। কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভবে যোগী শিবের যে ধ্যানরত ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে অনার্য লোক কল্পনার কোনো ছবি নেই।

নাথ পন্থীদের দৃষ্টিতে তিনি মহাযোগী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।এ শিব যোগতত্ত্বের প্রতীক দেবতা। মঙ্গলকাব্যের শিব লোকায়ত ভাবনা থেকে জাত। দরিদ্র ,গৃহস্থ, ভিক্ষাজীবী, নেশাখোর, শিথিল চরিত্রের পুরুষ শিব। শিবের কৃষক রুপের কথা পাওয়া যায় বিদ্যাপতির বিষয়ক মৈথিল পদে।রামাই পন্ডিত দের নামে প্রচলিত শূন্যপূরান এ শিবকে কৃষিকার্য করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গল কাব্যে শিব দুর্গার সংসারজীবন,শিবের কৃষিকাজ , শিব দুর্গার বিচিত্র দাম্পত্য লীলা বর্ণিত। মৃগলুব্ধ ও শিব চতুর্দশীর ব্রত কথা থেকেও শিবের চরিত্র আঁকা হয়েছে শিবায়নে।

শিবায়ন এর শিব কৃষক। তিনি কৈলাস থেকে গ্রাম বাংলার ধান্য ক্ষেত্রে নেমে এসেছেন লাঙ্গল-চষার জন্য। শিবের কৃষিকর্ম সার্থক হলো বসুন্ধরা হলো শস্যপূর্ণা ।শিব গৃহে আসেন না। পার্বতীর দুঃখের শেষ নেই। নারদের পরামর্শে শিবকে বিরক্ত করার জন্য তিনি মশা ও ডাঁশ মাছিদের পাঠিয়ে দিলেন। নিরুপায় বিশ্বেশ্বরী বাগদিনী রূপে মহাদেবকে বিভ্রান্ত করলেন। বাগদিনীর রূপে উন্মত্ত প্রায় শিবকে দেখলে কিছুতেই সেই কুমারসম্ভবের শিবকে মেলানো যায়না অসচ্ছল সংসারের একজন গৃহিনীর স্বামীর কাছে দুগাছি শঙ্খ প্রার্থনার চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন নিপুনভাবে-

‘প্রণমিয়া পার্বতী প্রভুর পদতলে।

রঙ্কিনী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে।।

গদগদ স্বরে হরে করে কাকুবাদ।

পূর্ণ করি পশুপতি পার্বতীর সাধ।।

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।

কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই।।’

ভোলানাথ পারিবারিক সুখ দুঃখের নির্বিকার বাঙ্গালী বৃদ্ধ স্বামীর মতোই পার্বতীকে গঞ্জনা দিয়ে বলেন ,তিনি যেন তাঁর পিতার গৃহে গিয়েই শাখা পড়েন।শিব ভিখারি তিনি শাঁখা কিনে দিতে অক্ষম। অক্ষম স্বামীর মুখে এই গঞ্জনায় পাবতীর বুকে শেল বিঁধল তিনি পিত্রালয়ে চলে গেলেন। সেদিন গৌরীর পিত্রালয়ে হিমালয়ে বাঙালির প্রিয় দুর্গোৎসব। তার আগে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী নিত্যনৈমিত্তিক কলহের কথা পতিনিন্দা পার্বতী বলেছেন অনেক দুঃখে যদিও কবিদের ভাষায় কৌতুক আছে-

‘ভোলানাথ আমি যেই তেঞি সে সম্বরি।

অন্যে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ

পালাইত হৈয়া দিগম্বরী।।’

দেবীর ঝগড়ায় দাপটে শঙ্করও হার মানলেন, তাকে সংসার করতে হয় না তাই গৌরীর কুবাক্য তার কাছে অসহ্য-

‘শংকর কহেন রোষে তোমার মৌখার্যদোষে

রহিতে না পারি আমি বাসে

এই কন্দলের ঝরে সকল সম্পত্তি উড়ে

পাড়ার পড়সী সব হাসে।।

পড়সী’দের কাছে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া চিরকালই মুখরোচক বিষয়-

সমাজে সতীনসমস্যাও কম ছিল না । পার্বতী ও গঙ্গার গালিগালাজ অশ্রাব্য কলহের দেবতার নারদ হরিগুণ গাইলেও ঝগড়া পাকাতে ওস্তাদ।দেবদেবীরাও গঙ্গা ও পার্বতীর কলহ শুনতে হাজির হলেন মর্ত্যে। সমাজে এ ধরনের সমস্যা হলে বাঙালিরা উপভোগ করত। এর গভীরে ঢোকার ক্ষমতা বা শিক্ষা তখনকার বাঙ্গালিদের ছিল না ।ব্যাপার গুরুতর দেখে সব স্বামীদের মতোই কিছুদিন লুকিয়ে রইলেন। পরে নারদই পুনর্মিলন ঘটালেন।

বাঙালি পরিবার ও সমাজের ছবি এইরকমই।লোকায়ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত শিবের কোচনী পাড়ায় যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বাঙ্গালী দরিদ্র দম্পতীদের লাগে অর্থের অভাবে।

আর পুরুষের বহুবিবাহ কোন মেয়েই বা সহ্য করতে পারে। পার্বতী আর গঙ্গা দুজনের শিবের বিবাহিত স্ত্রী। দুজনেই স্বামীর অর্থও ভালোবাসার প্রত্যাশী ও ।শিব রিক্ত ।তাই গঙ্গা ও পার্বতী সাধারণ মেয়েদের কুরুচিপূর্ণ ভাষায় ঝগড়া করেন । শিবায়নের দেবদেবীরা সমাজের বিভিন্ন নারীপুরুষের প্রতিচ্ছায়া বললে অত্যুক্তি হয় না।

৫.১.৬- শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্যের পার্থক্য

(ক) মঙ্গলকাব্যের মতো শিবের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার শিবায়ন কাব্যে দেখা যায় না। কোন অনিচ্ছুক ব্যক্তি কে ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে শিবভক্তের পরিণত করার প্রথানুগ বৈশিষ্ট্য শিবায়ন কাব্যে বিরলদৃষ্ট। কোন শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীর সাহায্যে পূজা প্রচারের পরিকল্পনা এখানে দেখা যায় না।

(খ) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে নায়কের বাণিজ্য বাদ শিকার পেশার পরিচয় পাওয়া যায় ।এখানে কৃষিজীবি বৃদ্ধ দরিদ্র শিব নীতিহীন ধূলিমাখা মর্ত্যমানব মাত্র।

৫.১.৭- অনুশীলনী

১) শিবায়ন কাব্যে শিবের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) মধ্যযুগের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় শিবায়ন কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩) শিবায়ন কাব্যের কাহিনি কে কয়টি খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে ও কি কি? প্রত্যেকটি খন্ড কাহিনির পরিচয় দিন।

৪) শিবায়ন কাব্যের কবিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫) শিবায়ন কাব্য ধারার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি কে? তাঁর কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৬) শিবায়ন কাব্যের প্রধান চরিত্র শিব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭) শিবায়ন কাব্যের চরিত্র-চিত্রন করুন।

৮) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের পার্থক্য বিচার করুন।

৫.১.৮- গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা- শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৬. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৫.২- অন্নদামঙ্গল

বিন্যাসক্রম

৫.২.১- উদ্দেশ্য

৫.২.২- অষ্টাদশ শতাব্দী যুগ চেতনা ও ভারতচন্দ্র

৫.২.৩- অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

৫.২.৪- অন্নদামঙ্গলের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

৫.২.৫- 'নূতনমঙ্গল' অভিধা কতখানি প্রযোজ্য

৫.২.৬- অনুশীলনী

৫.২.৭- গ্রন্থপঞ্জি

৫.২.১- উদ্দেশ্য

মঙ্গলকাবোর মঙ্গলময় স্বরূপ সন্ধানে একটি বিশিষ্ট সংযোজন এবং তথাকথিত বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য কাব্য ‘অন্নদামঙ্গল’। সমগ্র বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক আখ্যান কাব্য সাধারণ মানুষের মনের খোরাক হিসাবে মঙ্গল অভিধায় ভূষিত।কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যখানি অন্যধরনের অন্যমাত্রার কাব্য। এই কাব্যের প্রেক্ষাপটে যুগধর্ম ও সমাজ মানসিকতা, পুরাণ প্রভাবিত দেব-দেবী তৎসন্নিহিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পাশাপাশি ইতিহাস এবং মানবিক রোমান্টিক মধুর আলেখ্য বিদ্যাসুন্দর প্রণয়াখ্যান সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে বাঙালী জীবন-যৌবনের লালিত কলা বিদ্যায়। তবে ভারতচন্দ্র এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত যার প্রেক্ষাপট কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত রাজসভা কক্ষে।কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি দেশীয় সাহিত্যের বাজারে তার বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার জীবনী-

আলেখ্য যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত 'রাজকণ্ঠে মণিমালা''সমাদৃত এবং সর্বোপরি যা নুতন মঙ্গল অভিধায় ভূষিত! সেই কাব্যের কবি জীবনী ও তিনখণ্ডে বিন্যস্ত কাব্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা মঙ্গলকাব্যপ্রেমী সাহিত্য পাঠকের জীবনরস বললে কম বলা হয় না। একাব্য পাঠের কয়েকটি উদ্দেশ্য তো সকলকে মুগ্ধ করতে বাধ্য

(১) ভারতচন্দ্রের দুর্বিসহ জীবন-যাত্রার পাশাপাশি কাব্য রচনার রীতিকৌশল।

(২) স্থান-কাল-যুগপ্রেক্ষাপট; পুরাতন ও নুতন যুগের সেতুরীতির বন্ধন কৌশল।

(৩) দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে বাস্তব নর-নারীর জীবন-আলেখ্য।

(৪) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বাস্তব ছবি।

(৫) রাজসভার মণ্ডলকলাসুলভ শিল্পকৌশল।

(৬) ভাষা-দক্ষতায় ও ছন্দ-অলংকার-উপমাতে কবি-কৃতিত্ব।

(৭) সর্বোপরি জীবন-যাত্রার স্থলনে এমন মধুর কাব্য রচনা যা সমগ্র মঙ্গলকাব্য আধারে সম্পূর্ণ নুতন মাত্রা দান করেছে।

৫.২.২- অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগচেতনা ও ভারতচন্দ্র

১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সংঘর্ষের ফলে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘনঘন পালাবদল চলছিল ,প্রশাসনিক শিথিলতা দেখা দিয়েছিল; তার অভিঘাত এসে পৌঁছেছিল বাংলাদেশ ও। একদিকে রাষ্ট্রশক্তি তে উত্থান-পতনের ঘটনা শাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা অন্যদিকে বণিক শক্তির অভ্যুদয় বর্গীর আক্রমন বাংলা শান্তি ও সমৃদ্ধির ভিত্তিতে শিথিল করে দিল ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) থেকে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)এই ৫০ বছরের মধ্যেই বাংলার সার্বিক জীবন চেতনা এক অন্তঃসারশূন্য জীবনচর্যায় পর্যবসিত হয়েছিল।একদিকে ধন গর্বিত অভিজাতের আন্তরিকতাহীন আরবের জৌলুস অন্যদিকে নিরন্ন অত্যাচারিত জনসাধারণের জীবনে অন্ধকার বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবনচর্যায় এটিই মূল সুর। দেশে তখন শাসন নেই আছে নিরবিচ্ছিন্ন শোষণ।সুবেদার

রাজকর্মচারী বিদেশী বণিকদের অবাত শ্বসন নীতিহীনতা বর্গীদের ক্রমাগত লুণ্ঠন হত্যা অগ্নিসংযোগ এবং ইংরেজ বণিকদের বৈভব পূর্ণ বিলাসী জীবনযাপন বাংলার আর্থিক এবং সামাজিক সংস্কৃতি জীবনকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, মূল্যবোধের অবক্ষয় এরই ক্রম পরিণাম অনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা চারিত্রিক দীনতা অন্তঃসারশূন্য আরম্ভের প্রাবল্য সেদিনের অবহিত জীবনাচরণেই অনিবার্য পরিণাম আঠার শতকের জীবনচর্যার এই সাধারণভাবে মূল লক্ষণ। মুর্শিদকুলি খাঁ সুরাজ উদ্দিন আলীবর্দী খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌলা এই চারজন সুবেদার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে কর্মদক্ষতা বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানের কুশলী প্রয়োগের সুবিধা যুক্ত হলো মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১৭-১৭২৭) তার বাংলাদেশের সুভেদার হিসেবে থাকার কাল যদিও ১৭০০ সালেই এখানে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য তিনি ঔরঙ্গজেব কর্তৃক প্রেরিত সম্রাটের অধীনস্থ খালসা ধারে পরিণত করা দ্বিতীয়তঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিযুক্ত করা এরাই পরবর্তীকালে জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল।শাসক হিসেবে মুর্শিদকুলি খাঁ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অতিরিক্ত আদায়ের প্রবণতা না থাকলেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তার নির্দয়তার কিছু কম ছিল না।ব্যক্তিজীবনে নিষ্ঠাবান সংযমী ধর্মপরায়ন মুর্শিদকুলি আমলে সাময়িকভাবে হলেও বাংলাদেশে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছিল।

১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হলে অপুত্রক এই সুবেদারের উত্তরাধিকারী হলেন জামাতা সুরাজ উদ্দিন তিনি বাংলা ও বিহারে সুবেদার নিযুক্ত হলেন। মুর্শিদকুলি প্রিয় দৌহিত্র সরফরাজ নামে মাত্র বাংলার দেওয়ান হয়ে রইল।মোটামুটি বিবেচনা সৎ বুদ্ধি কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে সুদক্ষ তার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনার জন্য এবং দিল্লির কোষাগারে রাজস্ব বাবদ প্রভূত অর্থ প্রেরণের জন্য সুরাজ উদ্দিন সুলতানের কাছ থেকে লাভ লাভ করলেন মুতা মন উল মুলক সুজা-উদ-দৌলা আসদ জঙ উপাধি শেষ বয়সে অতিরিক্ত মাত্রায় বিলাসী হয়ে পড়ায় শাসনকার্যে যেমন শিথিলতা দেখা গেল তেমনি পারিবারিক অসন্তোষ স্থানীয় জমিদারদের বিদ্রোহে সুরাজ উদ্দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি রাস পেলো।১৭৩৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার মসনদে বসলেন।প্রশাসনিক বিষয়ে তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু রাজ্য

পরিচালনার উপযুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনার ছিল না নারীর সঙ্গেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন ফলে ওমরা হজের প্রাধান্য প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। দেশের এই বৃষ্টির খলা সুযোগে আলীবর্দী খাঁ এক প্রচণ্ড যুদ্ধে সরফরাজ কে হত্যা করে ১৯৪০ সালে বাংলার মসনদ অধিকার করলেন।উল্লেখযোগ্য সর্পরাজ কে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক ছিলেন এই আলীবর্দী খাঁ।

সন্দেহ নেই আলীবর্দী দক্ষ প্রশাসক ছিলেন কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধ ও বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থাকে তেমনভাবে সুগঠিত করতে সমর্থ হননি নবাব হয়েই তাকে উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনের যেতে হল প্রত্যাবর্তনের পথে খবর পেলেন মারাঠা লুটেরা' বাংলাদেশ আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে।১৭৪২-এ মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত হলেও ১৭৪৪ সালে রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে তারা আবার আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুরু করে। বাংলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ চৌথ দেবার বিনিময়ে মারাঠা পেশোয়ারের সঙ্গে আলিবর্দির সন্ধি হয়,পরিবর্তে বর্গীরা বাংলার পথে আর পা বাড়াবে না প্রায় এক বছর শান্তি বজায় থাকলেও ১৬৪৪-এ ভাস্কর পন্ডিত আবার দলবদল নিয়ে বাংলাদেশের নির্মম অত্যাচার শুরু করলেন।আলীবর্দী এবার ছলনার আশ্রয় নিজের শিবিরে ডেকে এনে তাদের হত্যা করলেন।

এতে মারাঠা উৎপাত বন্ধ হলো ঠিকই কিন্তু রাজকোষ প্রায় শূন্য হল।বিপর্যস্ত আর্থিক কাঠামো কে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মরিয়া হয়ে জমিদার ইংরেজ আর ফরাসি বণিকদের ওপর জোর করতে শুরু করলেন আলীবর্দী। তার আত্মীয় মীরজাফর প্রমূখ আলীবর্দী কে বিনাশের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলো।উড়িয়া ভুবনেশ্বর মন্দির লুট করে হিন্দুর মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছিলেন এর প্রতিশোধ এই মারাঠা দস্যুরা যে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল এমন কথা বলেছেন ভারতচন্দ্র- 'বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।

আশিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম।।

দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।

দেখিয়া নদীর মনে ক্রোধ উপজিল।।

স্বপ্ন দেখি বর্গী রাজা হইল ক্রোধিত।

পাঠাইলো রঘুরাজ ভাস্কর পন্ডিত।।

বর্গী মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।

আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।

গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।

কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুরি।

লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।

পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।

কি কহিবো বাঙ্গালার যে দশা হইল।।'

মুসলমান শাসকদের দ্বারা অপহৃত হিন্দুসমাজ বর্গীর আক্রমণে রাষ্ট্র শক্তি পরিবর্তনের ক্ষীণ আশা পোষণ করলেও বর্গীর অত্যাচারে ক্রমশ তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বিবরণে সমকালের নিগৃহীত বাঙালীর আরতি উচ্চস্বরেই প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে ধর্মপ্রাণ শুদ্ধাচারী উদার মতি শিল্প উৎসাহী আলীবর্দী সাহসী যোদ্ধা ও সেনাপতি ছিলেন। শাসন কাজে বিচক্ষণতা দূরদর্শিতা ও বিদ্রোহ দমনে থেকে মুর্শিদকুলি অপেক্ষা তার কৃতিত্ব বেশি কিন্তু অন্তঃকলহ হিন্দু-মুসলমানে ও প্রীতি ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতে বিপন্ন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আর্থিক দুর্গতি তিনি রোধ করতে পারেননি। তার সবচেয়ে বড় ত্রুটি দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার প্রতি অন্ধ বাৎসল্য। শোকগ্রস্ত রোগ জিনো আলিবর্দীর মৃত্যু হয় ১৭৫৩ সালে, অপদার্থ সিরাজ সিংহাসনে বসেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাসি ঘসেটি বেগম। জ্ঞাতি সৈকতজঙ্গ; সৈন অধ্যক্ষ মীরজাফর তার প্রবলতম শত্রু। প্রতিকুলতাকে সাময়িকভাবে জয় করলেও

সিরাজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক ছিলনা। ঘরে-বাইরে শত্রু তার। আত্মীয় বিরোধের সঙ্গে যুক্ত হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি শত্রুতা। ১৭৫৬ সালে ইংরেজে অধ্যক্ষকে দমন করার জন্য সিরাজ কলকাতা দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করলেন। স্বল্পপরিসর বন্দিশালায় ১২৩ জন শ্বেতাঙ্গের রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু ইতিহাসে কুখ্যাত black holo tragedy নামে পরিচিত, যদিও বিষয়টি নানা বর্ণে রঞ্জিত। এরপর সৈকতজঙ্গকে পর্যুদস্ত করে সিরাজ দিল্লি থেকে নিজের নামে ফর মান লাভ করলেন।পলাতক ও পরাস্ত ইংরেজরা পুনরায় শক্তি সঞ্চার করে স্থল ও জলপথে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। নেতৃত্ব দিলেন ক্লাইভ ও ওয়াটসন। বহু ক্ষয়ক্ষতির পর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কলকাতায় দুর্গ সংস্কার ও টাঁকশাল স্থাপনের উদ্যোগ করল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সন্ধি সিরাজের পতনের পথ মসৃণ করে দিল। কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করেই সম্ভবত সিরাজ সন্ধির পথ বেছে নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ইউরোপের সাত বছরের যুদ্ধ এদেশে ইংরেজ ফরাসি সম্পর্ককে প্রভাবিত করল। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফরাসিদের সহায়তা খুবই প্রয়োজনীয় মনে করে ইংরেজদের চন্দননগর দখলে বাদ সাধলেন সিরাজ। ইংরেজরা এতে প্রমাদ গুনল। নবাব কে মসনদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা নব উদ্যোমে যোগ দিলো নবাবের দুই সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ ধনবান জগৎশেঠ উমিচাঁদ সকলেই এই চক্রান্তের অংশীদার সংকটের মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও উদ্যম হারিয়ে ফেলে ক্ষমতালোভী কুচক্রী বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীদের পরামর্শ গ্রহণ করে ইংরেজ মুর্শিদাবাদের ফরাসিদের ফেরত পাঠাতে রাজি হলেন মীরজাফরকে আবার সেনাপতি পদে ফিরিয়ে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।এই ভাবেই সিরাজ হলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চের ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক। এরপর ২৩ জুন ১৭৫৭ সাল থেকে পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস তা একদিকে যেমন সিরাজের কৃতকর্মের ইতিহাস অন্যদিকে তেমনি মুষ্টিমেয় বাঙালি ও মীরজাফর চরিত্রের কলঙ্কিত নীচ-বৃত্তির ইতিহাস।যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফর তার পুরো বাহিনী নিয়ে রইলেন শুধু নয় ভুল নির্দেশ দিয়ে সিরাজকে বিভ্রান্ত করলেন মীর মদন মোহন প্রাণান্তকর যুদ্ধ অর্থহীন হয়ে গেল।পত্নী ও শিশু কন্যাকে নিয়ে সিরাজ মুর্শিদাবাদ থেকে

পালিয়ে গেলেন। মীরজাফরকে বসানো হলো সিংহাসনে। ৩০শে জুন ছদ্মবেশী সিরাজ ধরা পড়লেন নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করে মৃতদেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে শহর পরিক্রমা করানো হলো শুরু হলো বাঙালি জীবনের এক বিশাল অধ্যায় নবাবরা ইংরেজদের হাতে পুতুলে পরিণত হলো শুধু নয় পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল বাংলায় তথা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের গোড়াপত্তনের জন্য চিহ্নিত হয়ে রইল। সার্বিকভাবেই এর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। In June 1757 we crossed the frontier and entered into a great New world to which strange destiny had lead Bengal"।

এই সময় সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল শোচনীয় ১৭৫২ সালে অতিবৃষ্টি জনিত কারণে ফসল নষ্ট ও দুর্ভিক্ষ ,বর্গী অত্যাচারে ক্রমশ শূন্য রাজকোষাগার , দিল্লি এবং বাংলায় ঘনঘন সিংহাসন বদল- নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব-বিবাদ , অর্থ এবং লোকক্ষয় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি দেশের সমৃদ্ধির আবহকে প্রায় বিনষ্ট করে দিল। আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করার মতো- গ্রাম ছেড়ে চলে আসার প্রবণতা এবং স্বাভবতই আরেকটি নাগরিক সভ্যতার পত্তন যে সভ্যতা অনেকাংশে রুচি ও নীতিবির্গহিত , বিলাসব্যসনপূর্ণ, আরম্ভরপ্রিয়। শৈথিল্য এবং কর্মহীনতায় জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের করাল ছায়া ক্রমশ প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিতে , আর্থিক বিশৃঙ্খলা জন্ম দিচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা সাংস্কৃতিক অবনমনের। ভারতচন্দ্র এই সময়ে কবি যখন বাঙালির জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একদিকে ইংরেজ বণিক ও তাদের চালচলন ও ইচ্ছার দ্বারা অন্যদিকে দরবার বা রাজসভায় বিশেষ রুচি ও চিন্তার দ্বারা। আঠার শতকে বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক স্বার্থের ভিত্তি স্থাপনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অবদান কম ছিল না।বিলাস-ব্যসনে গা-ভাসানো শুরু হয়েছিল মুসলমানী নবাবী আমল থেকেই, এই পর্বে এসে বিষয়টির এক চূড়ান্ত কদর্য রূপ দেখা গেল।

আঠারো শতকে বাংলাদেশের রুচি সাংস্কৃতি বৈদগ্ধ্য ও কৃষ্টির বিশিষ্ট পীঠস্থান হিসেবে কৃষ্ণনগরের রাজসভাকে গণ্য করা চলে।এই জমিদারি দরবারের স্বাতন্ত্র্য যেমন ছিল, তেমনি এর জীবন প্রবাহের চারপাশে নগরকেন্দ্রিক আবহে লালিত ক্ষীয়মান মোগল

দরবারী বিলাস-ব্যসনের কৃত্রিম অনুসরণ এবং গতানুগতিক শাস্ত্রীয় বিচার-বিশ্লেষণের মিথ্যা অহংকার এই রাজসভার পরিবেশকে উন্মুখর করে রেখেছিল।রসাবিষ্ট এই জনমানষের সার্থক প্রতিনিধি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও তাঁর সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাছাড়াও "রামপ্রসাদের শাক্তপদের আত্মেন্দ্রিক ষড়রিপুদমনে কিংবা তাঁর বিদ্যাসুন্দরের নগ্ন রিরংসায়, দ্বিজ ভবানীর রামায়ণের অনাবশ্যক অশ্লীলতায়, জগৎরাম ও রঘুনন্দনের আন্তরিকতাহীন কারুকর্মে এই যুগ-প্রবৃত্তির খন্ডিত প্রকাশ।"

অর্থাৎ এক ধরনের নীতিহীন মূল্যবোধে কলুষিত এবং কৃত্রিম আড়ম্বর-সর্বস্ব সামাজিক প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব হয়েছিল এবং স্বভাবতই যুগের এই প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাজসভার কবি হিসেবে রাজসভার দোষ,গুনও তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যের একদিকে যেমন রাজসভার আভিজাত্য, অন্যদিকে তেমনই রাজসভার উচ্ছৃঙ্খতাও স্পষ্ট।মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত পরিকাঠামো তাই কবির কাছে পর্যাপ্ত ছিলনা, বিদ্যাসুন্দর আখ্যান যোজনার মধ্যেই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি টুকু ধরা পড়ে।

৫.২.৩- অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ এবং প্রাগাধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের রচনাকাল বিষয়ে কবি লিখেছেন:

'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।

সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।'

এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, কাব্যটির রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৬৫২ খ্রীঃ। কবির এ কাব্যটি

তিন খণ্ডে বিভক্ত: প্রথম খণ্ডে 'অন্নদামঙ্গল' দ্বিতীয় খণ্ডে 'কালিকা মঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং

তৃতীয় খণ্ডে ‘মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনী’ স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডের ‘অন্নদামঙ্গল' প্রধানতঃ পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় খণ্ডের’বিদ্যাসুন্দর’ সম্ভবতঃ কোন লৌকিক কাহিনীকে আশ্রয় করে অনেক পূর্বেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। তবে ভারতচন্দ্রের কাব্য কোন অনুবাদ নয়- সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা । তৃতীয় খণ্ডের ‘ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী’ ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রচিত।

গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং এর প্রথম খণ্ড প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’। অপরাপর মঙ্গলকাব্যের মতোই এই খণ্ডের প্রথমেই দেবীর পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে- এতে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, উমা-পার্বতীরূপে পুনর্বার জন্মগ্রহণ, শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, শিবের শ্বশুরগৃহে বাস, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতি অংশ মোটামুটিভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তীর অনুসরণে রচিত হয়েছে। এই অংশে শিবের কাশী প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাস কাহিনী যুক্ত হয়েছে। এরপর শুরু হ'লো নরখণ্ড। প্রথমে হরিহোড়ের কাহিনী-দেবীর কৃপায় হরিহর লক্ষপতি হলেও তার গৃহে পারিবারিক কলহের কারণে দেবী আন্দুলিকা গ্রামের রাম সমাদ্দারের গৃহে উপনীত হলেন। রাম সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুমদার দেবীর কৃপা লাভ করেন, ইনিই মূল গ্রন্থের প্রধান চরিত্র এবং এরই বংশধর কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ‘বিদ্যাসুন্দর'। মূল কাহিনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যশোরপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ এক আকস্মিক বিপর্যয়ের মুখে কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হন। ভবানন্দই প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আবার মানসিংহ ও ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী । ভবানন্দের সহায়তায়

মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করে রাজকীয় খেতাবের জন্য ভবানন্দকে নিয়ে দিল্লী যান। তথায় অবশ্য দেবীর মাহাত্ম্য কিছু কিছু প্রদর্শিত হয়।দিল্লি দরবার থেকে ‘রাজা’ উপাধি নিয়ে ভবানন্দ দেশে ফিরে আসেন।

৫.২.৪- অন্নদামঙ্গলের কবি রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র

বিত্তশালী জমিদার বংশে কবির জন্ম। হাওড়া ও হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়া (পান্ডুয়া)গ্রামই তাঁর জন্মভূমি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-"১৭২০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। কবির প্রথম গ্রন্থ সত্যপীরের পাঁচালির রচনাকাল-১৭৩৭-১৭৩৮। এই কাব্য রচনার সময় কবির বয়স পনেরো।১৭৬০ সালে কবির বয়স হয়েছিল উনচল্লিশ।নাগাষ্টক লেখার সময় ভারতন্দ্রের বয়স চল্লিশ। ধনীঘরের সন্তান হলেও বাল্য বয়স থেকে কবি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে পড়েন।"

ভূস্বামী পিতা রাষ্ট্রীয় সঙ্কটে দরিদ্র হয়ে পড়ায় ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে মঙ্গলঘাট পরগনার অধীন নওয়াপাড়া গ্রামে গিয়ে ব্যাকরণ অভিধান পাঠ করে চোদ্দ-পনের বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় কৃতী হন। অপরিণত বয়সে বিয়ে করেন কবি গুরুজনের সম্মতি না নিয়েই। এইখানেই তিনি মুন্সীর বাড়িতে সত্যপীরের ব্রতকথা লিখে ফারসি ভাষায় কৃতবিদ্য হন। পরে বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হন বর্ধমানরাজসভার। কবির পিতা সময়ে বর্ধমানরাজের খাজনা দিতে না পারায় কবি কারারুদ্ধ হন পিতার অপরাধে । কারাধ্যক্ষের সাহায্যে পালিয়ে যান মারাঠা অধিকৃত উড়িষ্যার কটক নামক স্থানে। মারাঠা সুবেদার শিবভট্রের সাহায্যে এক ভৃত্যসহ কবি নিশ্চিন্তমনে বাস করেছিলেন পুরীধামের শঙ্করাচার্য মঠে। এই পুরীতেই বৈষ্ণব গোস্বামীদের সংস্পর্শে এসে কবি বৈষ্ণব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে 'মুনি গোঁসাই' নামেই পরিচিত হন নীলাচলে। কবি একদল বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবন যাবার পথে হুগলি জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে এসে কীর্তনের আসরে মনোহরশাহী কীর্তন শুনতে বসেন। সেই গ্রামে তাঁর শ্যালীপতি তাঁকে চিনতে পেরে কবিকে আবার গৃহস্থ করলেন।

পরে ভারতচন্দ্র চন্দননগরের ফরাসি গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সুপারিশে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে রাজসভায় স্থান দেন। মাসিক চল্লিশ টাকার বেতনের কবি কৃষ্ণ চন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা শুরু করেন। এই কাব্যের জন্য তিনি কবিকে রায়গুণাকর উপাধি দেন। বিদ্যাসুন্দর ও ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গ বোধ হয় রাজাদেশেই অন্নদামঙ্গলের

অন্তর্ভুক্ত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মূলাজোড় গ্রাম ছশো টাকা রাজস্বের বিনিময়ে ইজারা দিলেন এবং বাড়ি নির্মাণের জন্য কবিকে একশত টাকা দান করলেন। কবি মূলাজোড়েরই স্থায়ী বাসিন্দা তখন, অবশ্য মাঝে মাঝে চলে আসেন কৃষ্ণনগর ও ফরাসডাঙায়। মূলাজোড় গ্রামে এখনও ভারতচন্দ্রের বংশধররা বর্তমান। আটচল্লিশ বছর বয়সে বহুমূত্ররোগে কবি ভারতচন্দ্রের জীবনাবসান হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ।

প্রথম খণ্ড : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে এইভাবে- বাংলা তখন আলিবর্দির (মহাবদ জঙ্গ) শাসনে ছিল। মোগল সেনাবাহিনী ভুবনেশ্বর আক্রমণ করে। মহাদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বর্গির রাজা ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা লুটে অত্যাচারী মুসলমানদের যথোচিত শাস্তি প্রদান করলেন। বাংলাদেশে ভয়াবহ বর্গিদের উৎপাতে শুন্য হয়ে গেল রাজকোষ। অত্যাচারী নবাব কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে দাবি করলেন বার লক্ষ টাকা নজরানা। রাজা এত টাকা দিতে না পারায় আলিবর্দি তাঁকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করে রাখলেন। বিপন্ন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কারাগারে দেবী অন্নদাকে চৌতিশা স্তোত্রে বন্দনা করলে দেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন যে, অন্নদার মূর্তি গড়িয়ে পূজো করলে রাজার বিপদমুক্তি হবে। সেই সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ভারতচন্দ্রকে দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক গান লিখতে আদেশ দিলেন।

প্রথম পর্বে কবি ভারতচন্দ্র কাশীখণ্ড অবলম্বনে সতী ও মহাদেবের বিবাহ, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞনাশ ও দক্ষের ছাগমুণ্ডের পৌরাণিক আখ্যান রচনা করেছেন পুরাণানুসারে।হিমালয়ের গৃহে পার্বতী অথাৎ উমারূপে সতীর পুনর্জন্ম হয়। শিবের অকালে ধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের প্রচেষ্টায় সাফল্য, মহাদেবের ত্রিনয়নে অগ্নিতে মদনভস্ম, রতিবিলাপ ইত্যাদি ঘটনা শাস্ত্র থেকে নেওয়া। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য হয়ত কবি পড়েছিলেন কিন্তু ভারতচন্দ্র কালিদাসের মতো যোগী শিব-চরিত্র অঙ্কন করেননি।

লৌকিক রসানুযায়ী হরপার্বতীর বিবাহ ও কৈলাসে দাম্পত্যজীবন যাপনের কাহিনিও পুরনো মঙ্গলকাব্যের ধাঁচেই রচিত। দরিদ্র শিবের সঙ্গে শিবানীর কলহ, শিবের ভিক্ষায়

গমন, দেবীর মায়ায় ব্যর্থ শিবের গৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা এতে বর্ণিত। মহাদেব দেবী অন্নপুর্ণার কাছে 'সঘৃত পলান্ন' পায়সপয়োধি পিঠে আহার করলেন পঞ্চমুখে। দেবীর মহিমা বৃদ্ধির জন্য শিব কাশী নির্মাণ করে 'চতুর্বগ্রপ্রদা গড়িল অন্নদা অনন্ত নাম মহিমা'। দেবতাদের সুকঠোর তপস্যায় দেবী দুর্গা অন্নপূর্ণরুপে অধিষ্ঠিত হলেন কাশীধামে। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে 'অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে'। যৌবনের কবি ভারতচন্দ্র দেবীর অধিষ্ঠান বর্ণনায় ধবনিঝংকৃত মধুমাসের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

'কলকোকিল অলিকূল বকুল ফুলে।

বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে।।'

সুধন্য চৈত্রমাসে মহাদেব আরাধনা করলেন দেবী অন্নপূর্ণাকে। দেবতারাও অন্নপূর্ণার পুজো প্রচারে উদ্যোগী তাই বরদা অন্নপূর্ণা বরদিলেন যে তাঁর পুজো করলে সবার করতলে থাকবে 'ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম'।

এতে আর দুটি কাহিনি আছে। একটিতে ব্যাসদেবের ব্যাসকাশী নির্মাণে ব্যর্থতা ও অশেষ দুর্গাতি বর্ণিত। এটি পৌরাণিক কাহিনি মার্কন্ডেয় পুরাণের কাশীখণ্ডের অন্তর্গত। দ্বিতীয় কাহিনীতে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ও ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি দেবীর কৃপা বর্ণিত। দ্বিতীয় কাহিনীটি কবিকল্পিত। ভারততন্ত্র দ্বিতীয় কাহিনির খানিকটা কাশীখণ্ড (মার্কন্ডেয় পুরাণ) ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন। দেবীর ব্যাসের প্রতি ছলনা 'কাশীপরিক্রমা' নামে এক অর্বাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাশীখণ্ডে এই বর্ণনা নেই। পরম বৈষ্ণব ব্যাসদেব সাম্প্রদায়িক

ভেদবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে হরিহরের ভেদ করেছিলেন।ব্যাসদেব যখন হরিভক্ত তখন হরনিন্দাকারী। হরির নিকট তর্জিত হয়ে ব্যাসদেব হরিকে ছেড়ে ঘোরতর শিবভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই হাস্যকর ভেদবুদ্ধির জন্য তিনি অশেষ দুর্গাতি লাভ করেছেন শিবের কাছে। শিব ব্যাসদেবের কাশী পরিক্রমা নিষেধ করলে বৃদ্ধ ব্যাস নূতন কাশী নিমাণে প্রবৃত্ত হন। শিবের উপর রেগে ব্যাস আরম্ভ করলেন অন্নপূর্ণার ধ্যান। দেবী জরাতীর

বেশে আবির্ভূতা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাসদেবকে ‘কি হইবে এখানে মরিলে’ বৃদ্ধ ব্যাস বিরক্ত হয়ে বললেন 'গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।' ব্যাসের ভাগ্যদোষে বর শাপে রূপান্তরিত হল- ‘তথাস্ত বলিয়া দেবী হৈলা অন্তর্ধান।’ এইভাবে কাশীমহিমা রক্ষিত হল। ব্যাধের তৈরি কাশী গর্দভ বারাণসী রূপে পরিচিত হয়।

দেবী মর্ত্যে পুজো প্রচার করতে এসে কুবেরের অনুচর বসুন্ধরকে অনুচিত কর্মের জন্য অভিশাপ দিয়ে নরলোকে জন্মগ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। বসুন্ধর মর্ত্যে গিয়ে দরিদ্র বিষ্ণুহোড়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় হরিহোড় তৃতীয় কাহিনিতে ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পূর্বপুরুষ ভবানন্দের কীর্তি বর্ণনা করার জন্যই পুরাতন মঙ্গলকাব্যের আদলে রচনা করলেন এই তৃতীয় কাহিনি।

দরিদ্র হরিহোড় মাতাপিতার ভরণপোষণের জন্য মাঠঘাট ঘুরে ঘুঁটে কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। দেবীর কৃপায় হরিহোডের তুচ্ছ ঘুঁটে সোনার ঘুঁটে হয়ে গেল। দেবীর কৃপায় বড়োলোক হয়ে হরিহোড় দেবীকে দিয়ে এই কথা কবুল করিয়ে নিলেন যে, হরিহোড় নিজে দেবী অন্নপূর্ণাকে চলে যেতে না বললে দেবী তাঁকে ছেড়ে যাবেন না। তাঁর গৃহে দেবী থাকবেন অচলা হয়ে। দেবীর করুণায় হরিহোড় সম্পন্ন কুলীন বংশে বিয়ে করলেন। মর্ত্যে হরিহোড়ের প্রচেষ্টায় দেবীর পুজো শুরু হল। এদিকে দেবী বসুন্ধররূপী হরিহোড়কে স্বর্গে ফেরাতে উৎসুক। বসুন্ধরের স্ত্রী বসুন্ধরাকে দেবী কৌশল করে মর্ত্যে পাঠালেন। মহা ঠক ঝড়ু দত্তের গৃহে জন্ম হল বসুন্ধরার, নাম হল সোহাগী। সোহাগী কলহপটু নারী। ‘বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে’-চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী সোহাগী হরিহোড়ের গৃহে এমন ঝগড়া বাধিয়ে দিল যে বাড়িতে শান্তি রইলো না। দেবীও হরিহোড়ের আবাস ছাড়তে বদ্ধ পরিকর। দেবী ব্যাসকে বৃদ্ধার বেশে ছলনা করেছেন, হরিহোড়ের কন্যার ছদ্মবেশে এসে তিনি বিদায় চাইলেন হরিহোড়ের কাছে। বিরক্ত হরিহোড় ভাবলেন “জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে।’ ক্রোধভরে হরিহোড় ‘যাহ যাহ’ বলে। দেবী সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ঝাঁপি নিয়ে হরিহোড়ের ভবন ত্যাগ করে আন্দুলিয়া গ্রামের ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করার জন্য নামলেন পথে।

কুবেরের পুত্র নলকুবর ও তাঁর দুই পত্নী চন্দ্রিনী ও পদ্মিনী স্বর্গে শাপভ্রষ্ট দেবদেবী। পৃথিবীতে এসে নলকুবরের নাম হল ভবানন্দ। দুই পত্নির নাম চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী। দেবী গাঙ্গিনী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের নিলয় ছেড়ে যাত্রা করলেন পূর্বপারে আন্দুলিয়া গ্রামে। এক সরলপ্রাণ মাঝি-বউ (পাটনী) তাঁকে পার করে দিলে সেও পেল দেবীর কৃপা। দেবী ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় যে কাঠের সেঁউতির ওপর চরণ রেখেছিলেন তা সোনা হয়ে গেল। দেবীর কৃপায় হরিহোড়ের ঘুটে যদি সোনায় পরিণত হয়, তাহলে কাঠের সেঁউতি সোনা হয়ে যাবে এতে আবার আশ্চর্যের কি?

'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী'। ঈশ্বরী পাটনী বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক চরিত্র। সে দেবীর কাছে একটিমাত্র বর চাইল 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।তথাস্তু বলে দেবী অদৃশ্য হলেন। পাটনীর কথা শুনে ভবানন্দ মজুমদার বাড়িতে এসে দেখলেন 'মেঝেয় এক মনোহর ঝাঁপি'। ভবানন্দ বুঝলেন দেবীর কৃপাপ্রাপ্ত তিনি। দেববাণীর সুরে দেবী বললেন-

'এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।

তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে।'

অন্নদামঙ্গলের কাহিনি ও চরিত্রে দেবমাহাত্ম্য নেই। হরগৌরীর বিবাহে শাশুড়ি মেনকা

নারদকে বলছেন-

'ওরে বুড়া আটকুড়া নারদ অলপ্পেয়ে।

হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।।'

বাঙালির ইহমুখিনতা ও দেববিমুখতা এখানে জীবন। অষ্টাদশ শতকের বাঙালি ইহজীবনে আসক্ত তাই দেবতার প্রতি ভক্তি ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত ভারতচন্দ্রের কাব্যে। রঙ্গরহস্য করলেও ভারতচন্দ্র বাকশিল্পে নিপুণ। মধ্যযুগীয় বাগধারা তাঁর চরিত্রের কথায়-

‘আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরির বরলো।

বিয়ায় বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো।।’

মহাদেবের ভিক্ষায় বেরিয়ে মায়ামুগ্ধ জীবকে চৈতন্যদানের জন্য মুগ্ধ। কিন্তু দেশের অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে 'রহাঁচিহাঁ(চ্যাঙড়া)ছেলেরা-

‘ওই এল শিব বুড়া কাপ।

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।

কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।

কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।'

কামদেবকে ভস্ম করেও কামশরাহত মহাদেব-

‘মরিল মদন তবু পঞ্চানন

মোহিত তাহার বাণে।

বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া।

ফিরেন সকল স্থানে।'

কবি অন্নদামঙ্গলে দেবদেবীর নরলীলাই বর্ণনা করেছেন যুগপ্রয়োজনে শিবের সিদ্ধি খাওয়া হচ্ছে না ঠিক সময়ে তাই মহাদেব বলেন-

'এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।

বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই।।

ফাঁপর হৈনু দেখ মুখে উড়ে ফোকো।

ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো।'

যেখানে ভারতচন্দ্র রতির বিলাপ দেখিয়েছেন তখন তা যেন আড়ষ্ট ও কৃত্রিম-

‘পতি শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে

ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।।’

রতি যখন বলছেন বিলাপের সুরে-

‘আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি

হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।।'

তখন করুণরস অপেক্ষা হাস্যরসই প্রবল হয় পাঠকের চিত্তে।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডঃ-

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড ‘বিদ্যাসুন্দর' নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি 'কালিকামঙ্গল'। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' থেকে 'বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি গৃহীত। ভারতচন্দ্রের ঐতিহাসিক ঘটনার একটা পটভূমি আছে এই পর্বে। ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে দেবী অচলা হলে মজুমদার কীভাবে প্রাধান্য লাভ করলেন তার বর্ণনার জন্য তিনি প্রথম খণ্ডের পরেই শ্রতাপ-মানসিংহের যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়েছেন। প্রতাপের পরাভব দেখানো ও ভবানন্দের প্রাধান্যলাভের পরিকল্পনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে আছে ভবানীর কৃপাধন্য রাজা প্রতাপাদিত্য প্রবল শৌর্যশালী। তাঁকে দমন করার জন্য মানসিংহকে বাংলায় পাঠিয়ে দেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। মানসিংহ ‘বাইশী লস্কর' সঙ্গে নিয়ে বর্ধমানে উপনীত হলেন। সেই সময়ে দেবী অন্নদার কৃপায় ভবানন্দও বর্ধমানে গিয়ে মানসিংহের কানুনগো হলেন। সেখানে একদিন মানসিংহ একটি সুড়ঙ্গ দেখিয়ে কৌতূহলবশত ভবানন্দকে সেই: সুড়ঙ্গের বৃতান্ত জানতে চাইলেন, এবং ভবানন্দ তাঁকে বর্ণনা করলেন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি। বর্ধমানরাজ বীরসিংহের পরম রূপসী ও বিদূষী কন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধুর পুত্রের গোপন মিলনই এর প্রধান উপজীব্য। সুন্দর দেবী কালিকার কৃপায় সুড়ঙ্গ খনন করে সুগোপনে

অনুঢা রাজকন্যা বিদ্যার শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়। উভয়ের সেই গোপন মিলন সংক্রান্ত-কাহিনি ভবানন্দ মানসিংহকে শোনালেন নানা ছন্দে। বিদ্যা বর্ধমানরাজ বীরসিংহের

পরম রূপসী ও বিদূষী কন্যা। কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন কিছুটা অবৈধ প্রণয়ে। পরে দুজনের রীতি মেনে বিবাহ দেওয়া হয়। সংস্কৃতে বহুদিন ধরেই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান চলে আসছে। দেবী কালিকার প্রসঙ্গ এ গল্পের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। দেবীর কৃপায় সুন্দর বিদ্যার শয়নঘরে যায়। পরে সে প্রাণদণ্ডের জন্য মশানে আনীত হয়। দেবী কালিকা রাজা বীরসিংহের সৈনসামন্তকে দূর করে মশানে আবির্ভূত হন। তিনি সুন্দরের বন্ধনমোচন করেন। পরে বীরসিংহ সুন্দরকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করতে আর দ্বিধাবোধ করেননি। সুন্দরের আনুকূল্যে রাজা বীরসিংহেরও কালিকামূর্তির দর্শন হয়। পরে সুন্দর সস্ত্রীক দেশে ফিরে ‘নানা মতে কালীরে পূজিল'। কামক্রীড়ায় চপল, হাস্যরসিক, কৌতুক ও ব্যঙ্গে উজ্জ্বল 'বিদ্যাসুন্দরে'র নায়ক-নায়িকারা। হীরা মালিনী বিদ্যার রূপ বর্ণনা করেছে এইভাবে-

‘বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর' শোভায়।

সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।।

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।

পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।।'

বিদ্যাসুন্দরের অপ্রধান চরিত্রগুলো জীবন্ত। হীরামালিনী ও হীরার মা অথবা ধুমকে কোটালের ন্যায় চরিত্র। আধুনিক উপন্যাসে দেখা যায়। বালবিধবা হীরা যদিও সাদাশাড়ি পরে তবুও তার 'চূড়াবান্ধা চুল’, 'গালভরা গুয়া পান’। রসের মালিনী হীরা রাজবাড়িতে ফুল জোগায়। সে অপগতযৌবনা কিন্তু-

‘আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।

এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।।'

সুন্দরকে বাসা দেওয়ার অপরাধে হীরা ধরা পড়েও হার মানেনি-‘ধুতি খেয়ে (অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে) ছেড়ে দিল মালিনী পালায়।’ হীরা ঘুষ খাইয়ে নিস্তার পেল।

বিদ্যার মায়ের চরিত্রও কবির চরিত্রাঙ্কনের মুন্সিয়ানা প্রমাণ করেছে নানা দিক থেকে। বিদ্যার প্রণয়ের কথা শুনে রানী বীরসিংহের শয়নমন্দিরে উপস্থিত হয়ে বললেন-

'বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ

বিয়া হইলে হইত কত ছেলে।

যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা

কথায় রাখিবে কত ঠেলে।।'

রানী দুঃখ করেছেন 'আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল'। এই বাক্যটি কবির অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও বাস্তববোধসঞ্জাত। এই কাব্যে ভারতচন্দ্র নিন্দিত অশ্লীলতাকেও অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসের আবরণে চাপা দিয়েছেন সিদ্ধহস্ত শিল্পীর মতো। সুন্দর ধরা পড়লে নারীরা যেভাবে পতিনিন্দায় মত্ত তার স্থুল দেহরস কবির সুক্ষ ব্যঞ্জনায় ঢাকা পড়ে গেছে। বিদ্যাসুন্দরের মিলন বর্ণনায় অশ্লীলতা থাকলেও তা কুৎসিত হতে পারেনি ভারতচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গির গুণে। বিদ্যা ও সুন্দর যে শাপভ্রষ্ট দেবদেবী, সেকথা আগে কবি বলেননি। কিন্ত মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী শেষের দিকে নামমাত্র শাপের উল্লেখ করেই শেষ হয়েছে কবির 'বিদ্যাসুন্দর' অংশটি।

বিদ্যাসুন্দরে কালিকামঙ্গলের রীতি আছে। কাব্যের কোন কোন স্থানে কালিকার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি উল্লিখিত। হীরার প্ররোচনায় সুন্দর সুড়ঙ্গ খনন করে বিদ্যার ঘরে যাবার জন্য। কালিকার স্তব আরম্ভ করেছেন সুন্দর শ্মশানে বাঁচার তাগিদে মা কালিকে।

'কালিকালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।।'

সুন্দর বলেছে-'পূজা কর কালিকার, রক্ষা হবে সবাকার, ইহপরলোকের মঙ্গল'।এতে কালিকামাহাত্মাই প্রচারিত বলে এ কাহিনিকে কালিকামঙ্গলও বলা যায়।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ড:-

তৃতীয় খণ্ডটি আরম্ভ হয়েছে বাংলায় মোগল অভিযানের পটভূমিকায়। ভবানন্দের গৌরব প্রচার করতে গিয়ে কবি বাস্তব ও ঐতিহাসিকতাবোধ বিস্মৃত। কাব্য ও তথ্যের মিলন এ অংশে পরিপূর্ণ নয়। কবির কাব্য অনুযায়ী মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসে খুব বিপন্ন তখন ভবানন্দ মজুমদার মোগল ও রাজপুতবাহিনীকে তুষ্ট করেন অন্ন দান করে। ইতিহাসে এ ব্যাপারের উল্লেখ নেই। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করতে পারেননি। এই ঘটনার উৎসে আছে নদীয়া রাজবংশের কাহিনি 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম'। মানসিংহ ঠিক করলেন, ভবানন্দর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎকার ঘটাবেন। মানসিংহ ভবানন্দর উপদেশে অন্নপূর্ণার পুজো করে বিপদ থেকে মুক্ত হন। জলপথে যাত্রা করে দুজনে মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণ করেন। লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। অনাহারে মৃত প্রতাপাদিত্যের শবদেহ ঘৃতে ভেজে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেলেন মানসিংহ। ভবানন্দ মানসিংহের সুপারিশে জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে রাজা উপাধি ও জমিদারি লাভ করলেন। অন্নপূর্ণার মহাভক্ত ভবানন্দ এভাবেই হলেন বিজয়ী। পরে জাহাঙ্গীর অবশ্য. এ সব ভবানন্দের ভেল্কিবাজি বলে ধরলেন, তখন ভবানন্দ সংযতভাবে উত্তর দিলেন-

'মজুন্দার কাঁহে জাঁহাপনা সেলামত।

দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত।।

হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্ত যত।

ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত।।'

জাহাঙ্গীর ভবানন্দের অসাম্প্রদায়িক মন্তব্যে খুশি হননি, তিনি কারাগারে পাঠালেন ভবানন্দকে। মুসলমান জাতি ও তাঁদের বাদশাহ হিন্দুর ওপর ভীষণ অত্যাচারে রত তাই ভবানন্দের অন্নপূর্ণা স্তবে মুগ্ধ দেবী বললেন-

'মিছা পড়ে কলমা কোরান।।

যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ

নানা মতে করে অনাচার।।

বামন পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়

পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর ।।'

এরপর দিল্লিতে দারুণ ভূত-প্রেতের উৎপাত শুরু হল। বিবিদের ওপর ভূত ভর করায় রোজা ডাকা হলেও, তার মন্ত্রতন্ত্র তো খাটলই না উপরন্তু ভূতরা- 'ওঝারে কিলায়' চারিদিকের হাহাকারে জাহাঙ্গীরের আকেঁল হল ভালোই। দেবী বাদশাহকে অনুতপ্ত দেখে আকাশে এক দরবার সৃষ্টি করে স্বয়ং বসলেন বাদশাহর সিংহাসনে । অন্যান্য দেবদেবীরাও অন্নপূর্ণাকে ঘিরে আমির -ওমরাও হয়ে আকাশের দরবারে সমাসীন। আকাশপথে এসব দৃশ্য দেখে হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতা কেটে গেল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের। দিল্লি শহরে স্বয়ং বাদশাহর আদেশে সাড়ম্বরে অনপূর্ণা পুজো হল। ভূতপ্রেতের উৎপাত দেখেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের মন্তব্য-

'ভালোমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচ।'

ভবানন্দ দিল্লি থেকে কাশীতে গিয়ে যোড়শোপচারে পুজো করলে দেবী অন্নপূর্ণার। দুই স্ত্রীর সঙ্গে সুখে রাজ্যোপভোগ করে ভবানন্দ দেবীর নির্দেশে গোপালকে রাজপদ দিলেন। নলকুবররূপী ভবানন্দ দেবীর পুজো প্রচারের শেষে দুই স্ত্রীসহ ফিরে গেলেন স্বর্গে।

৫.২.৫- 'নূতনমঙ্গল' আভিধা কতখানি প্রযোজ্য

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশে মঙ্গলকাব্যের যে রূপ ও রসবস্তু প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্রের যুগে সেই কাব্যপ্রথার মূল অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক আদর্শবাহী বৃহৎ কল্পিত আখ্যায়িকার বদলে ছোট ছোট ভাবমুখ্য ভক্তহৃদয়ের আকুতি-প্রকাশক গীতিকবিতার মাধ্যমে দেব মহিমা ব্যক্ত হতে শুরু করেছিল।অতএব ভারতচন্দ্রও

মঙ্গলকাব্যের কেবল বাইরের কাঠামোটি যথাসম্ভব বজায় রেখে তার অন্তঃপ্রকৃতিটিকে যুগের রুচি ও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। পুরোনো প্রথাবদ্ধ মঙ্গলকাব্যের অনেক দায়ই কবিকে বহন করতে হয়েছে, তবু কবি পুরোনো জিনিসকে মার্জনার দ্বারাই এমন রূপরসোজ্জ্বল করে তুলেছেন যে নবপুরাণপাঠের আনন্দে 'অন্নদামঙ্গল' নূতন মঙ্গল অভিধাকে অনেকাংশেই স্বাগত স্বীকৃতি জানায়।

মঙ্গলকাব্যর শেষ যুগের কবি ভারতচন্দ্র, প্রথাবদ্ধতার আবর্তে নিশ্চিহ্ন হতে চাননি তাঁর কবি প্রতিভা বরং সৃষ্টি করতে চেয়েছিল নতুন কিছু। কাব্যমধ্যে সেই আকাঙক্ষারই প্রতিফলন –'নতুন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।।'

ভারতচন্দ্র বেশ কয়েকবার তাঁর কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলে এইভাবে অভিহিত করেছেন উল্লেখযোগ্য, কবিকঙ্কণ মুকন্দরামও তাঁর কাব্যে বলেছেন-

'উমাপদ-হিত-চিত রচিল নৌতন গীত।

চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।'

অনুমান করা যেতে পারে, সেকালে যিনি ভক্তিপুত চিত্তে একটি মঙ্গল পাঁচালী লিখতেন, তিনি মনে করতেন তাঁর কাব্য মঙ্গলকাব্যধারায় একটি 'নুতন' সংযোজন।'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে তাই অনেকে এই নতুনত্বের কথা বলেছেন।লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুষ্টিমেয় কাব্যেই রস-রুপের দিক থেকে কিছু আভিনবত্ব আছে, অন্যথা কাব্যটি কেবল একটি বিশেষণেই সীমাবদ্ধ|তার পূর্বে

প্রচলিত ব্রতকথা ও শিথিল সংবদ্ধ চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী মুকুন্দরামের লেখনীতে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ পুণাঙ্গ আকার পেয়েছিল; তাছাড়া কৰি মানসের প্রজ্ঞাচিহ্নিত বৈশিষ্টে তাঁর 'নৌতন মঙ্গল' রচনার অভিলাষ অনেকাংশেই সার্থক হয়েছিল। আর ভারতচন্দ্রের কাব্য বিষয় এবং বিন্যাস-দু'দিক থেকেই কিছু 'নুতন' বিশেষত্বে চিহ্নিত হতেই পারে। কোনো কোনো সমালোচক বলেন, ইতিপূর্বে দেবী অন্নদাকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়নি বলেই কবি 'নূতন মঙ্গল' কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটিই একমাত্র সত্য নয় বরং

আমরা দেখতে পারি আঙ্গিক এবং রসসৃষ্টির প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য ও শিল্পবোধ মিলে কিভাবে 'নূতন মঙ্গল' রচিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য-রচয়িতারা 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে কাব্যরচনার প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে দেবতার স্বপ্নাদেশের কথা বলেন। ভারতচন্দ্র কিন্তু দৈব-আদেশে কিংবা দেবভক্তিবশত কাব্য রচনা করেননি। বরং স্পষ্টই বলেছেন-

"কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।'

দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা যেটুকু এনেছেন তা' কতকটা প্রথানুসরণ। অন্নপূর্ণা প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্ন দিয়েছেন-

'সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।

মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়।।

তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।

রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।।

তারপর কবিকে স্বপ্নে বলেছেন-

'আরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।

তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী ||

কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।

মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে ।।'

ভারতচন্দ্রের কাছে তিনি মাতারূপে আবির্ভূতা, এজন্য তাঁর স্বপ্নাদেশের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শন কিংবা কাঠিন্য নেই, আছে স্নেহবাৎসল্য আর অসীম মমতা । তিনি উগ্রচন্ডা কোপণস্বভাবা নন, অত্যাচার করে তাঁকে পুজা আদায় করতে হয়নি; দেবী

অন্নদা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষদের নিকট আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিতা বরাভয়দাত্রী শুভঙ্করী জগন্মাতা। তাই মঙ্গলকাব্যের দেবীচরিত্রের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য- কৃপাবর্ষণ এবং অভিশাপ প্রদানের তাৎক্ষণিকতা-

'অনুগ্রহ করিতে বিস্তরক্ষণ নহে।

নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে।।'

তা অন্নদার মধ্যে দেখা যায় না। যদিও হরিহোড়ের গৃহ থেকে ভবানন্দের গৃহে যাত্রার মধ্যে তাঁর অস্থির খেয়ালেরই প্রকাশ। চণ্ডী এবং মনসার প্রচন্ডতা এবং ক্রুরতার তুলনায় অন্নদার অন্নদায়িনী আশ্বাসজনক মূর্তিই ক্ষুধাপীড়িত অন্নহীন বাঙালীর কাছে উজ্জ্বলতর।

বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড এই চারটি বিভাগ মঙ্গলকাব্যের। ভারতচন্দ্র সাধারণভাবে এর অনুসরণ করলেও তাঁর কাব্যে পরস্পর স্বাধীন তিনটি কাহিনী আছে। সেজন্য যেসব মঙ্গলকাব্যে একটি অখণ্ড কাহিনীর মধ্যে দিয়ে আগাগোড়া একটি রসনিবিড় হয়ে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে, এখানে তা হয়নি। কাহিনী তিনটির মধ্যে ভাবগত ঐক্যও কিছু নেই। দুটি কাহিনীর দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণা, অন্যটির দেবী কালিকা, যদিও তাঁর ব্যাপক সক্রিয়তা কাহিনীতে দুর্লক্ষ্য।

পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আমরা ভক্তিরসের যে প্রবাহ দেখেছি 'অন্নদামঙ্গলে' ভক্তির সেই উচ্ছ্বাস নেই, এর জন্য যুগের প্রভাব না কবির ব্যক্তিগত ধর্মবোধ দায়ী সে তর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে মধ্যযুগে মঙ্গলগানে প্রচারিত ধর্মবোধের সঙ্গে সর্বদা কবির আত্মসচেতন মননজাত ধর্মভাবনার ঐক্য ছিল না। এই অন্নদামঙ্গলেই সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত পরিকাঠামোর মধ্যে কবির

আত্মসচেতনতার সম্যক বিকাশ দেখা গেল। কাব্যটি গভীরভাবে ভারতচন্দ্রের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত।সেদিনের আঠারো শতকের বাঙালী জীবনের সর্বাত্মক অবক্ষয়ের যুগে ধর্মাদর্শ ও বিশ্বাসের শিথিল অনুদার ও সংশয়াকুল মুর্তিটি কবি দক্ষ ও ব্যাসের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন-

'সভাজন শুন জামাতার গুণ

বয়সে বাপের বড়।

কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই

সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।।'

অথবা

'অন্যের ভজনে হয় ধর্ম অর্থ কাম।

মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরি নাম।।'

এই আলেখ্যে কবির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রুপের ভঙ্গিটি রয়েছে সত্য, কিন্তু একথাও সত্য যে জাতির মূঢ়তা ও দৃষ্টিহীনতায় কবিচিত্ত একেবারে নিস্পৃহ উদাসীন ছিল না। রামপ্রসাদের মতো কেবল মাতৃনাম স্মরণ করে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিতে পারেননি বটে, কিন্তু দরবারী জীবনের কলুষিত ও পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে কবি সেদিনের সেই ধর্মজীবনের অপ্রেম অবিশ্বাসকে লক্ষ্য করেছিলেন বেদনার সঙ্গে। তাই তাঁর আবেদন ছিল যুক্তি-বুদ্ধি ন্যায়ের কাছে-

'যেই নিরাকার সেই সে সাকার

তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।

তেজ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী

কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে।।'

কিংবা 'তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।

তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর।।

তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।

পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও।।'

বলা বাহুল্য, ভাবপ্রবণ বাঙালীর কাছে এই শাস্ত্রবাণী সেদিন পৌঁছতে পারেনি।। তবে সমকালের বাঙালীর ধরীয় জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত অসঙ্গতি ও অসামগ্রস্যের যুগে কবি ভারতচন্দ্র যে অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মের প্রবর্তনার সুত্রে সেই জীবনের মধ্যে কতকটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সৃষ্টির কথা চিন্তা করেছিলেন তা স্বীকার্য। তিনিই সেদিন সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বললেন-

'হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।

অভেদে যে জন আছে সেই ভক্ত ধীর।।'

দেখালেন অহংকারের মুঢ়তায় কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল পুরাণস্রষ্টা মহাজ্ঞানী ব্যাসদেবের সমস্ত সাধনা, ব্যাসের ভেদবুদ্ধি থকে কবি নিজে যে মুক্ত একথাও ঘোষণা করলেন-

'একই কলেবর হইলা হরিহর

বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।

যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকুপে

ভারতে নাহি এই খেদ।।"

অন্যানা মঙ্গলকাব্যের কবিরা যেখানে বৈচিত্র্যহীন প্রাকৃত জীবনের হাসি-অশ্র-বেদনা-বিবাদের ছবি এঁকেছেন, সে গ্রামপরিবেশ ও লৌকিক জীবনযাত্রা ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি না এড়ালেও তিনি মূলত বর্ধমান ও নদীয়ার রাজা, মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রতাপাদিত্য-জাহাঙ্গীর প্রমুখ সম্রাট ও বিত্তবান প্রতিপত্তিশালী মানুষের কর্মব্যস্ত ঘটনা বহুল ও কলা-ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনকাহিনী পরিবেশনেই বেশি তৎপর।

পদ্মিনীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন যেমন তাঁর সহানুভূতি পেয়েছে আবার বিদ্যা-সুন্দরের কামরসায়ন কাব্যে যুক্ত করে তিনি বাসনাকে জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন। অভিজাত জীবনের সমস্ত অসঙ্গতি তিনি লক্ষ্য করেছেন আর যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরসিকতার সঙ্গে তাকে প্রকাশ করেছেন তা নাগরিক চাতুর্য ও বাগবৈগগ্ধ্য-প্রেরিত।ব্যাজস্তুতি অলংকার এই নাগরিকতারই অনুষঙ্গী। তাঁর কাব্যে মানবিক সমুজ্জ্বল দীপ্তটি নানাভাবেই প্রকাশ

পেয়েছে। এমনকি অন্নদামঙ্গলের কবিই মঙ্গলকাব্যের জগতে এতিহাসিক আবহের প্রবর্তন করেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে পটভূমি হিসেবে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়;মুকুন্দরামেও ব্যক্তিগত ভাগ্য বিপর্যয়ের চালচিত্রে সমসাময়িক ইতিহাসের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্যেই তার কালচেতনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি মঙ্গলকাব্যের, বিষয় হিসেবেই ইতিহাসের মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনী কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত করেছেন। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে ইতিহাসচেতনা অনেক বেশি সংহত, তুলনায় ভারতচন্দ্র কার্যকারণ পরম্পরাকে কিছুটা লঙ্ঘন করেছেন, নিরপেক্ষতা সর্বদা বজায় রাখতে পারেননি; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের পরিধির মধ্য ইতিহাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতচন্দ্র স্বতন্ত্র্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিশ্চিত।

রায়গুণকর ভারতচন্দ্রের শিল্পী-সত্তা সেই মধ্যযুগীয় বাঙালী মানসের নিছক প্রতিলিপি নয় বলেই পৌরাণিক অংশে প্রায়শ তিনি প্রথা ভেঙ্গে গীতিকাব্যের কবিসুলভ ভঙ্গিতে আপন মনের ভাবনার সহজ গীতিময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন-

জয় দেবী জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি

শৈলসুতে করুণানিকরে।

জয় চন্ডবিনাশিনি মুন্ডনিপাতিনি

দুর্গবিঘাতিনী মুখ্যতরে।।'

অথবা-

'পাপেতে জড়িত আমি কাতর হয়েছি অতি

পতিত পাবনী নাম ধর গো।।'

'মা বলিয়া ডাকি ঘন শুনিয়া না দেহ মন

গুহ গজাননে বুঝি ডরগো।।'

কাহিনীর ধারাবাহিকতা বা দেব-দেবীর স্তুতির বাঁধা পথ ত্যাগ করে কবিচিত্ত এখানে সক্রিয় ভাবপ্রকাশে তন্ময়। ভারতচন্দ্রের কবিচৈতন্যের মধ্যেই রয়েছে সেই অনুভব-

'নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভালো নয় তাহা

আমী যা খেলিতে চাই সে খেলা খেলাও হে।।'

এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই তিনি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মতো একান্ত লৌকিক প্রণয়কথার অবতারণা করতে পেরেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের দিব্যবার্তার পরিবর্তে মানবরসের এতখানি আড়ম্বর পূর্ণ ভূমিকা রচনা কবির স্বাধীনতা বলিষ্ঠতা ও আধুনিকতারই স্পষ্ট নিদর্শন। হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রচলিত উপাদানগুলি পরিহার করে ভারতচন্দ্র নতুন পরিবেশ ও নতুন চরিত্র গ্রহণ

করেছেন তাঁর কাব্যে।দেবচরিত্র অবলম্বনেই তিনি হাস্যরস প্রবাহের উৎসমুখ অনর্গলিত করে দিয়েছেন। তবে গঙ্গার সঙ্গে ব্যাসদেবের কলহে শুধু হাস্যরসই নেই, সেকালের তথাকথিত সভ্যসমাজের কৃত্রিম আবরণকে তীব্রভাবে বিদ্ধ করার জন্যই যেন এই অংশের অবতারণা । বিশেষত বরবেশী শিবকে নিয়ে কবি যে হাস্যরসস্রোত বইয়ে দিয়েছেন তাতে অনেকেই স্থূলতার অভিযোগ এনেছেন। তবে বুদ্ধিনির্ভর এই হাস্যরসেই কবির নিজত্ব। নিছকই প্রথানুসরণ নয়, "সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তিই তাঁহার হাস্যরসের মূল।' দাসু বাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীত্তিতে তদানীন্তন বাঙালীর জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন।অথচ ইহাই তাঁহার হাস্যরসের অবলম্বন। তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবের একান্ত অভাব, ভক্তির স্থান গ্রহণ করিয়াছে ব্যঙ্গ ও অবিশ্বাস।"

কাব্যের রূপনির্মিতির মধ্যে নিহিত রয়েছে কবির নিজস্বতা, তিনিই মধ্যযুগের একমাত্র কবি যিনি সচেতনভাবে ঘোষণা করেছেন 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' এই রসসৃষ্টি-সচেতনতার জন্য তিনি যেভাবে ভাষা-ছন্দ-অলংকার বিন্যস্ত করেছেন তাতে ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্যই প্রমাণিত হয়। রাজসভার পরিবেশও সম্ভবত এই মণ্ডনকলার প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের আটপৌরে জীবনের

ভাষা কয়ারের বৈচিত্র্যহিনতা ত্রিপদীর পৌনঃপুনিকতা ও স্পন্দনহীন শব্দের বিপরীতে ভারতচন্দ্রের ভাষাশৈলী লক্ষ্য-বক্তব্যকে সরস করার জন্য যে ধরনের ভাষা তিনি গ্রহণ করেছেন তা" তাঁর কাব্যকে অভিনবত্ব দান করেছে-

'পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।

কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ||

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।

অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।'

এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ঠিক প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে না। দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্মর সংকল্প, মানবের আপ্রাণ প্রতিরোধ, দেবরোষে অশেষ দুঃখভোগের পর দেব প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ-এসব কিছুই ভারতচন্দ্রের কাব্যে নেই। যে চণ্ডীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দিব্যবিভা দেখে কালকেতু-ফুল্লরা চেতনা হারিয়েছিল, এখানে তিনি যেন কুলবধূর আড়ম্বরহীন আটপৌরে শাড়ি-শাখার আড়ালে সেই অপ্রাকৃত জ্যোতিকে আড়াল করেছেন। ঈশ্বরী পাটনী তাঁকে বাঙালীর মধ্যবিত্ত সংসারের কুললক্ষ্মী বলেই চিনেছে। সমস্ত পরিবেশে মানবিকতার সুর লেগেছে- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে',

পাটনীর এই বর-প্রার্থনায় রাজ্য-স্বর্গ বা মোক্ষলাভের পরিবর্তে গৃহকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনের সনাতন আকৃতি ধ্বনিত হয়েছে। নিছকই বর্ণনকৌশল বা শব্দ-ছন্দের পারিপাট্য নয়, জীবনরসের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহই ভারতচন্দ্রের কাব্যকে নবীনত্ব দিয়েছে। তাই বলা যায়, কাব্য সূচনায় দেবী সরস্বতীর কাছে কৃপাপ্রার্থনা করে ভারতচন্দ্র যে বলেছিলেন-

"দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া

পুর্ণ কর নূতন মঙ্গল।।'

এই আকাঙ্ক্ষা যেন তাঁর অনেকাংশেই পূর্ণ হয়েছে।

৫.২.৬- অনুশীলনী

১) অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকা ভারতচন্দ্রের রচনায় কতটা প্রভাব ফেলেছে তা আলোচনা করুন।

২) ভারতচন্দ্রকে 'যুগসন্ধির কবি' বলা কতদূর সংগত- বিচার করুন।

৩) রাজসভার কবি রায়গুণাকর-এর অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মনিমালা মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য' - ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সার্থকতা বিচার করুন।

৪) অন্নদামঙ্গলের কাহিনি কয়টি খন্ডে বিভক্ত ও কি কি? প্রত্যেক খন্ডের পরিচয় দিন।

৫) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কাব্য সৌন্দর্য বর্ণনা করুন।

৬) অন্নদামঙ্গল কাব্যে সমাজ ও ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিন।

৭) 'নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে' - অন্নদামঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে কবির এই উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় করুন।

৮) ভারতচন্দ্র প্রাচীন ধারার শেষ এবং আধুনিক ধারার প্রথম কবি- এই অভিমতের যথার্থ বিচার করুন।

৯) কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে দেব চরিত্র পরিকল্পনায় কোন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন কি?- আলোচনা করুন।

১০) বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্রের হাতেই আধুনিকতার সূত্রপাত- অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে আপনার অভিমত যুক্তি সহযোগে আলোচনা করুন।

৫.২.৭- গ্রন্থপঞ্জি

১. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র- মদনমোহন গোস্বামী

২. কবি ভারতচন্দ্র- শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৩. অন্নদামঙ্গল : কাব্যজিজ্ঞাসা ও মূল্যায়ন- চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব)- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. কবি ভারতচন্দ্র- সনাতন গোস্বামী

৬. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল- নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড- সুকুমার সেন

৯. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৬- বৈষ্ণব পদাবলী: স্থান-কাল-প্রেক্ষিত-বিকাশ ও অবক্ষয়

বিন্যাসক্রম

৬.১- উদ্দেশ্য

৬.২- মধ্যযুগের বৃহত্তর রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক- সামাজিক- সাংস্কৃতিক চালচিত্র

৬.৩- পদাবলীর বিষয়

৬.৪- বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ

৬.৫- প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা

৬.৬- ষোড়শ শতক: বৈষ্ণব সাহিত্যের সুবর্ণযুগ

৬.৭- বিভিন্ন যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা গণ

৬.৮- সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক: পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়

৬.৯- অনুশীলনী

৬.১০- গ্রন্থপঞ্জি

৬.১- উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান-কাল ও প্রেক্ষিতের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরা। সাহিত্যিকেরা বিশেষ দেশকালে আবির্ভূত হন। সর্বজনীন সাহিত্য

দেশকালের ধারণাকে অতিক্রম করে যায় ঠিকই, তবে তা দেশ-কালের চিহ্নকে বুকে ধারণ করেই। তাই সাহিত্যিককে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে গেলে দেশকালের প্রেক্ষিতটিকে বুঝতে হবে।বৈষ্ণব পদাবলী পাঠের জন্য স্থান কাল প্রেক্ষিত কেন জরুরী তার আলোচনা খুবই প্রয়োজন।সময়ের দিক থেকে বাংলায় বৈষ্ণব পদ সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত-

১. চৈতন্য পূর্ব যুগের পদ সাহিত্য

২. চৈতন্য সমসাময়িক পদ সাহিত্য

৩. উত্তর-চৈতন্য যুগের পদ সাহিত্য

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে রচিত সাহিত্যকে চৈতন্য পূর্ব, ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত সাহিত্যকে চৈতন্য সমসাময়িক এবং ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়ে রচিত সাহিত্যকে উত্তর চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য বলে। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময় থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময় ধারায় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও কাব্যাদর্শ,ওই সময় ধারায় আবির্ভূত কবিদের রচনাদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা বর্তমান একক এর উদ্দেশ্য।সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস আলোচিত হবে।

বৈষ্ণব ধর্ম ভিত্তিক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে রচিত পদাবলী হল বৈষ্ণব পদাবলী। এই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেক্ষাপট, উদ্ভব ও বিকাশ, পদাবলীর বিষয়, প্রাক চৈতন্য ও চৈতন্য উত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে তুলনা এবং বৈষ্ণব পদাবলীর অবক্ষয়ের কারণগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

৬.২- মধ্যযুগের বৃহত্তর রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চালচিত্র

১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার সুলতান হন। সিকান্দারের রাজত্বকালে ১৩৫৭-১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন

আজমশাহ বিদ্যোৎসাহী, ন্যায়পরায়ণ ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁর প্রশংসা করেছেন।

১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহ বংশীয় রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন।এই বংশের এক রাজাকে কৌশলে হত্যা করে দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া বংশের জমিদার রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করেন ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পুত্র যদু পিতার মৃত্যুর পর জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপদার্থ পুত্র আহমদ শাহ কিছুকাল রাজত্ব করেন। তারই এক ক্রীতদাসের হাতে তিনি নিহত হন। ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের বংশধর মাহমুদ শাহ বাংলার সুলতানি পদ লাভ করেন। এই বংশের শামসুদ্দিন শাহ বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন।তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কবি মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছেন। শামসুদ্দিন শাহের সঙ্গে রুকন উদ্দিন বরবক শাহ বাংলাদেশ শাসন করেন। শামসুদ্দিন শাহেব পরে রাজত্ব করেন জালালউদ্দিন শাহ। ইনি ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে একজন হাবসী ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। ইলিয়াস শাহী সুলতানের আফ্রিকা থেকে হাবসি ক্রীতদাস এনেছিলেন। মুজাফফর শাহ নাম নিয়ে এদেরই একজন বাংলার সুলতানি পদ পাওয়ার অধিকার করেছিলেন। তাঁর অত্যাচারে রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সৈয়দ হুসায়ন নামে তাঁর এক মন্ত্রী ছিলেন। প্রজারা মুজাফর শাহকে হত্যা করে হুসায়নকে বাংলার সুলতান করে সিংহাসনে বসান (১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে)। তিনি জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সুবুদ্ধি রায়। অবস্থা বিপর্যয়ে তিনি ভৃত্যের কাজ করতে বাধ্য হন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।হুসায়ন শাহের মত উপযুক্ত সুলতান বাংলাদেশে খুব কমই রাজত্ব করেছেন। তার সিংহাসন লাভের কিছু আগে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ)। রূপ সনাতন হুসায়ন বা হুসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসার ওই সময়েই হয়েছিল। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তার বংশধরেরা ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ওই বছর শেরশাহ বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল- বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসাবিজয়' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত 'মহাভারত'।

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মসনদে বসেন। নুসরত শাহ তাঁর পিতার সাম্রাজ্যে সীমানা বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর সময়ে একজোড়া বড় বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন- তিনি কবিশেখর। 'কবিরঞ্জন' ও 'বিদ্যাপতি' ভনিতাতেও তাঁর পদ পাওয়া গেছে।বাবর এর আত্মজীবনী 'বাবরনামা'থেকে জানা যায় সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজাদের মধ্যে নুসরত শাহ ছিলেন অন্যতম।

নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ অল্প দিন রাজত্ব করেন (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। দ্বিজ শ্রীধরের আদেশে রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য।

ফিরোজ শাহ কে হত্যা করে তার কাকা গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে ওই বছরেই। শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। হোসেন শাহী বংশের এখানেই পতন ঘটে।শেরশাহ বাংলা দখল করেই গৌড় ধ্বংস করেন ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লির মসনদে বসেন। তিনি দেশকে অনেকগুলি জায়গীরে ভাগ করেছিলেন। এক একজন জায়গীরদার এগুলির কর্তৃত্ব করতেন। তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল।শেরশাহ দিল্লি থেকে পাঁচ বছর শাসনকার্য চালিয়েছিলেন। তার পুত্র ইসলামসহ আরো আট বছর দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আফগান সর্দার কর নানি বংশোদ্ভূত তাজ খাঁ বাংলার শাসনকর্তা হয়ে বসেন। দিল্লি তখন হুমায়ুনের দখলে।

তাজ খাঁর পুত্র সুলেমান সাত বছর বিচক্ষণতার সঙ্গে বঙ্গদেশ শাসন করেন। তারই সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

সুলেমানের পুত্র দাউদ খাঁ ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলেই বাংলায় মোগল কতৃত্ব স্থাপিত হয় আকবরের সেনাপতি মুনিম খানের দ্বারা। মোগল

আমলে বাংলার প্রথম সুবেদার হন সান-ই-জাহান। এই সময় বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছিল।

১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর বাংলার সুবেদার করে পাঠান রাজা মান সিংহকে। তিনি ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সুশাসনের মাধ্যমে মানসিংহ বাংলায় মোগল শাসনকে সুদৃঢ় করেন। মোগল যুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আগের যুগের তুলনায় অটুট ছিল। অবশ্য মোগল আমলে বাংলার রাজত্ব দিল্লিতে চলে যেত। দেশের শান্তি থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল। উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার যোগ দৃঢ় হয়। বাংলার বাইরের বৈষ্ণব তীর্থ গুলির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর দিল্লির মসনদে বসেন। মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার নিবারণের জন্য জাহাঙ্গীর ইসলাম খানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান। মগ ও পর্তুগিজ দমনের সুবিধার জন্য সুবার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় রাজমহল থেকে ঢাকায়। মানসিংহের আমলে রাজধানী ছিল রাজমহল।জলদস্যুদের দমন করার পর ইসলাম খান পূর্ববঙ্গের বারো ঘর প্রতাপশালী জমিদার অর্থাৎ বারোভূইঞাকে দমন করেন।

জাহাঙ্গীরের পর দিল্লির বাদশাহ হন শাহজাহান। মোগল সাম্রাজ্য তখন উন্নতির চরম শিখরে। শাহজাহানের পর ঔরঙ্গজেব। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার হন।মোগো পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করার জন্য তিনি আরাকান রাজ্যের অধিকার থেকে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ জয় করেন ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে।

ঔরঙ্গজেবের শেষ বয়সে তার পৌত্র আজিমুশশান বাংলার সুবেদার ছিলেন। সেই সময় বাংলার দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান সরকারের দেওয়ানী কার্যবিভাগ ঢাকা থেকে গঙ্গার তীরে মকসুদাবাদে উঠিয়ে নিয়ে যান। কিছুদিন পর সম্রাটের আদেশে আজিমুশশান ঢাকা ছাড়লেন। তখন মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবেদার হলেন। তার নাম অনুসারে মকসুদাবাদের নাম হল মুর্শিদাবাদ। সেখানে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হল। শায়েস্তা খান ও মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারি তে

বাংলাদেশে প্রজার সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলি খানের পরে নবাব সুজাউদ্দিন মোগল সম্রাটের অধীনে সুবা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান সিংহাসনে বসেন। পাটনার নবাব আলীবর্দী খান তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজেই নবাব হয়ে বসেন। সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট থেকেই তিনি মহাবতজঙ্গ খেতাব পান।কিন্তু পরে সম্রাটকে এক পয়সাও রাজস্ব না দিয়ে স্বাধীনভাবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় নবাবী করতে শুরু করেন।১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তার দৌহিত্র মির্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা নাম নিয়ে মসনদে বসেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের সেনাবাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হন।ক্লাইভ মীরজাফরকে সুবা বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ক্লাইভ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজশক্তি হস্তগত করেন।১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ বার্ষিক ২৫লক্ষ টাকা রাজস্ব স্বীকার করে দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের পান। নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পেনশন পেতে শুরু করেন।১৭৭৩খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হয়ে আসেন এবং তখন থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণ :-

মধ্যযুগের আর্থসামাজিক চালচিত্রের আলোচনায় গ্রাম ব্যবস্থার কথা বলতে হবে,যেটি ছিল প্রাচীনতম কাল থেকে চলে আসা একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজ ব্যবস্থা। উৎপাদন পদ্ধতি ছিল গ্রামীণ প্রয়োজনীয় সীমানায় বদ্ধ। কালমার্কস ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল কুটিরশিল্প- হাতে কাটা সুতা, হাতে বোনা কাপড় ও হাতে করা চাষের এমন এক বিশিষ্ট সমন্বয় যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি। ইংরেজির হস্তক্ষেপ সুতা কাটা স্থান করেছে ল্যাঙ্কাশায়ারেএবং তাঁতির স্থান রেখেছে বাংলায়,অথবা হিন্দু সুতা কাটুনি ও তাঁতি উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করে এইসব ছোটো গোষ্ঠীগুলোকে ভেঙে দিয়েছে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এইভাবে যা সংগঠিত করেছে সেটা এশিয়ার এযাবৎ যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে থেকেই গ্রাম নির্ভর অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল। কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধন ছিল। গ্রামীণ শাসনের আওতায় তারা বসবাস করে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগাভাগি নিয়ে গ্রামবাসীরা মাথা ঘামায়নি, গ্রামটি অখন্ড হয়ে থাকলেই হল, কোন শক্তির কাছে তা গেল, কোন সম্রাটের তা করায়ত্ত হল- এ নিয়ে তারা ভাবেনি- গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

কাল মার্কস দেখিয়েছেন সামাজিক সত্তার এই ছোটখাটো বাঁধাধরা রূপগুলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে ইংরেজের বাষ্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের ক্রিয়ায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান্য জমির ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য আগেই বন্ধ হয়ে যায়। তা ছিল আরব বণিকদের করতলগত।ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন ভদ্র ধনী বাঙালির জমিদার সাজার প্রবৃত্তির সঙ্গে আন্তঃবাণিজ্য জন্মাতে শুরু করে। সংসারের প্রয়োজন সামান্যই,সুতরাং শুধু জমির উপর নির্ভর করে জমির মালিকের ও জমির চাষির দিন মোটামুটি মন্দ চলেনি। কিন্তু তাতে সাধারণ ভদ্র বাঙালির সংসার জীবিকার মান পড়ে আসছিল। যাদের জমি নেই বা থাকলেও পরিমাণে যৎসামান্য তাদের আর্থিক অবস্থা সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে হীন হয়ে পড়ল। ভদ্র সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ প্রায় ছিল না। ক্রমে তা স্পষ্ট হতে লাগল।

আকবর-জাহাঙ্গীরের ভূমি ব্যবস্থায় সামন্তবর্গের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবল শক্তি ও প্রতাপ অর্জন করেছিল। গোপাল হালদার মনে করেন যে, এই সময়ের পরে সামন্ত যুগের অবসান ছিল অনিবার্য, ফিরিঙ্গি বণিক সেই পরবর্তী যুগের ঘোষণাপত্র নিয়েই ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লব সাধন করার মতো শক্তি সমাজে তখন আসেনি। দেশীয় বণিক শক্তির মুখপাত্র হয়ে জগৎশেঠেদের মতো অবাঙালি বণিকেরা বিদেশি বণিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি।সামন্ততন্ত্রের মধ্যে পচতে পচতে ভারতীয় সামন্ত সমাজ অসহায় ভাবে বণিক রাজের কাছে আত্মসমর্পণ

করেছিল। দেশ বা জাতি বলতে এখন আমরা যা বুঝি অষ্টাদশ শতকের মানুষ তা বুঝতো না। তখনকার বাংলার মানুষ বুঝত- বাংলাদেশ নবাবের রাজ্য। জনসাধারণ ইজারাদারদের অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিল, বর্গীদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছিল। বাংলাদেশ পরাধীন হল, এই ধরনের বেদনা কেউ সেদিন অনুভব করেনি। তারা শুধু জেনেছিল সিরাজদৌল্লার রাজ্য গেল, কোম্পানি সে রাজ্য লাভ করল।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণ :-

রাজ শক্তি হারিয়ে হিন্দুসমাজ প্রাণপণ প্রয়াসে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিল। হিন্দু উচ্চবর্ণের পণ্ডিতেরা হিন্দু জাতিভেদ ও আচার ধর্মের গন্ডির মধ্যে হিন্দু সমাজকে আরো সংকীর্ণ, অনমনীয় ও রক্ষণশীল করে তুললেন। প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে প্রত্যেক বর্ণের ব্যবধান আরো দুস্তর হয়ে পড়ল। ম্লেচ্ছ সংসর্গ হলেই সমাজ বর্জন করত।এইরকম বজ্র-বন্ধনে সমাজকে না বাধলে সেদিন হিন্দুসমাজ ইসলামের প্লাবনে তলিয়ে যেতে হয়ত।

সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে প্রয়োজন ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত চর্চা পুনরুজ্জীবিত করলেন। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থেকেই নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের তীর্থক্ষেত্র ছিল।এই সাংস্কৃতিক প্রয়োগের অন্য অঙ্গ ছিল বাংলা ভাষায় ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পরিবেশন। অনেকে মনে করেন, শাস্ত্রের শিক্ষা, দীক্ষা, সদাচার ও দেব দ্বিজে ভক্তিসমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত নাহলে নিম্নবর্ণের আচার নিয়মের মধ্যে উচ্চবর্ণেরা সেদিন তলিয়ে যেতেন। তুর্কি আক্রমণের পর থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এই ছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র।

ষোড়শ শতকের দিকে লক্ষ করা যায় মুসলমানরা রাজশক্তি হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার চেষ্টায় বিশেষ বাধা দিচ্ছে না। একই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করে, একই ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান এমনকি উচ্চবর্ণের মুসলমান ও উচ্চবর্ণের হিন্দু যেন একটা 'নেশন' হয়ে উঠেছিল- বাঙালি হয়ে উঠেছিল। তখন বাংলা সাহিত্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির সমবেত

সৃষ্টি। হিন্দু ভাষা ও ভাব অবলম্বন করেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন উদাহরণ হিসেবে এ কথা বলা যেতে পারে।

মুসলমান বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি বা রচনাশৈলীর ছাপ বাংলা সাহিত্যে এসেছে অনেক পরে। আরব-পারস্যের বিষয় বাংলা সাহিত্যে এসেছে মধ্যযুগের শেষ পর্বে। মোগল আমলের সন্ত্রাস গোষ্ঠীর প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান বাঙালি উচ্চবর্গ বাইরের জীবনযাত্রায় একটু একটু করে দরবারি আদব-কায়দা অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালি পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, ধ্যান ধারণায় একটা দরবারী আরম্ভর ও ফারসি পালিশ জমে। ফলে আরবি-ফারসি বিষয়বস্তু বাঙালির আপন হয়ে ওঠে। অবশ্য এই ঐক্য সামাজিক হিসেবে ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ঐক্য, প্রানহীন আড়ম্বর সর্বস্ব বিলাসী এবং নীতিবর্জিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ক্ষয় প্রকট হয়ে উঠল।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবতার বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল। জাতপাতের ভেদ লুপ্ত করতে চৈতন্যের ধর্ম সহায়ক ছিল। এমনকি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একটা ভূমি প্রস্তুত করেছিল এই ধর্ম। অনুরাগমার্গী সমাজ বহির্ভূত সাধকেরা আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে এনে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে মানুষের সত্যধর্মকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। চৈতন্যের মানবধর্মের মধ্যে এর বীজ তারা লক্ষ্য করেছিলেন। আউল-বাউল-দরবেশ-সহজিয়া-কর্তাভজা প্রভৃতি সাধক চৈতন্য সংস্কৃতি উত্তরাধিকারীতা বহন করেছেন।

৬.৩- পদাবলীর বিষয়

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণলীলা ও নবদ্বীপের গৌরাঙ্গলীলা নিয়েই বিপুল বৈষ্ণব পদাবলীর সম্ভারে সমৃদ্ধ বাংলাসাহিত্য। নীলাচলে কৃষ্ণ প্রেমতন্ময় শ্রীচৈতন্যের ভাব ছবি ধরা পড়েছে অনেক পদকর্তাদের পদে।

কৃষ্ণলীলা দুটি বিভাগ-

১. বাল্যলীলা

২. রাধা কৃষ্ণ প্রেমের মধুর লীলা

বাল্যলীলার মধ্যে গোষ্ঠ লীলার পদগুলি উৎকৃষ্ট। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাগণ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের অনুসারী। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা মধুর রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন স্বাভাবিক কারণে। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে নতুন দার্শনিক প্রতিষ্ঠা দিলেন শ্রীচৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর তাঁর বাল্য, কৈশোর, সন্ন্যাস, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি জীবনালেখ্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আলোকে বর্ণিত।

মোটকথা বৈষ্ণব পদাবলীকে রাধা কৃষ্ণের মিলন বিরহের কাহিনী রূপে বিন্যস্ত করাই সাধারণ নিয়ম। বৈষ্ণব পদ সংকলনের সেই কাহিনীপর্যায় অনুসৃত হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ, মিলন, অভিসার প্রভৃতি পালাগুলি আবার নানা উপশ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন- অভিসার। অফিসার অনেক রকম হতে পারে- বর্ষাভিসার, তিমিরাভিসার কুজ্ঝটিকাভিসার প্রভৃতি। দীর্ঘ চারশত বৎসর ধরে বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তনধরা এইরকম বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।কিন্তু পদকারেরা সকলেই গতানুগতিকভাবে কাহিনীর ধারা অনুসরণ করেছিলেন বলে, অধিকাংশ পালায় কাহিনী বিন্যাস এর কোনো বৈচিত্র্য দেখা যায় না।উপরন্তু পদাবলী সাহিত্য মূলত গীতিকবিতা ও সংগীত শাখার অন্তর্ভুক্ত বলে পদকারেরা কোনক্রমে কাহিনীর সূত্র অনুসরণ করে ক্রম রক্ষা করেছেন, কাহিনী গ্রন্থনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। কারণ রাধা কৃষ্ণের কাহিনী বর্ণনা বৈষ্ণব পদের আদৌ লক্ষ্য নয়। কাহিনীর সূত্রে ভাব পুস্পমাল্য গ্রন্থন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই কাহিনীর দিক দিয়ে তাঁরা বিশেষ আকৃষ্ট হন নি।কিন্তু তারা আকৃষ্ট না হলেও এই সমস্ত পদের মধ্য দিয়ে যে প্রচ্ছন্নভাবে কাহিনীর ধারা বহমান তা অস্বীকার করা যায় না।

৬.৪- বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ

বাংলাদেশ দশম- দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এবং ঈষৎ পূর্ব থেকেই পুরানাশ্রয়ী বৈষ্ণবধর্মের কিছু কিছু প্রভাব পড়েছিল। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে একদল ভক্তের আবির্ভাব হয়েছিল। বৈদিক সংহিতা, অরণ্যক, উপনিষদে ঠিক বৈষ্ণব

ভক্তির ততটা প্রকাশ দেখা যায় না,-যদিও বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। উপনিষদে আদিরসাত্মক ভক্তির অল্পস্বল্প ইঙ্গিত আছে, কিন্তু বিষ্ণুকে কেন্দ্রিক আদিরসাত্মক ভক্তিবাদ উত্তর- বৈদিক যুগেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দী লিপি লেখন ও প্রত্নাবশেষে ভগবান বাসুদেবের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণ-বিষ্ণু-বাসুদেব-শ্রীহরিকে কেন্দ্র করে মহাভারতের যুগ থেকেই দুই'রকমের ভাগবত শাখার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। বিষ্ণু-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই এই ভগবত শাখার বিকাশ হয়েছে। মথুরা অঞ্চলেই ভাগবত শাখা প্রাধান্য লাভ করে খ্রিষ্টাব্দ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন যুগে ভাগবত ধর্ম কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এই সময়ে উত্তর-ভারতে 'পঞ্চরাত্র'নামে এক ভগবত শাখার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। শান্ডিল্য ঋষি ও নারদের নামে প্রচারিত 'শান্ডিল্যসূত্র' ও 'ভক্তিসূত্রে' আদিরসাত্মক বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান দার্শনিক ইঙ্গিত পাওয়া গেল। দক্ষিণ-ভারতেও খ্রিস্টীয় শতাব্দী থেকে আলোয়ার ('আর বার') নামে একদল ভক্তের আবির্ভাব হয়েছিল। পরবর্তীকালে তামিল ভাষায় লেখা এঁদের অনেক বৈষ্ণব পদ পাওয়া গেছে। এঁরাও গোপীপ্রেম অবলম্বনে কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।

এদিকে যেমন মহাভারত পুরাণাদিতে বৈষ্ণব ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি বৈষ্ণব পুরাণ ও তত্ত্বদর্শনেও বৈষ্ণব ভক্তির বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষত দ্বৈতবাদী দর্শন থেকেই বৈষ্ণব ভক্তিবাদ দার্শনিক মননের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য ও বল্লভাচার্য এই চারজন দ্বৈতবাদী দার্শনিক বৈষ্ণব ভক্তিকেই দার্শনিক চিন্তনের সুদৃঢ় ভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে লিপিলেখনে কৃষ্ণ-বিষ্ণু-বাসুদেবের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে এ-দেশে রাধাকৃষ্ণ কাহিনী বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয়। পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষে রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত অনেকগুলি নিদর্শন পাওয়া গেছে। পালরাজারা ধর্মমতে মহাযানী বৌদ্ধ হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল। সেনবংশীয় দের মধ্যে বিজয় সেন ও লক্ষণসেন বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুকূল ছিলেন। লক্ষণসেনের সভাতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ

রচিত হয়, তাকে কেন্দ্র করে প্রেমমার্গের বৈষ্ণবধর্ম নতুন ঐতিহ্য লাভ করে। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী বাংলাদেশে ভাগবত প্রচার করেন এবং তারপর থেকেই এ-দেশে ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণলীলা ও ভক্তি-মার্গের বৈষ্ণব আদর্শ জনসমাজে ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। 'রায়মুকুট' উপাধি ধারী বৃহস্পতি এবং প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক বাসুদেব সর্বাভৌম জ্ঞানপন্থা ছেড়ে বৈষ্ণব ভক্তিপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য বাসুদেবের এই পরিবর্তনের মূলে ছিল তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের প্রভাব। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এছাড়াও বিল্বমঙ্গল এর 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', 'ব্রহ্মসংহিতা', বোপদেবের 'মুক্তাফল', বিষ্ণুপুরীর 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী', শ্রীধরস্বামীর ভগবতের টীকা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পন্ডিতসমাজে বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল। এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রাক-চৈতন্যযুগেই বাংলাদেশের জনসমাজে ও বিদ্বোৎগোষ্ঠীতে বৈষ্ণবধর্মের বেশ গভীর রেখাপাত হয়েছিল এবং সেই ধর্মমতের মূলে বিশুদ্ধ ভক্তির দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। তবে প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে তত্ত্বগত মৌলিক পার্থক্য আছে প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্মে ভক্তি স্বীকৃত হলেও তাকে 'বৈধি' ভুক্তি বলা হয়। বিধি-বিধান ও স্বাস্থ্যের গ্রন্থের নির্দেশ যে ভক্তিকে পরিচালিত করে তাকে 'বৈধীভক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। ভক্তিশাস্ত্রের ইতিহাসে বৈধী ভক্তির স্থান খুব উচ্চ নয়। চৈতন্য-প্রভাবে যে বৈষ্ণব ভক্তির উৎপত্তি হল তা 'রাগানুগা' ভক্তি নামে পরিচিত। ভক্তিশাস্ত্রে রাগানুগা ভক্তিই সর্ব শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। যে ভক্তি 'রাগ' বা প্রেমই একমাত্র শরণ্য, পুথিপত্রের বিধি-বিধান তুচ্ছ- তাকেই রাগানুগা ভক্তি বলা হয়েছে । পরবর্তীকালে চৈতন্য প্রভাবে ক্রমে ক্রমে ভক্তির স্থান সংকুচিত হয়ে পড়ল, এবং সাহিত্য ও সমাজে রাগানুগা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করল।রাধাকৃষ্ণলীলা হল এই প্রেম ভক্তির সাধ্য সাধন তত্ত্ব এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সেই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ বলে পূজিত হয়েছেন।

৬.৫- প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য- উত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা

প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা করতে হলে প্রথমেই বাংলায় বৈষ্ণব পদের আবির্ভাব কিভাবে হচ্ছে তা বুঝে নেওয়া দরকার।

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বিষয়বস্তু হল রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে সমাজ বহির্ভূত প্রেম। বাংলার লোক জীবনে রাধা ও কৃষ্ণের গল্প বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিল। বহুকাল থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় শ্লোকের আকারে প্রণয় কবিতা লেখা হয়েছে, যার মধ্যে রাধা কৃষ্ণের নাম আছে। দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশেই পাওয়া গেছে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক দুটি সংকলন গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থে বিবিধ কবিতা লেখা শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের পদ পাওয়া গেছে। কিন্তু এর সঙ্গে সাধারণ মানবিক প্রেম কবিতার কোন পার্থক্য ছিল না। জয়দেব 'গীতগোবিন্দম'কে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের পূর্ণাঙ্গ কাব্য করে তুললেন। যেখানে 'বিলাসকলাকুতূহল'এর সঙ্গে 'হরিস্মরণ'ও ছিল। প্রাকচৈতন্য যুগের বাংলা বৈষ্ণব পদ মূলত জয়দেবকে অনুসরণ করেই লেখা।জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দম্' রচনা করলেও প্রথাগত শ্লোক না লিখে বাংলা রীতির গীতিধর্মী পদ লিখলেন।

প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং পদাবলীর চন্ডীদাসের রচনা।বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাহিনীর পরম্পরা থাকলেও কোন কোন পদ স্বতন্ত্র বৈষ্ণব পদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। রাধার বিলাপ এর আন্তরিকতার সঙ্গে পদাবলীর স্তরের বিশেষ পার্থক্য নেই। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। মূলত প্রেমলীলাকে উপজীব্য করেই এঁদের পদ রচনা। এই কবিদের ব্যক্তিগত ধর্মচেতনা ও কাব্যাদর্শ এক ছিল না। যেমন বিদ্যাপতি ছিলেন পঞ্চ উপাসক। আলাদা করে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না। তাই এঁদের রচিত পদাবলী মানবিক রসে সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিকতার আরোপ এখানে অকারণ। রাধা কৃষ্ণের নাম ভিন্ন অন্য কোন রূপ দেবত্ব এঁদের নেই।এই কাব্য ধারাটি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ও চন্ডীদাসের

সহজ ও শক্তিমান কবিত্ব শক্তির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই পদগুলি চৈতন্যদেব আস্বাদ করে আনন্দ লাভ করতেন।

ভাগবতীয় কৃষ্ণভক্তির ধারায় পদ রচনা চৈতন্যপূর্ব যুগেও আমরা পাই। চৈতন্য প্রভাবে পদাবলী সাহিত্যের জোয়ার এল। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বৈষ্ণব মহাজনরা, ভক্তরা মানবিক প্রেমকে দেখতে পেলেন না। বৈষ্ণব মতে রাধা জীবাত্মা এবং কৃষ্ণ পরমাত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার লীলা হল রাধা কৃষ্ণের প্রেম। রাধাকৃষ্ণের মান- অভিমান, মিলন-বিরহ -সবই বৈষ্ণব কবিদের কাছে হয়ে উঠেছে তত্ত্বকথা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে সব গান বৈকুণ্ঠের গান। চৈতন্য পূর্ব এবং চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের আদর্শগত ভিন্নতা দেখেই পদকর্তা লেখেন -

'গৌরাঙ্গ নহিত কি যদি মনে হইত কেমনে ধরিতাম দে।

রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাতো কে।।'

চৈতন্য পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব মহাজনরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ রচনা করতেন।সেখানে আধ্যাত্বিক রস ভিন্ন অন্য কোনো মানবিক, লৌকিক সাহিত্যিক রস উৎসারিত হওয়ার কথা ভাবেননি পদকর্তা।

চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে পদকর্তা শুধুমাত্র রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই মানব মানবী অথবা দুই দেবচরিত্রকে নিয়ে পদ রচনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীতে নতুন সংযোজন হল গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ। বৈষ্ণব ভক্তদের চোখে মহাপ্রভু হলেন অন্তরে কৃষ্ণ এবং বহিরঙ্গে রাধা। এই মহাপ্রভুর বাল্য, কৈশোর ও ভাবোন্মত্তজীবনের নানা দিককে নিয়ে বৈষ্ণব মহাজনরা পদ রচনা করেছেন, যেগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ নামে খ্যাত।গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি একান্ত চৈতন্যের জীবনে সীমাবদ্ধ। এছাড়াও গৌরচন্দ্রিকা নামে আরেক শ্রেণীর পদের সৃষ্টি হল। যেগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ এর আগে পরিপূরক হিসেবে গাওয়া হত। রাধা কৃষ্ণের প্রেম যেন কিছুতেই শ্রোতারা মানব-মানবীর প্রেম বলে না করে ,সেই কারণেই কীর্তনীয়ারা সচেতনভাবেই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গাইতেন যাকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হত। চৈতন্য পূর্ব যুগের পদাবলী গৌরাঙ্গ প্রভাবে

এভাবেই বদলে গেল।চৈতন্য পূর্ব যুগের পদাবলীর মধ্যে আদিরসের প্রাবল্য কখনো কখনো দেখা দিলেও পরবর্তীকালে চৈতন্যকৃতিতেই সে একেবারে মুছে যায়।

চৈতন্য পরবর্তী যুগের পদকর্তারা বৃন্দাবনের তত্ত্ব সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করতেন। সেই অনুযায়ী তাঁদের পদরচনা। চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাদের সঙ্গে পরবর্তী পদকর্তাদের অমিলও রয়েছে যথেষ্ট। চৈতন্য সমসাময়িকেরা অনেকেই মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলেন। চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করার ফলে এঁদের কবিতায় ভক্তিভাব বেশি। গৌরাঙ্গের মানবরুপও অনেকটাই প্রকাশিত। কিন্তু এঁরা কেউই বৃন্দাবনের তত্ত্ব দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এই সময়ের কবিতা অনেক নিরলঙ্কার এবং ভাষা ব্যবহারও সরল,যা পরবর্তীকালে ছিলনা। বৈষ্ণব রসবাদের প্রভাবে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মধ্যে কতগুলি স্তর বিভাগ আছে। যেমন শান্ত, দাস্য, সাখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। স্বাভাবিকভাবেই এইরকম স্পষ্ট স্তর বিভাগ চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে দেখা যায়নি।

কিন্তু অন্তর্গত শিল্প প্রেরণাতেই হোক আর ধর্ম প্রেরণাতেই হোক চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তারা যে পদাবলী সৃষ্টি করেছেন তাতে জীবনের বৈচিত্র্য ও রোমান্টিকতাই ফুটে উঠেছে যা অসামান্য গভীর জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছে।

৬.৬- ষোড়শ শতক: বৈষ্ণব সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ

পঞ্চদশ শতকের প্রায় শেষ দশকে সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)।এই সময় ভারতীয় ভক্তি ধর্মের তথা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ)। হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে সাধারণভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। বাংলা সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে। আবার সুলতানি আমল তথা পাঠান শাসনকালের অবসানের রাষ্ট্রশক্তি মুঘল সম্রাট আকবর দখল করেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর সুবেদার মানসিংহ সমগ্র গৌড়বঙ্গ মোটামুটি শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সমর্থ হন। বাঙালির জীবনচর্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। বাংলা সাহিত্যের অন্ত মধ্যযুগের বা চৈতন্যত্তোর যুগের প্রকাশ হয়। বস্তুত আদি মধ্যযুগের পর অন্ত্য-মধ্যযুগের প্রথম দুই শতক প্রধানত শ্রীচৈতন্যদেবের

আলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সমাজে 'সুবর্ণযুগ' রূপে পরিচিত হয়ে রয়েছে। বস্তুত সেই কারণে মধ্য-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ বিভাগ বা যুগগণনার ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবকে কালস্তম্ভের মত ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে এইভাবে-

১) আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্য পূর্ব যুগ (আনু. ১৩৫০-১৫০০ খ্রীঃ)।

২) চৈতন্য যুগ (আনুঃ. ১৫০০-১৬০০ খ্রীঃ।

৩) অন্ত্য- মধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ (আনুঃ ১৬০০-১৮০০ খ্রীঃ)।

এই চৈতন্য কেন্দ্রিক যুগ বিভাগের গুরুত্ব অনুভব করলে বোঝা যায়, ধর্মীয়- সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও প্রগতিশীল ভূমিকা সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে; যেমন-

(১) মানবিক সম্পর্কের নবমূল্যায়ন :

শ্রীচৈতন্যদেব শুধু প্রেমের অবতার বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর নন,মধ্যযুগীয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক দীপ্তিমান ব্যক্তিত্ব। তাই রঘুনন্দন শাসিত স্মার্ত পণ্ডিত সমাজ, নবদ্বীপ শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ্য পরিমন্ডল,এমনকি পুরীতে 'পঞ্চশাখা'র উড়িয়া বৈষ্ণবদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভক্তি ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বৃহত্তর বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম তত্ত্ব ও ভক্তিবাদের সৃষ্টি কর্তা এবং সংস্কর্তা হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম, কৃষ্ণ বা বিষ্ণু ভজনা ছিল প্রধানত ঐশ্বর্য ভাব, দেব নির্ভর ও অলৌকিকতা আশ্রিত। কিন্তু এই প্রথম সুস্পষ্টভাবে 'চৈতন্যচরিতামৃত'গ্রন্থে বলা হল -

'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা

নরবপু তাঁহার স্বরূপ।'

ফলে ভক্তির মতাদর্শের সঙ্গে ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণলীলা মিশ্রিত হলেও তাঁর স্বরূপ প্রকাশ ও অভিব্যক্তি মানব সম্পর্কের আঁধারে ধরা দিল বিশেষভাবে। সমগ্র বঙ্গে ও

অন্যত্র বৈষ্ণবের তত্ত্ব এবং উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সখা, পুত্র, পিতা বা প্রভু, প্রেমিক রূপে তাঁর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করলেন।মানবজীবনের মাধ্যমে দিব্য জীবনের এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে ড. সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন- "Bengal Vaishnavasim seeks to realize in its theory and practice, what is is supposed to be the actual action passion of the the deity as a friend, son, father or master but chiefly and essentially as a lover"('Early History of the vaisnava faith and movement in Bengal' Calcutta 1961)। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের মানবিক আচরণ বর্ণনা করেছেন ঐতিহাসিক ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী- "চৈতন্য 'মুখ শিটকান বিকট মূরতি'ছিলেন না।চৈতন্যের ভক্তির উদ্দেশ্য ছিল মানব জীবনকে সমৃদ্ধ এবং অর্থপূর্ণ করে তোলা; জীবনকে অস্বীকার করা তাঁর আদর্শ ছিল না। সংখ্যাতীত ভক্তদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কীর্তনে যোগ দিয়েছেন, নৃত্য করেছেন। যবন হরিদাস কে বুকে জড়িয়ে ধরতে তাঁর বাঁধেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর সামাজিকতা ও রসদ অক্ষুন্ন ছিল। মানুষকে তিনি ভুলে যাননি, সর্বদাই তিনি ঈশ্বর হয়ে থাকেননি"। তাঁর মতে,"আমাদের দেশে চৈতন্যই ছিলেন প্রথম সামাজিক সন্ন্যাসী।"

এই মানবিক সম্পর্কের তথা মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথম সুস্পষ্টভাবে বলা হল- "কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার"। চৈতন্য জীবনীকাররা অনেকেই বলেছেন, "তাঁর আবির্ভাব এর একটি সামাজিক কারণ ছিল।.... হিন্দু সদাচার তান্ত্রিক কৌলাচারের অভিঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। হিন্দু সমাজের নৈতিক বাঁধন যতই দুর্বল হয়ে পড়ে, ততই নব্য স্মৃতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।..... স্মার্ত কর্মকাণ্ড এবং সুলতানের স্বৈরাচারী শাসন একে অপরের পরিপূরক ছিল বলে মনে হয়"('বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম')। বস্তুত, বর্ণভেদের বৈষম্য,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বর্ণ ও জাতি ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা, হিন্দু ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থপরতা এবং ঐহিকতা,নব্য ন্যায় চর্চার শুষ্কতা ইত্যাদির মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ পরিবেশে এক মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়। সেই সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য ক্ষুব্ধ, উন্মত্ত অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের কথা ইঙ্গিতে প্রচার করেন-

"শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।

করাইবো কৃষ্ণ সর্ব নয়নগোচর।।

সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনি আসিয়া।

বুঝাইবো কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লইয়া।।"

আধ্যাত্বিক প্রয়োজন সহ এটাই ছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সামাজিক কারণ। বস্তুত রঘুনন্দন শাসিত বাংলাদেশ যেন অলক্ষ্য ভাবে ভক্তিবাদের ভিত্তিতে এক নতুন সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠা করলেন-

'চন্ডাল চন্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।

বিপ্র নহে বিপ্র যদি অন্য পথে চলে।।"

অথবা

'দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম।

সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ নাম।।"

(২) বৈষ্ণব পদাবলীর রসভাষ্য :

ষোড়শ শতকের পূর্ব থেকে বৈষ্ণব পদ রচনা শুরু হয়েছিল। চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমূখ কবিরা ছিলেন এর সার্থক রূপকার। তবু তা ছিল তত্ত্ব বহির্ভূত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় বৈষ্ণব ধর্মকে তত্ত্ব ও দর্শনের ভিত্তি ভূমিতে স্থাপন করেছিলেন বৃন্দাবনের জ্ঞানী গোস্বামীগণ। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মতবাদের নাম- 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে একইসঙ্গে ভেদ ও অভেদ সম্পর্ক বিদ্যমান। অবশ্য যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্পর্ক সাধারণভাবে অচিন্ত্যনীয়। তাই তত্ত্বটির নাম হয়েছে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। এই তথ্য অনুযায়ী, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণ নিত্য মিলনে আবদ্ধ। সেইজন্য তাঁরা অভেদ প্রাপ্ত। কিন্তু প্রকট লীলায় তাঁরা ভেদ প্রাপ্ত

হয়েছেন। স্বরূপেতে অভেদে যাঁরা আবদ্ধ, বাইরে তাঁরা ভেদে স্বতন্ত্র। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে-

'রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।

দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান।।'

স্বরুপ দামোদরের মতে, রাধা হলেন কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি স্বরূপ, তাঁর হ্লাদিনী শক্তি । এই কারণে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম। কিন্তু লীলার জন্য তাঁরা দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছেন। কলিযুগে তাঁরা আবার এক হয়ে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু'শ্রী চৈতন্য রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন।এইভাবে বৈষ্ণব পদাবলী একদিকে হয়েছে বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য, তত্ত্বকথা রসরূপ লাভ করেছে। অন্যদিকে পদাবলীতে রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব রূপের সঙ্গে গৌরাঙ্গ তত্ত্বরূপকেও কবিরা প্রকাশ করেছেন।

ফলে গৌরচন্দ্রিকা পর্যায় ও অজস্র গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এই যুগে সৃষ্টি হয়েছে আবার রাধাকৃষ্ণের পালা কীর্তন এর পূর্বে তদুচিতভাবে শ্রোতার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য গৌরচন্দ্রিকা গান গাওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয় শ্রীরুপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি নামক রসশাস্ত্রে পঞ্চরস চৌষট্টি প্রকার লীলা রস অষ্টনায়িকা শৃঙ্গার রসের নানা বৈচিত্র্য সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের প্রকারভেদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন চৈতন্যচরিতামৃতে গৌরতত্ত্ব সখীতত্ত্ব বা মঞ্জরীভাবের সাধ্য সাধন অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যক্তিগত রসচেতনা অপেক্ষা সম্প্রদায়গত তত্ত্বচেতনাই পদকর্তা মহাজনদের কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে পদকর্তারা এই তত্ত্বকে পদের মধ্যে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা হয়ে ওঠেন দীক্ষিত এবং 'বৈষ্ণব কবিমহাজন' আখ্যা পান। তারা বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে পদ রচনা করেন। শান্ত রসাশ্রিত প্রার্থনা বিষয়ক পদ, দাস্য রসাশ্রিত ভক্তিমূলক পদ, গোষ্ঠলীলা নির্ভর সখ্য ও বাৎসল্য রস এই যুগেই সৃষ্টি হয়। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলাকে কাব্যের বিষয় করে নতুন ধরনের পদ রচিত হয়। জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বল্লভদাস রায়শেখর বাণীশেখর প্রমুখ পদকর্তারা বাংলা ও ব্রজবুলিতে ছন্দ ও অলংকার এর মন্ডন শিল্পে সাজিয়ে অসংখ্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। পদগুলি হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থেই বৈষ্ণব তত্ত্বের

রসভাষ্য স্বরূপ। বৈষ্ণব পদাবলীর আঙ্গিকগত ও পরিবর্তন সাধিত হয়। উচ্চতম কবিত্বও শিল্পরূপের স্বর্ণপ্রভা এই যুগের সাহিত্য-আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ফলে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি হয়।

(৩) চরিত সাহিত্য সৃষ্টি এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব শাখার উদ্ভব:

শ্রী চৈতন্যদেব কে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য শাখায় এক নতুন শাখা চরিত সাহিত্য সৃষ্টি হয় মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত এবং মানব জীবনের পরিচয় প্রকাশ পায় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এর চৈতন্যমঙ্গল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ।বাংলায় নামকরণ করেছেন কিন্তু সঠিকভাবে পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের অনুচর পরিচয়পর্ব ও গুরু মহারাজের জীবনী রচনা মাধ্যমে এই শাখাটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ।চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরে কিছুকালের জন্য বৈষ্ণব আন্দোলন স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষভাগে নতুন ভাবের জোয়ার আসে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী(শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট) পরিচালনায়। এঁদেরই শিষ্য বা প্রশিষ্য বর্গ হলেন শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তম ঠাকুর শ্যামানন্দ বীরচন্দ্র সীতাদেবী প্রমুখ। এরা খড়দহ শান্তিপুর শ্রীখন্ডে নতুন বৈষ্ণব শাখা গড়ে তোলেন।এইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশ প্রবল শক্তি রূপে দেখা দেয়। এর প্রভাবে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্ব কে অবলম্বন করে এক বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়।

(৪) মঙ্গলকাব্য-অনুবাদ কাব্যের মধ্যে ভাবগত পরিবর্তন

শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব ও প্রেম ধর্মের প্রভাবে বাংলা মহাকাব্য এবং অনুবাদ কাব্য ধারার মধ্যে আঙ্গিক ও ভাবগত দিক থেকে কিছু পরিবর্তন ঘটে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দেব দেবীর বন্দনা অংশে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করা হয়। কবির ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখসহ বংশ পরিচয়, গ্রন্থোৎপত্তি বা কবির আত্মপরিচয়ের সূত্রপাত মোটামুটিভাবে

এই সময়েই হয়।কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের অনতি পূর্বরূপ এবং মুকুন্দরামের অভয়ামঙ্গলে তার সার্থক প্রকাশ চোখে পড়ে।

ভাবগত দিক থেকে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নানা রূপে; যেমন- প্রথমেই চোখে পড়ে বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর সহাবস্থান। তাঁদের মধ্যে শক্তি লাভের প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু বন্দনা অংশে দেখা গেল সমাজে সকলের শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব জীবন-যাপনের মত মনসার কাহিনী বর্ণনায়, চন্ডীর বন্দনা, ধর্মের প্রচার করতে গিয়ে শিবের ধ্যান, দ্বৈতলীলা বর্ণনায় অদ্বৈতের ইঙ্গিত, এমনকি হিন্দু ও ইসলামী কাব্য গুলির মধ্যে আল্লা ও ব্রহ্মের একত্র সহাবস্থান ঘটেছে।

প্রাকচৈতন্য যুগের মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর আচরণ ও স্বভাব ছিল নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ।বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রমুখ কবিদের কাব্যে মনসা মমতাহীনা প্রতিহিংসাময়ী ভয়ংকরী দেবী। চাঁদ সওদাগরও অনমনীয় ও হিংস্র।বিজয় গুপ্তের কাব্যে আছে মনসা ও চন্ডীর কুৎসিত বর্ণনা, মনসার জন্ম কথায় আছে কামাতুর শিবের পরিচয় ইত্যাদি।কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে মানবিক অনুভূতি অহিংস ঔদার্য প্রেমের গৌরব বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে শিল্পগুণ প্রাধান্য পায়। সেই জন্য দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখের মনসামঙ্গল কাব্যে অনুগ্র মানসিকতা সুশালীন আচরণ ত্যাগ ও ক্ষমার মনোভাব চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

(৫) গৌরচন্দ্রিকা পদ এবং ভনিতা অংশের গুরুত্ব লাভ:

মহাপ্রভুর আবেগের মধ্য দিয়ে মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার ভাব রূপকে বোঝবার জন্য রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতাররূপে শ্রীচৈতন্য বোঝাবার জন্য দেখা দেয় বিশেষ বিশেষ পালা কীর্তনের পূর্বে তদুচিৎ শ্রীগৌরচন্দ্র গীতি যেমন রাধার অভিসার বর্ণনার পূর্বে:

'ব্রজ অভিসারিণী

ভাব বিভাসিত

নবদ্বীপ চাঁদ বিভোর'

কিংবা দানী গৌরাঙ্গের বর্ণনা: 'দান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্বিজ মনি' ইত্যাদি। এই গীতি বা কীর্তন এর ফলে কবিতার সঙ্গে সংগীতের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গীতি বা কীর্তনের ফলে (মান্দারিণী, রেনেটি, মনোহরশাহী, গরাণহাটি এই চতুরঙ্গ রীতি) কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লহর, মাতন, মূচ্ছনার আবেগ বা আখরের বিস্তার অনুযায়ী কবিতা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, দেখা দেয় বৈষ্ণব গীতি কবিতার ভাবপ্রকাশের ব্যক্তি-অনুভবে স্বাধীনতার অবকাশ। 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হয়েছে- "আভোগেতে কবি নায়কের নাম হয়।"

কবির নাম গানের সর্বশেষ অংশে অর্থাৎ 'আভোগে' প্রদত্ত হয়। এই অংশটি 'ভনিতা' নামেই প্রসিদ্ধ। কবিদের ব্যক্তিস্বভাবের অভিজ্ঞতা ও উপাদান এখানে গভীরভাবে ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তিস্বভাব ভক্তিযুক্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তত্বাদর্শের অনুগত- 'চলইতে দীগভরম জনি হোয়। গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়।।' আবার ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতি এই ধর্মে মাঝে মাঝে তত্ত্বচেতনার ঊর্ধেব বড় হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই ওই একই পদকর্তা বলতে পেরেছেন- "মম হৃদয়-বৃন্দাবনে কানু ঘুমাওল/প্রেম প্রহরী রহু জাগি।" কবীরের কথাতেও আছে এই ব্যাখ্যা- "এহ তো ঘর হৈ প্রেমকা। যব শোয়ো তব্ দুইজনা যব জাগে তব্ এক॥"

৬) ব্রজবুলির ব্যবহার: পদাবলীর মাধ্যম ব্রজবুলিও এই কালের অন্যতম সৃষ্টি। একথা ঠিক, চৈতন্যদেব ও তাঁকে আশ্রয় করে কেন্দ্রীভূত হয় পদাবলী-সাহিত্য, পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ কথা গড়ে ওঠার আগে উমাপতি উপাধ্যায়, বিদ্যাপতি, যশোরাজ খান হয়ত এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সঙ্কেত দিয়ে গিয়েছিলেন, তবু মহাপ্রভু ও ষড় গোস্বামীর প্রচেষ্টায় নিখিল ভারতীয় প্রাণচেতনার সংযোগের জন্যেই এই ভাষা পদাবলীতে সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল।

৬.৭- বিভিন্ন যুগের বৈষ্ণব পদকর্তাগণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর পদকর্তারা হলেন-

বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, মালাধর বসু, মাধবেন্দ্র পুরী, প্রমুখ।

ষোড়শ শতাব্দী পদকর্তারা হলেন-

নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, শেখর, গোবিন্দ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, বৃন্দাবন দাস, বসন্ত রায়, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, গোবিন্দদাস,মাধবাচার্য প্রমুখ।

সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য পদকর্তারা হলেন-

রামগোপাল দাস, রাঘবেন্দ্র রায়, রাধাবল্লব দাস, যদুনন্দন দিব্যসিংহ প্রমুখ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্তারা হলেন-

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, যাদবেন্দ্র, নসির মামুদ, রাধামোহন,প্রেমদাস, নরহরি চক্রবর্তী, জগদানন্দ শশিশেখর প্রমুখ।

৬.৮- সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক: পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়

অর্থনীতিতে একটি নিয়ম আছে, কোনো বস্তু ব্যক্তি মানুষের সর্বোচ্চ তৃপ্তিসীমাকে স্পর্শ করার পর তার উপযোগিতা ক্রমশ হ্রাস পায়। সাধারণভাবে এই নিয়মটি কোন বিশেষ সাহিত্য-শাখার ব্যক্তি বা সমষ্টি মানুষের রসাবেদন সম্পর্কে হয়ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিশ্বসাহিত্য ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের বলে দেয়, প্রত্যেক সমৃদ্ধ সাহিত্য-শাখা ধারাবাহিক হলেই তার একটি পরিণামী সমাপ্তি আছে। সেই সমাপ্তির বৃত্ত বা পর্ব সম্পূর্ণ হবার আগে থেকেই ধরা যায় তার অন্তঃক্ষয়। দীর্ঘচর্চায় লালিত বিশাল আয়তন বৈষ্ণব পদাবলীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ধর্মের ঘরে আবদ্ধ লা হলেও তত্বের প্রতি অতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য প্রদর্শনে এই যুগে কবি-কল্পনা যেন স্বতঃস্ফূর্ত গতি হারিয়ে ফেলেছিল। ভাব ছিল, কিন্ত ভাবনার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। এমন কি অনেক সময় হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিরও যথাবথ সংযোগ ঘটে নি।

যুগধর্মের সঙ্গে শিল্পসাহিতোর সম্পর্ক সব সময় প্রত্যক্ষ নয়, কখনো কখনো বরং তির্যক । প্রেরণামুখ্য পদাবলী সাহিত্যে সপ্তদশ শতকেও প্রেরণাদাতার অভাব ছিল না। শ্রীনিবাস-নরোত্ম-শ্যামানন্দ-নরহরি সরকার বা বীরচন্দ্র-জাহ্নবা দেবী-সীতাদেবী প্রমুখ

স্মরণীয় এবং বহুমান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন একাধিক ভক্ত কবির ভক্তিভাবনার 'কারয়িত্রী', কিন্তু তাঁদের শিল্পিত-স্বভাব উজ্জীবনের পক্ষে এঁদের পথনির্দেশ কতখানি যথানুপাতী এবং হৃদয়ধার্য ছিল সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে । আমরা লক্ষ্য করি, এই যুগ যতখানি বিভিন্ন গোষ্ঠীবাদী মতবাদের (খড়দহ, শান্তিপুর, শ্রীখন্ড ইত্যাদি সম্প্রদায়) ততখানি, সৃষ্টিস্বাদের নয়। উৎসব-কীর্তন এবং এশ্বর্য-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্ম এই যুগে বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে, বিশেষত বিত্তবান সমাজের সঙ্গলাভে হয়েছিল শক্তিশালী। সেইজন্য নানামুখী সম্প্রদায়ের তরঙ্গে আত্মবৃত্ত শান্ত চিত্তে পদ রচনার মগ্নমুহূর্ত যেন শিল্পী জীবনে আর খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশ্য শান্তিপূর্ণ আবহমন্ডল মাত্রেই যে কাব্যসাধনার অনুকূল অথবা বিপরীতভাবে উত্তেজনা-সংঘাতময় পরিবেশে সাহিত্যচর্চা যে একবারেই অসম্ভব তা হয়ত নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর জাপানী নো-নাট্যগুচ্ছ এবং কাবুকি নাটকগলির বিষয়ের সঙ্গে সমকালীন সময়-পরিবেশের বৈপরীত্য স্মরণীয়। তবু সংঘাত যেখানে কবির আশ্রেয় ধর্মের সঙ্গে জড়িত, সেখানে সেই বিপন্ন ধর্ম থেকে প্রেরণা-সন্ধান রীতিমত কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়ত, ষোড়শ শতকের কবিরা প্রাণপুরুষ শ্রীচেতন্যের মধ্যবর্তিতায় ভক্তি এবং মানবিকতার উষ্ণ আবেগের আবহে কাব্য রচনার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শতকের কবিদের তাঁর তিরোভাবের মহাশন্যতায় সেই ভারসাম্য আর ছিল না। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য যদি হন বৈষ্ণবধর্ম এবং পদাবলীর প্রাণপুরুষ বা মেরুদণ্ড স্বরূপ, তবে তাঁর তিরোভাবে ভাবসর্বস্ব পদাবলী হয়ে পড়েছিল অচৈতন্যপ্রায়।

আঙ্গিক সচেতনতা, পালাকীর্তন এবং পদসঙ্কলন সৃষ্টিঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব কবিরা উৎকর্ষ ও নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায় পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় ম্লান ও শুন্যগর্ভ। তবু একথা ঠিক, মৌলিক চিন্তায় ও কল্পনায় নিঃস্ব হলেও অন্তত আঙ্গিক ও কাব্য প্রকরণ ভাবনায় এই দুই দশকের কবিরা নিরীক্ষাভীরু ছিলেন না। যেমন চন্দ্রশেখর নামে একা কবির শ্রীরাধার অবৈধ প্রেমের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। দীনবন্ধু দাস গোষ্ঠ লীলা বর্ণনায় শৃঙ্গার রস এনে সুবলের ছদ্মবেশে রাধাকে পাঠিয়ে কৃষ্ণের

সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছিলেন। অবশ্য পদাবলীর তত্ত্বগাম্ভীর্য ও শুদ্ধ সৌন্দর্যের বিচারে এ চিত্র হয়ত শোভন ও সার্থক হয়নি।

এই যুগের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হল (১) সঙ্গীতের সঙ্গে পদাবলীর অপরিহার্য সংযোগ সাধন। খেতুড়ীর মহোৎসবে অনুষ্ঠিত মান্দারিণী, গরাণহাটী, রেনেটি, মনোহরশাহী ইত্যাদি চতুরঙ্গ কীর্তন রীতির মাধ্যমে পদাবলী গান পরিবেশিত হয়। (২) পদাবলী কাব্যধারাকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য সঙ্কলন গ্রন্থসমূহ সৃষ্ট হয়, যথা-বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'" রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত' , বৈষ্ণবদাসের ‘পদকল্পতরু’ , ‘পদাবলীসংগ্রহ' ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতকের পদাবলী সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্টই ছিল “পালাকীর্তন' রচনা এবং 'পদসঙ্কলন' গ্রন্থ সৃষ্টি।

প্রতিভার অভাবঃ পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রধান রস পর্যায়গুলি বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ পূর্বজ কবিদের অসামান্য শক্তিতে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্পর্কিত যাবতীয় অনুভূতির প্রকাশ মাধূর্য তাঁদের পদগুলি বাণী এবং রসসিদ্ধিতে প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাছাড়া পদ রচনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় তাঁদের বিশাল সংখ্যাধিক্য (গোবিন্দদাসেরই পদসংখ্যা প্রায় আটশো)। সুতরাং, সচেতন বা অচেতনে কোনোভাবেই সেইসব পদের 'ধার' এবং ‘ভার’ এড়িয়ে মৌলিক চিন্তার উপস্থাপনা এই যুগের পদাবলীকারের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পদকর্তার সংখ্যা এযুগে আদৌ স্বল্প নয়। কিন্তু কাব্যমূল্য বিচারে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অধিকাংশ পদেরই বক্তব্য বলা চলে 'ইত্যাদি' পর্যায়ভুক্ত। তাই কুমুদানন্দ, নরসিংহ দাস (কবিরাজ), শ্যামদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম দাস, যদুনন্দন দাস প্রমুখ অসংখ্য কবি-রচিত পদে অধিকাংশতই যেন শুধু কণ্ঠস্বর আছে, কিন্ত কবি নেই, ব্যক্তি নেই। এর কারণ সম্ভবত, দীর্ঘচর্চার দ্বারা অভ্যস্ত এবং নিয়ম-নির্মিত বিবিধ পালা-বিন্যাসের বিধিবদ্ধতায় গড়া পদাবলী সাহিত্যকে পুনর্নব করে তোলা, অর্থাৎ স্বযংশুদ্ধ সত্তার দ্বারা দ্বিতীয় কোনো 'দিব্যজীবন' থেকে উপাদান আহরণ

করা কবিদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাঁদের তাই গোষ্ঠী আনুগত্যে লক্ষ্য ছিল, মূলতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর বিশাল আয়তন এবং বিশেষ আঙ্গিকটির সম্পূর্ণতা দান।

আলঙ্কারিক কৃত্রিমতাঃ কাব্যধারার বিকাশের মূলে একটি অন্যতম শর্ত-কবি-হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগ বা স্বতঃস্ফূর্তি প্রয়োজন। গভীরতম নিষ্ঠায় সেই আবেগের শিল্পিত রূপদান কাম্য । আশ্চর্যভাবে আমরা লক্ষ্য করি, ধর্মভাব্য হয়েও যোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবিদের ছিল অসাধারণ শিল্পনিষ্ঠা, ধর্মেরও যেন কবিতার হাতে নিজেকে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করা। তাই দেখতে পাই, প্রাচীন সাহিত্য বা অলঙ্কার শাস্ত্রে যা কিছু চিরন্তন, সেই

ঝর্ণাধারা থেকে আপন আপন হৃদয়ের চাহিদা অনুযায়ী কাব্যপাত্রকে ভরে তোলার জন্য জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিরা ছিলেন উৎসুক। কিন্তু বিপরীতভাবে সপ্তদশ শতকে শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাব্য-নাটক অলঙ্কার শাস্ত্রের যেন বড় বেশি বাধ্য অনুকরণ কবিদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন, রূপ গোস্বামীর "তুন্ডে তান্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুন্ডাবলীবদ্ধয়ে" ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে যদুনন্দন লিখেছেন—

"মুখে লৈতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম

আরতি বারয়ে অতিশয়।।'

ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, নিছক ধর্মাচারগত প্রথাপালন এবং চিত্তমুগ্ধ আলঙ্কারিক কৃত্রিমতায় ছিল এযুগের কবিদের পদরচনা। সময়কে সৃষ্টি না করে সময়ের সেবা করার দিকেই যেন তাঁদের ঝোঁক বেশি ছিল। সাহিত্যচর্চায় অনুকরণ নিন্দনীয় নয়, বরং কোনো কোনো সময়ে হয়ত অনিবার্য। কিন্ত পার্থক্য হল "Immature poets imitate poets steal , bad poets deface what they take and good poet make it better or at least something different"(T.S Eliot) শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠপুত্র গীতগোবিন্দকে ঘনশ্যামদাস গোবিন্দ-রতি-মঙ্গলাচরণে "গান্ধর্বীয় কলা-বিন্যাস-রসিকো গান প্রধান স্বয়ং" বলে প্রমাণ করেছেন। ষোড়শ শতকের শেষপাদে

সমষ্টিগত জীবনের ভাবধারার মধ্যে আলঙ্করিক কৃত্রিমতা প্রবেশ করে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের পদাবলীতে তা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

অনুকরণ-আসক্তিঃ সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই পূর্ব কবিদের বাধ্য অনুবাদক, বিশেষতঃ গোবিন্দদাসের। বলরাম দাস তাঁর নায়িকার পূর্বরাগের বর্ণনায় যখন বলেন-'শুনইতে কানহি আনহি শুনত বুঝাইতে বুঝই আন' তখন সচেতন পদাবলী পাঠক অনুভব করতে পারেন গোবিন্দদাসের ভাব-ভাষা-ভঙ্গীর অবিকল অনুকরণ। অভিসারিকা রাধার "আন শুনই কহ আন" পদের সঙ্গে চিত্রসাদৃশ্য। শক্তিশালী কবি দীর্ঘজীবী হলেই অনতি-উত্তর কবিরা হন তাঁর অনুকরণকারী। (স্মরণীয়, রবিন্দ্রানুসারী কবিদের উপর রবীন্দ্র-প্রভাব)। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত গোবিন্দদাসের স্বয়ং উপস্থিতি এবং কাব্য প্রভাব হল সেই কারণ । অর্থাৎ তাদের পক্ষে অনিবার্য ছিল (বিশেষত তিরোভাবের পর) গোবিন্দদাসের অনুকরণ। এঁরা বুঝেও বোঝেননি তাঁর প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে একান্ত নিষ্ঠায় গড়া যে আবেগের চাপ এবং বিশ্বাসের উত্তাপ আছে, প্রাণবন্ত প্রবনতা-তাকে আত্মস্থ করার জন্য অনুকরণ কোনো ধ্রুপদী চেতনার প্রয়োজন, একালের সমালোচকের ভাষায় যাকে ব্যাখ্যা করা যায় 'The name is graven on the workmanship'। সেইজন্য স্বভাবতই দেখা যায় তাদের অনুকরণ অনেকক্ষেত্রে ' Deface what they take'। যেমন গোবিন্দদাসের গোবিন্দ যেখানে খণ্ডিতা রাধার দৃষ্টিতে ধৃষ্ঠ হয়েও বিদগ্ধরাজ, সেখানে তার ভাগ্নে বলরাম দাসের নায়িকার কাছে নাগর-কৃষ্ণের শুধুই মত্ততা দর্শনীয়-

"ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত

আয়ত হই মঝু কান্ত

বলা বাহুল্য, এধরনের অপদৃষ্টি ধর্ম বা কাব্য কোনো কিছুর উন্নতির পক্ষেই শোভন নয়। তাই মনে হয়, এই সময় থেকে বৈধঃব পদাবলীর অবক্ষয় শুরু হয়েছিল।

৬.৯- অনুশীলনী

১) পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী সময়ের রাঢ়বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজ, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরিচয় দিন।

২) বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনার ক্ষেত্রে স্থান-কাল-প্রেক্ষিতের আলোচনা জরুরি কেন?

৩) মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চালচিত্রের পরিচয় দিন।

৪) বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫) বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

৬) প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য- উত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৭) ষোড়শ শতক বৈষ্ণব সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ- ব্যাখ্যা করুন।

৮) বিভিন্ন যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা ও তাঁদের কবি কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয় কাল- আলোচনা করুন।

৬.১০- গ্রন্থপঞ্জি

১. বৈষ্ণব পদাবলী- সুকুমার সেন

২. বৈষ্ণব পদাবলী- হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩. বৈষ্ণব পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র

৪. পাঁচশত বছরের পদাবলী- বিমানবিহারী মজুমদার

৫. বৈষ্ণব পদাবলী- দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণ কথার ক্রমবিকাশ- সত্যবতী গিরি

৭. বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়: নবপর্যায়- নীলরতন সেন

৮. বৈষ্ণব পদাবলী- ড. সত্য গিরি

৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ৭- পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়,বৈষ্ণব কবিকূল ও তাঁদের কৃতিত্ব

বিন্যাসক্রম

৭.১- উদ্দেশ্য

৭.২- বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়

৭.৩- প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রেষ্ঠ কবিকূল

৭.৩.১- চন্ডীদাস ও তাঁর কৃতিত্ব

৭.৩.২- বিদ্যাপতি ও তাঁর কৃতিত্ব

৭.৪- চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী

৭.৫- চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রেষ্ঠ কবিকূল

৭.৫.১- জ্ঞানদাস ও তাঁর কবি কৃতিত্ব

৭.৫.২- গোবিন্দদাস ও তাঁর পদাবলী

৭.৫.৩- বলরাম দাস ও তাঁর কবি কৃতিত্ব

৭.৬- গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলী

৭.৭- অনুশীলনী

৭.৮- গ্রন্থপঞ্জি

৭.১- উদ্দেশ্য

বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী আপামর বাঙালি পাঠকের চিরন্তন ভালোলাগার সামগ্রী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে বাংলার বাইরে, এমনকি ভারতের বাইরেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গোত্রের পাঠকের মনে বিচিত্র রসের আস্বাদ যুগিয়েছিল। বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়ের বৈচিএ্য, ভাবের নতুনত্ব, ভক্তিবাদের প্লাবণ-সব মিলিয়ে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বঙ্গীয় মানসে যে "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত স্বরূপ" বোধের জাগরণ ঘটিয়েছিল তারই সম্পূর্ণ আস্বাদ্যমান রসবস্তু হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব পদাবলী। মহাপ্রভু চৈতন্যের অলোকসামান্য ভাবাদর্শ ও দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রভার "বৈষ্ণব পদাবলী" কে শুধু রোমান্টিক মানবীয় সম্পর্কের মধ্য থেকে মুক্ত করে উচ্চতর বিশেষ এক ধরনের ভক্তিমার্গে, বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন ভজন ও বিশেষ দেশ-কালের স্বরূপ সাধনার শ্রেষ্ঠতর সম্পদ করে তুলেছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ কেন্দ্রিক রসাভাসের পশ্চাতে একটা ভিন্নতর ও উচ্চতর অধ্যাত্মসাধনার ব্যঞ্জনা থাকায় তা যুগপৎ ধর্মীয় মানুষের আদরের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। বিশেষতঃ এর মধ্যে গীতিকবিতার যে সুরটি অনুরণিত হয়েছে তা কবিমানসের সচেতন প্রজ্ঞার ফসল না হলেও পরবর্তীকালের গীতিকবিতার পথ নির্দেশিকা নিশ্চয়ই । সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলী তার ব্যঞ্জনায় গূঢ় অনুভূতি নিয়েই রসিক জনের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আদায় করে নেয়।

৭.২- বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়

পূর্বরাগঃ

পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারেরই অংশ।'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বিপ্রলম্ভ বা বিরহ যে চারপ্রকার তা নির্দেশ করা হয়েছে-পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। মিলনের পূর্বে নায়ক নায়িকার চিত্তে দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি সঞ্জাত অনুরাগী প্রজ্ঞাজন কর্তৃক 'পূর্বরাগ' নামে অভিহিত হয়। পূর্বরাগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।।'

পূর্বরাগ আবার রতিভেদে ত্রিবিধ। যেমন- সাধারণী পূর্বরাগ, সমঞ্জস্য পূর্বরাগ এবং সমর্থা পূর্বরাগ। সমর্থা বা প্রৌঢ়া পূর্বরাগের নায়িকা শ্রীরাধা। তিনি সাধনরূপিনী লীলাশক্তির নায়িকা। কুলধর্ম, গৃহধর্ম, দেহধর্ম সব কিছু ত্যাগ করে শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ।সমর্থারতির অধিকারী পূর্বরাগাশ্রিতা রাধা দশটি দশা প্রাপ্ত হন- লালসা, উদ্বেগ, জুগুপ্সা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য,ব্যাধি, উন্মাদ,মোহ ও মৃত্যু। পূর্বরাগের পদগুলিতে কৃষ্ণ ও রাধা উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণিত হলেও রাধার পুর্বরাগই সমধিক প্রকাশিত।

পূর্বরাগের সঙ্গে অনুরাগের সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। পারস্পরিক প্রেমে পূর্বরাগে মিলনের অন্তরায় আছে।আর উভয়ের মিলনজনিত,প্রেমে সমধিক আকর্ষণ অনুরাগ। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে আছে যে, যে প্রিয়তম হৃদয় পুরে সতত জাগ্রত তাঁকে নবনবায়মান রাগের দ্বারা অনুভবই হল অনুরাগ। নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের আধিক্যই অনুরাগ।

পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ে বহু বৈষ্ণবপদকর্তা অসংখ্য উল্লেখযোগ্য পদরচনা করেছেন। পূর্বরাগ দর্শন ও শ্রবণ ভেদে দ্বিবিধ হলেও দর্শন এবং শ্রবণেও বহু প্রকারভেদ আছে। উভয় পর্যায়ে প্রতিটি স্তরেই নায়িকা রাধার তীব্র অনুরক্তি ও সমর্পণের ভঙ্গিটির চমৎকার ফুটেছে। পূর্বরাগের গভীর ভাব-দ্যোতক ও আর্তিমূলক পদগুলির অধিকাংশই চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের রচনা।তবে নবোদ্ভিন্নযৌবনা পূর্বরাগাতুরা রাধার বর্ণনায় বিদ্যাপতিও অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

আক্ষেপানুরাগঃ

আক্ষেপানুরাগের মূলে থাকে কৃষ্ণের প্রতি রাধার তীব্র অনুরাগ। এই পর্যায়ে রাধা অনুরাগের আধিক্যে উদভ্রান্ত হয়ে অনুপস্থিত প্রিয়কে , নিজেকে ও স্বজনকে ভৎসনা করেন। সর্বত্রই ধ্বনিত হতে থাকে আক্ষেপের সুর। আক্ষেপজনিত বেদনা ও নৈরাশ্যই আক্ষেপানুরাগের বৈশিষ্ট্য।এক

এক কথায় বলা যায়, নায়ক-নায়িকার মিলনের পর গাঢ় অনুরক্তিজনিত যে আক্ষেপ, তাকেই বলে আক্ষেপানুরাগ। 'রসকল্পবল্লী'তে বলা হয়েছে-

'আক্ষেপানুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।

দিগদরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে।।

কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।

দূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে।।'

'গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীল জাতি।

আপনাকে নিন্দে কতু দৈন্য ভাব গতি।।

কন্দর্পেরে মন্দ বলে করিয়া ভৎসনা

বিপক্ষাদির ম্াজিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা।।

বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈবে দোষে।'

প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ-উভয় রসোপর্যায়েই রাধার বেদনা ও নৈরাশ্য আক্ষেপের আকারে প্রকাশিত। উভয়র্যায়েই থাকে গাঢ় ও গূঢ় অনুরাগের দ্যোতনা।তবে প্রেমবৈচিত্র্য কৃষ্ণসন্নিধানে অবস্থিতিকালেই রাধার হৃদয়ে আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবনার জাগরণের প্রকাশ।একে বিরহভ্রান্তিজনিত বেদনার প্রকাশও বলা যেতে পারে। অপরদিকে আক্ষেপানুরাগে অনুপস্থিত নায়কের প্রতি রাধার আক্ষেপ উচ্চারিত হয়। এক বঞ্চনাজনিত শূন্যতার হাহাকারে রাধার হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে বহু বৈষ্ণব পদকর্তাই আক্ষেপানুরাগের পদ রচনা করেছেন। তবে এঁদের মধ্যে চণ্ডীদাসই শ্রেষ্ঠ। তাঁর রাধা প্রিয়সম্বোধনে, দূতীসম্বোধনে , বিধাতা নিন্দনে, সখী-সম্বোধনে,স্বাগতকথনে-প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে আক্ষেপ জানিয়েছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে এত বৈচিত্র্য আর কোনো কবি সৃষ্টি করতে পারেনি।সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র ভাষায় রাধার সেই আক্ষেপবচন

উচ্চারিত হয়েছে। রাধাভাবিত কবি হিসেবে এই পর্যায়ে তিনি-ই সর্বোচ্চ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। এর পিছনে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার প্রক্ষেপ ও অভিঘাত নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল ছিল।অবশ্য আক্ষেপানুরাগে রাধার মনের বেদনা তাঁর কল্পিত আশঙ্কার ফলেই সৃষ্ট হয়েছে। কারণ কৃষ্ণ এখনও তাঁর প্রতি সমান অনুরক্ত। প্রগাঢ় অনুরাগের কারণেই রাধার হৃদয়ে আশঙ্কার উদয় হচ্ছে। চৈতনাচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন-

'প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে।

প্রেমবৈচিত্ত্যহেতু বিরহ করি ভাবে।।'

আক্ষেপানুরাগ প্রেম বৈচিত্ত্যের-ই অংশবিশেষ। একটিতে নায়ক কৃষ্ণ উপস্থিত, আর একটিতে তিনি অনুপস্থিত।

অভিসারঃ

'যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।

সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।।

লজ্জয়া সাঙ্গলীনের নিঃশব্দা খিল মন্ডনা।

কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ।।"

(উজ্জ্বলনীলমণি, রূপগোস্বামী)

'অভিসার' কথাটির অর্থ হলো নায়িকার প্রতি অনুরাগবশতঃ নায়ক এবং নায়কের প্রতি 'অনুরাগবশতঃ নায়িকার নির্দিষ্ট সংকেত স্থানের উদ্দেশ্যে গমন।কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার অভিসারই প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অভিসারিকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,যে নায়িকা নিজে করেন বা নায়ককে অভিসার করান তিনিই 'অভিসারিকা'। 'অভিসারিকা' আবার বেশানুসারে জ্যোৎস্নী ও তামসী- এই দ্বিবিধ হন। তিনি লজ্জায় নিজ অঙ্গে লীন হয়ে, সকল ভূষণকে শব্দহীনা করে অবগুণ্ঠিতা হয়ে একটি মাত্র স্নেহপরায়ণ সখীসহ প্রিয়তমের প্রতি সংকেত কুঞ্জে গমন করেন। দিবাভিসার,

নিশাভিসার, হিমাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, উন্মত্তাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার,তীর্থযাত্রাভিসার, অসমঞ্জসাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, বর্ষাভিসার প্রভৃতি নানাবিধ অভিসারের কথাও বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে বর্ষাভিসারেরই প্রাধান্য।

অভিসারের সঙ্গে বৈষ্ণবের অধ্যাত্মতত্ত্ব জড়িয়ে আছে। এর মাধ বিপদবরণ, দুঃখদহন এবং দুর্জয় সাহসের ভাবটি ওতোপ্রোত ভাবে আছে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে আকুলা রাধা প্রাকৃতিক ও পারিবারিক সব বাধা অতিক্রম করে তাঁর উদ্দেশ্যে গমন করেছেন।অভিসার আসলে ভগবৎ অন্বেষণ। ভগবানের প্রতি ভক্তের গমন বা অভিসার বৈষ্ণব পদাবলীতে পরকীয়ার অভিসাররূপে চিত্রিত হয়েছে।

নিবেদন :

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন-সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম বাঞ্ছিতের পদে শরণাপন্ন হলে তিনিই আমাকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত করবেন।বৈষ্ণব দর্শন এই সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করে নতুনতর জীবনবানী শোণাল।কৃষ্ণ ভক্তিই যেখানে শেষ কথা, সেখানে মোক্ষের কথা আসে কী করে? বৈষ্ণব ধর্মে-শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পঞ্চরসের সাধনার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণলীলা উপভোগ করাই জীব জগতের চরম ও পরম কর্তব্য। এর মধ্য মধুররসের সাধনাই সর্বোৎ কৃষ্ট তার মধ্যে আবার ‘রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি’।ভক্ত বেত্তাদের মতে-সমস্ত জীব জগৎ ছুটে চলেছে অসীমের পথে-সচ্চিদানন্দের উদ্দেশ্যে। অবশ্য পরম বৈষ্ণবের মতে,রাধা কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি।‘রাধাশক্তি কৃষ্ণ শক্তিমান। দুই বস্তুভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ’।। লীলারসে পুষ্টি: জন্যই অদ্বৈত থেকে দ্বৈতের সূচনা। আবার এই দ্বৈত থেকে অদ্বৈতের পথে পরিক্রমণেই আলেক্ষেই সমগ্র বৈষ্ণব কবিতা। পূর্বরাগ থেকে শুরু হয় দয়িতের উদ্দেশ্যে যাত্রা।অভিসারে গিয়ে আকুতির চরম অভিব্যক্তি দর্শিত হয়। নিবেদন পর্যায়ে এসে রাধা সর্বসমর্পণ করে দয়িতের কাছে আশ্রয় কামনা করেন। এই কামনার মধ্যে আছে সর্বসমর্পণের সুখ। রাধা দেখেন বিশ্বভুবনে তিনি একা। কৃষ্ণকে তিনি দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, কিন্তু হারিয়েছেন সমাজে, সংসার,গৃহজন,পরিজন। রাধার শ্রেষ্ট

সম্পদ হচ্ছেন কৃষ্ণ। 'নিবেদন" পর্যায়ে রাধা কৃষ্ণপদে নিজেকে সমর্পণের মধ্যে দিয়ে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। ভক্তকে না হলে ভগবানের চলে না। কারণ একাকী লীলা হয় না। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন-

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হোত যে মিছে।'

এই প্রেমেরই দুরন্ত আকর্ষণে ভগবান ভক্তের কাছে আসেন।নিবেদনের পদগুলিতে রাধার গভীরতম হৃদয়আকূতি প্রকাশ পেয়েছে।

মাথুর :

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। ঘরে ঘরে অমঙ্গল বার্তা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু রাধা তা বিশ্বাস করেন না। কারণ শ্যাম তাঁর হৃদয় মন্দিরে শায়িত। তবু যেতে দিতে হয়। কৃষ্ণ মথুরায় কংস নিধনের জন্য যান। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়- কৃষ্ণ ব্রজপুরীতে আর ফেরেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিরহভারাক্রান্ত রাধার বিরহই বৈষ্ণবপদসাহিত্যে 'মাথুর' নামে অভিহিত।মাথুর আসলে কৃষ্ণের প্রবাস-সুদূর প্রবাস।এই প্রবাস আবার ভাবি, ভবন,ও ভূত- এই ত্রিবিধ। প্রবাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে পূর্বে মিলিত হয়েছে এমন নায়ক-নায়িকার মধ্যে দেশান্তর গমন প্রভৃতি কারণে গড়ে ওঠা ব্যবধানকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা 'প্রবাস' বলে অভিহিত করেন

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রবাসের সংজ্ঞার আছে-

'পূর্ব সঙ্গতয়োর্যুনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।

ব্যবধানস্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে।।'

তবে মনে রাখতে হবে, বিরহ প্রেমেরই অঙ্গ। তা মিলনের আনন্দকে পূর্ণ করে তোলে। মধুর রসই বৈষ্ণব সাহিত্যে চরম আস্বাদ্য। মধুর রসকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভেগ এই দুভাগে ভাগ করা হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারেরই প্রাধান্য। পূর্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চারটি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্গত। বিপ্রলম্ভ শূর্গারের মধ্যে মাথুর-বা

প্রবাস-ই সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য। কারণ বিরহের পদগুলিতে কবিহৃদয়ের আবেগের সঙ্গে ভক্তপ্রাণের আকৃতি যুক্ত হয়ে পদগুলি অনুপম মাধূর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে। বৈষতঞবের দৃষ্টিতে শ্রীরাধা লৌকিক নায়িকা নন, তিনি হ্লাদিনী শক্তি, মহাভাব স্বরূপিণী, শ্রেষ্ঠভক্তের পরম সীমা । কাজেই শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ কৃষ্ণপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট, মুহূর্তে । শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার পক্ষে কতখানি পরম ভক্ত ছিলেন বিরহে-ই তা একমাত্র বোঝা সম্ভব।

৭.৩- প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রেষ্ঠ কবিকূল

৭.৩.১ : চন্ডীদাস ও তাঁর কৃতিত্ব

চণ্ডীদাসের রাধা জন্মযোগিনী ও ভাবতন্ময় চন্ডীদাসের ট্র্যাজিক রস বাঙালি জীবন ভাবনার অনুকূল। এখন পদাবলীর চন্ডীদাস কি প্রাকচৈতন্য যুগের কবি এ নিয়ে জটিলতা আছে।

মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে আসেন তখন বিদ্যাপতির ‘কি কহব রে সখী আর্জুক আনন্দ’ এই পদটি গাওয়া হয়। কীর্তনিয়া মুকুন্দ যে গানটি ধরেছেন সেটি হল এরকম-

‘হায় হায় প্রিয়সখী কিনা হৈল মোরে।

কাহ্নু প্রেমবিষানলে তনু মন জারে।।

রাত্রি দিন পোতে মন সোয়াস্থা না পাঙ।

যাঁহা গেলে কাঞ্চু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ।।'

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত চন্ডীদাস পদাবলীতে এই পদটিকে বড়ু চন্ডীদাসের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীচৈতন্যোত্তর আলঙ্কারিক গ্রন্থ শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর রসক্রমের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য ও কয়েকটি পদে বিদগ্ধমাধবের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। এই সব পদের ভাণিতায় কোনটিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস ও কোনটিতে শুধুমাএ চণ্ডীদাস পাওয়া যায়। এই পদগুলির রচয়িতা নিয়ে মতভেদ আছে। এই পদগুলির পদকর্তা কোন চন্ডীদাস এ নিয়ে সমস্যা জটিল। ‘সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদটির আলোচনা প্রসঙ্গে বিমান বিহারী মজুমদারের মন্তব্য ছিল শ্রীরাধা এখানে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের মতো নাম জপ করছেন।

সেই জন্য তাঁর মতে 'দ্বিজ চন্ডীদাস' ভণিতায় প্রাপ্ত এই পদটি চৈতন্যোত্তর পদকর্তারই রচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান ও প্রকাশভঙ্গি দুই পদাবলীর রীতি অপেক্ষা পৃথক। মহাপ্রভু চৈতন্য যে চন্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেছিলেন তিনি কোন চন্ডীদাস ? চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস এক নয়। চণ্ডীদাস কি নান্নুরের কবি। সহজিয়া বৈষ্ণব সাধক কবি না তিনি বাঁকুড়া জেলার ছাতনার অধিবাসী এটি বিতর্কিত বিষয়। বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় দার্শনিক প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের ফসল। চৈতন্য আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বৈষ্ণবপদাবলীসঞ্জাত রাধাভাবের উত্তব হয়নি। ঘন রজনীতে রাধা যখন অভিসারে যাত্রারত তখনো ‘প্রেমের বীর্যে’ তিনি ‘আশঙ্কিনী'

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা

কেমনে আইলে বাটে।

আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে

দেখিয়া পরাণ ফাটে ।।‘

প্রেমের এ ঐতিহ্য রাধাকৃষ্ণঃ প্রেমবিষয়ক পদের মূল ভাব। যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক চৈতন্য যুগের রচনা কারণ-

(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা লক্ষ্মীর অবতার-বৈষ্ণবীয় দার্শনিক মতানুযায়ী রাধা কৃষ্ণের বৈধীশক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্টা। রাগানুগা প্রেমসাধনায় হ্লাদিনী রূপিনী শ্রীরাধা।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাহীচন্দ্রাবলী' একই নায়িকা। বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধা ও চন্দ্রাবলী আলাদা দুই গোপাহঁনা –পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

(৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীতে ললিতা, বিশাখা রাধার নিত্য সহচরী।

(৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা আলঙ্কারিক ক্রুমানুযায়ী প্রেমে উ্নীতা। চৈতন্যপরবর্তী যুগের রাধা কৃষ্ণে তদ্গতাচিত্ত ও কৃষ্ণে প্রথম থেকেই আত্মনিবেদিতা।

সমস্যা আরও গভীর হল কারণ বৈষ্ণব সমাজের কবিকুলশ্রেষ্ঠ তিনি দানখণ্ড নৌকাখন্ডাদির কবি। সনাতন ও জীবগোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী টীকাগ্রন্থে কাব্যশব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'শ্রীজয়দেব চণ্ডীদাসদর্শিতা দানখণ্ড নৌকাখন্ডাদি প্রকার এর উল্লেখ করেন। অতএব ধারণা হল চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের পদই গ্রহণ করেছেন সাগ্রহে।

ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন লিখলেন ‘চন্ডীদাসকে আমরা এ পর্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি কৃষ্ণকীর্তনে সেই ধারণা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা”।

চণ্ডীদাস একাধিক এ তথা প্রামাণ্য। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু “দীন চন্ডীদাসের পদাবলী" আবিষ্কার করেন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। ভণিতায় দীন, দীনক্ষীণ, চণ্ডীদাস নাম আছে। এঁর পদে চৈতন্য পরবর্তী শাস্ত্রগত প্রভাব লক্ষণীয়। মুসলমানিক শব্দের সঙ্গে কবি বহু পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সপ্তদশ শতকের আগে দীন চন্ডীদাসকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। দীন চণ্ডীদাসের পদের স্বাদ নিকৃষ্ট।

(৫) বীরভূম রামপুর হাট কলেজের অধ্যাপক 'সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম থেকে চন্ডীদাসের পদাবলীর বৃহৎ পুঁথি আবিষ্কার করেন। এটিও দীন চণ্ডীদাসের পদের বিস্তৃত সংস্করণ।

(৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের সম্পাদনায় "চন্ডীদাসের পদাবলী" প্রকাশিত হয়। এই চন্ডীদাস বড়ু, দীন দ্বিজ চণ্ডীদাস নন একান্তভাবেই শুধু চন্ডীদাস। সহজিয়া রসের সাধক চণ্ডীদাসও ইনি নন। ভণিতায় চণ্ডীদাস 'কহে' কথাটি আছে। গোবিন্দদাসের মতো চৈতন্যপরবতী কবিদের সেবাভাব এই চন্তভীদাসেরর ভণিতাংশে নেই।

(৭) চৈতন্যপরবর্তী দ্বিজ চণ্ডীদাস দেহাতীত প্রেমের কবি। চণ্ডীদাসের পদে রাধা কৃষ্ণকলঙ্কের ভয়ে শঙ্কিত আর দ্বিজ চন্ডীদাস চৈতন্যোত্তর কবি বলেই স্বীকৃত কারণ তাঁর পদে রাধা শ্যামকলঙ্কনী হয়েই সার্থক।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের দুটি শ্রেষ্ঠ যুক্তি-

'হায় হায় প্রাণ "সখি কি না হল মোরে

কানু প্রেমবিষানলে তনু মন জারে।'

চৈতন্যচরিতামৃত কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন যে এই পদ শুনে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সাত্ত্বিক ভাববিকার হত। কিন্তু এ পদটি বড়ু চন্ডীদাসের রচনা নয়। বড়ু চন্ডীদাসের সখীরা 'শ্রীকৃষ্ণবীর্তন' কাব্যে হয় রাধার প্রতিদ্বন্দিনী অথবা কুৎসাকারিণী।

দুজন কবি চৈতন্যপর্ব/চৈতন্যোত্তর- প্রথম দুজন যথাক্রমে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়ু চন্ডীদাস এবং পদকর্তা চন্ডীদাস যিনি চৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদটি রচনা করেছিলেন।

চৈতন্যোত্তর দুজন কৰি- প্রথম দুজন যথাক্রমে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চন্ডীদাস এবং পদকর্তা চন্ডীদাস যিনি চৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদের রচয়িতা। চৈতন্যোত্তর দুজন চন্ডীদাসের মধ্যে দীন চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত নীরস ও সাহিত্যগুণে দুর্বল পদাবলীর রচয়িতা হলেও এতিহাসিক দিক দিয়ে প্রামাণিক। দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সংশয়পূর্ণ।

অন্যান্য চণ্ডীদাস- এই চারজন ছাড়াও সহজিয়া ভাবের কবিরা হলেন তরণীরমণ চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জন রচয়িতা চন্ডীদাস তো রয়েইছেন। চন্ডীদাস সম্বন্ধে আরও যেসব তথ্য আছে তাতে রামী বা রামতারা চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী। চণ্ডীদাসের কিংবদন্তীতে রামী-প্রসঙ্গ সহজিয়া সাধনারই দান। (১) শ্রীকৃষ্ণবীর্তনের কবি বড়ুচন্ডীদাস ছিলেন ছাতনার বাসুলী সেবক। (২) দীন চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যপরবর্তী নিতান্ত অর্বাচীন কালের স্বল্প কৃতি কবি। পদসঙ্কলন গ্রন্থে এঁর ভণিতায় পদ নেই। (৩) অতএব আরো একজন চৈতন্যোত্তর কবির কল্পনা করা যার সুললিত প্রথম শ্রেণির পদলহরী চৈতন্যস্বপ্নে বিভোর __ অথবা চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবীয় ভাবনার রসমূর্তি। প্রমাণের - তাই এঁকে দ্বিজ চন্ডীদাস বলাই সঙ্গত

মহাপ্রভুর পদ আস্বাদন- মহাপ্রভু শ্রাকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে শুনেছিলেন বলে মনে হয় না এটাই অধ্যাপক গবেষকদের সিদ্বান্ত। চণ্ডিদাসের লেখা পদাবলীই শ্রীচৈতন্যর লোকোত্তর আস্বাদনের বিষয় এটাই সর্বজনগ্রাহ্য মত।

চন্ডীদাসের পদাবলী

চণ্ডীদাসের পদাবলীর চন্ডীদাসের প্রামাণ্য জীবনী পাওয়া যায় নি। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষভাগে বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে কবির জন্ম। চণ্ডীদাসের ভিটে ও বাশুলীর মন্দির দেখতে এখনও ভক্তরা সেখানে যান।

পদাবলীর চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এখনও রহস্যাবৃত। তবে বীরভূমের নান্নুর গ্রামে তাঁর আবির্ভাবের কথা বহুজনের দ্বারা স্বীকৃত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে যে পদরচয়িতা চণ্ডীদাসকে পাওয়া গেছে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি তারও আগে চতুর্দশ শতকে এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য দর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার একুশখানি প্রাচীন পুঁথি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচটি মুদ্রিত পদাবলী সংকলন করে ১২০টি পদকে নিশ্চিতভাবে শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের রচনা হিসেবে স্থিরনিশ্চয় করেছেন অতএব এই পদগুলিই আলোচ্য।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর মর্মকথাটি হল এরকম-

'আর পাব কোথা

দেবতারে প্রিয় করি , প্রিয়েরে দেবতা'

চণ্ডীদাস সহজতম ভাষায় প্রেমের গভীরতম আনন্দবেদনার স্থপতি। চৈতন্য পূর্ববর্তী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বিস্তৃত কৃষ্ণলীলায় যে পরিশীলিত নাগরিকতার সন্ধান পাওয়া যায় তা চণ্ডীদাসে নেই। চণ্ডীদাস গ্রামের কবি। তাঁর "গোরোচনা গোরী" রাধা বাংলাদেশেরই এক লোকলাঞ্চনায় ভীতা গৃহবধূ। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম অসাধারণ। তাই পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত প্রেমের পবিত্র শুভ্রতা আর বিষন্নতার শ্রোতে চণ্ডীদাসের পদাবলী এক অমর প্রেমের জয়গাথা।

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের রূপদর্শনে বিভোর। কৃষ্ণকে দেখে রাধা মুগ্ধা চকিতা ও চমকিতা। বিদ্যাপতির রাধার বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য- । কৈশোর (বয়ঃসন্ধি), ও নবযৌবনে পূর্বরাগ, অভিসার, মান ও রসোদ্গারের লীলাবিষয়ে দর্শককে প্রতি মুহূর্তে চমকিত করে দেয়। আর চন্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগেই যোগিনী-

'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যাথা।

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারো কথা ॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে

না চলে নয়ানতারা।

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে

যেমত যোগিনী পারা ॥'

রসতন্ময়ে রাধা নাম শুনেই প্রেমাকুল-

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ ॥'

অভিসার - শ্রীরূপগোস্বামীর পর্ববর্তী কালেও এদেশের কাব্যসাধনায় আলঙ্কারিকদের প্রাধান্য ছিল। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতেও বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের প্রভাব যথেষ্ট। জীবনকে অনির্বচনীয় উপলব্ধির মধ্যে দেখেছেন কবি

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা

কেমনে আইলে বাটে ॥

আঙ্গিণার কোনে গাখানি তিতিঞাছে

দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

সই কি আর বলিব তোরে।

কোন পুণ্যফলে সে হেন বন্ধুয়া

আসিয়া মিলল মোরে ॥

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ

বিলম্বে বাহির হৈলুঁ ।

আহা মরি মরি সংকেত করিয়া।।

কত না যন্ত্রণা দিলুঁ ॥'

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই। প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছাস। ইহার মধ্যে শৃঙ্খলাটি কোথায় সে শৃঙ্খলা পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিল তাহা ত সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিল না, তাহা কতখানি। যাহা বলা হইল না, পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ,

উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গভঙ্গ এই উত্থান-পতন কত অল্পকথায়, কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে"।

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ- চণ্ডীদাস বৈষ্ণব রসপর্যায়ে আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ কবি। যে পিরীতিতে "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া", সেই প্রেমবৈচিত্ত্য আক্ষেপানুরাগে এসে রূপান্তরিত হয়েছে বেদনার অন্তলীন সমুদ্রে। রাধার আক্ষেপ বাঁশির প্রাতি, সর্বনাশা পিরীতির প্রতি ও আপনার প্রতি সখীদের ও কৃষ্ণকে ডেকে দূতী সম্বোধনে, স্বগত কথনে গাঢ় অনুরাগ মিশ্রিত আক্ষেপ শুনিয়েছেন। ব্যাকুল প্রকাশনের মাধ্যমে অনুরাগের রঙ গাঢ়তম হয়েছে-

'কি মোহিনী জান বঁধূ কি মোহিনী জান।

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥

.....

বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও ।

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥"

কৃষ্ণকে সামনে রেখে প্রাণত্যাগ করবেন - প্রেমের ক্ষেত্রে এর থেকে আর বড় কি নিগ্রহ রাধা কল্পনা করতে পারেন, আর একটি পদেও আছে-

'তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।

ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই।।'

আর একটি পদে রাধার ইন্দ্রিয়পরবশতার আক্ষেপ আরও তীব্র

'যত নিবারিতে চাই নিবার না যায় রে।

আন পথে যাই পদ কানু পথে ধায় রে।।'

আবার অন্য পদেই চণ্ডীদাস রাধার মাধ্যমে পিরীতির প্রতি আক্ষেপ জানিয়েছেন তাঁর অনবদ্য কাব্য ভাষায় রাধা বলছেন – 'সই, কে বলে পিরীতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া

কাঁদিতে জনম গেল।।'

খণ্ডিতা রাধা - খণ্ডিতা রাধার চিত্র চন্ডীদাস এঁকেছেন, তিরস্কারের অগ্নি সেখানে অভিমানের অশ্রুতে নির্মল।সখীকে জানাচ্ছেন দুঃখ-কথা-

'সই কেমনে ধরিব হিয়া।

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়

আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥'

যে অপরাধিনী শ্যামকে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে তার প্রতি রাধার চরম অভিশাপ-উক্তি হল-

"যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া

এমতি করিল কে।

আমার পরাণ যেমতি করিছে

তেমতি হউক সে॥'

রসোদগার- চণ্ডীদাসের রসোদ্গারের পদও অনুপম-

'এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।

সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।।

রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।

দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥'

আত্মনিবেদন-আক্ষেপানুরাগে খেদ আর আত্মনিবেদনেড় সমর্পণ এই দুটি সুরের মিলনেই চণ্ডীদাসের প্রায় সমস্ত পদগুলি রচিত-

'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি

কুলশীল জাতি মান।।'

৭.৩.২- বিদ্যাপতি ও তাঁর কৃতিত্ব

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী হলেও বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যদেবের প্রিয় ছিল এ তথ্য দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী মিথিলা অপেক্ষা বাংলাদেশেই বেশি জনপ্রিয়। চেতন্যোত্তর বৈষ্ণব বদাবলীতে নানা ভাবে বিদ্যাপতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে চিহিন্ত করা হয়। বৈধবপদ সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতেও বিদ্যাপতির বহু পদাবলীর স্থান হয়েছে।

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। ওইনিবার কামেশ্বর রাজবংশের উত্থান-পতনে তাঁর সঙ্গে সারস্বত জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদ্যাপতি পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। বহুভাষাবিদ কবির প্রকীর্ণ পদগুচ্ছ ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থ আছে। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ কীর্তিলতা কীর্তিসিংহের আমলেই রচিত হয়। কীর্তিসিংহের রাজত্বকাল চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষে হওয়া সম্ভব। এর পূর্বে কবিকে দেখা যায় কীর্তিসিংহের পিতৃব্যতুল্য দেবসিংহের রাজসভায়। সেখানে তিনি তাঁর ভূগোলের বই ভুপরিক্রমা রচনা করেন। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শিবসিংহের রাজসভায় থাকাকালীন তিনি তাঁর পদাবলী রচনা করে যশস্বী হন। রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতিকে ২৯৩ লক্ষ্মণ সং এ বিসফি নামে গ্রাম দান করেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ভাগবতের অনুলিপি প্রস্তুত করেন বিদ্যাপতি ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্রোণবারের অধিপতি পুরাদিত্যের আশ্রয়ে লেখা হয়েছে লিখনাবলী পুস্তকটি। ১৪৩০-৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবীর নামে একটি পদ রচিত হয় শৈবসর্বস্বহার ও

গঙ্গাবাক্যাবলী ১৪৪০-৬০ এর মধ্যে লেখা হয় বিভাগসার, প্রেমভক্তি তরঙ্গিণী, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী। গণেশ্বরের সুহৃদ গণপতি ঠাকুর ছিলেন কবির পিতা। বিদ্যাপতি ও তাঁর পূর্বপুরুষরা বংশানুক্রমে শিবের আরাধনা করেছেন। কৌলিক ঐতিহ্যমতে বিদ্যাপতিও নিজের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে শিবের আরাধনা করেছেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীর মূল উৎস

মিথিল থেকে মূল মৈথিল ভাষায় লেখা বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃকর্তা ছিলেন ডঃ গ্রীয়ার্সন।বাংলাদেশে সংগৃহীত পদগুলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বাংলা মৈথিল অবহটঠ মিশ্রিত এই ভাষাকে বলা যেতে পারে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।

বিদ্যাপতির লেখা ব্রজবুলির পদ শুধু মাত্র বাংলাদেশই নয় উড়িষ্যা ও আসামে প্রচলিত হয়। পূর্ব থেকেই একটা নির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে না উঠলে এ ভাষার সর্বজনীনতা লাভ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। ডঃ সুকুমার সেনের মতে - "মোরাঙ নেপালের রাজসভার আওতাতেই বাংলা মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে অবহটঠের ধাচে ব্রজবুলি উৎপত্তি ।

বিদ্যাপতির রাধার বয়ঃসন্ধির পদ- আলংকারিক পরিভাষানুযায়ী বিদ্যাপতি "সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি"। সে রসের বর্ণনায় তিনি জয়দেব গোস্বামীর অনুগামী। বিদ্যাপতি বিলাস কলাকুতুহলের কবি। তাই তাই তাঁর অপরনাম "অভিনব জয়দেব" উজ্জ্বলরসাশ্রিত প্রণয়োচ্ছাসই বিদ্যাপতির কাব্যবীণায় ঝঙ্কৃত। বিদ্যাপতির পদাবলীর নায়িকা রাধা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ- "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয়, এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। রাধার যৌবনের প্রথম অস্ফুট প্রকাশ দেখা যায় বয়সন্ধির পদে-

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরই।

খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরই।।

খনে খনে দসন ছটাছট হাস।

খনে খনে অধর আগে করু বাস।।'

বিদ্যাপতির পূর্বকথাঃ- বিদ্যাপতির পূর্বরাগেও রাধিকা ছলাকলাময়ী প্রগলভ নায়িকা কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদগুলি সৌন্দর্যে পুণঃ রাধার পূর্বরাগে চন্ডীদাস অনন্য। বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদগুলিতে আছে রূপমৃদগ্ধতা।রুপ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বিহ্বল

মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু

হৃদয়ে শেল দেই গেল।'

বিদ্যুতের মতো রাধার রুপশিখায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় প্রেমের শরাঘাতে বিদ্ধ।অন্য একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নেতে দেখেছেন-

'নীল কলেবর পীতবসন

চন্দনতিলক ধবলা।

সামর মেঘ সৌদামিনী খণ্ডীত

অথিতি উদিত শশিকলা ॥'

রাধার এই সচেতন রূপের আস্বাদন রাজান্তঃপুরের বিদগ্ধ নায়িকারই মানস ধর্ম।

রাধা বলেছেন কৃষ্ণ তার 'দেহক সরবস গেহক সার'। রাধার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেন শ্রীরাধা- তাই পদটির পরবর্তী অংশে রাধা বলেন-

"পাখিক পাখ মীনক পাণি।

জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।।'

এ অনুভর চিরকালের প্রেমিকার অপূর্ব ভাবনা। পাখী যেমন পাখা ছাড়া সীমাহীন আকোশে উড়তে পারে না, মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না তেমনি কৃষ্ণকে ছাড়া রাধার অস্তিত্বই বিপন্ন।

আক্ষেপানুরাগ (বিদ্যাপতি)- বাঁশীর শব্দে রাধার মন বিষের জ্বালায় জর্জরিত। বিদ্যাপতি আক্ষেপানুরাগের কবি নন একথা স্বীকার্য। অভিসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি জয়দেব, কালিদাস ও অমরুর অনুগামী। প্রেমের বীর্যে বিদ্যাপতির রাধা দুর্জয় সাহসিকা নারী। পূর্ণিমা রাতে অভিসারিণী শ্রীমতী কেমন সাজসজ্জা করবেন তার উপদেশ দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ-

'জৈসন রজনি উজোরল চন্দ।

ঐসন বেস ভূসন করু বন্ধ।।'

জয়দেবের গীতগোবিন্দে সখী শ্রীরাধাকে অভিসার যাত্রায় পাঠাতে দৃরপ্রতিজ্ঞ -

'চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম'

গীতায় আছে "যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে সে সেইভাবেই আমাকে লাভ করে।' বিদ্যাপতির অভিসারক পদে শ্রীরাধা পথের গতার দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতার কথা- আধ্যাত্বরসে পূর্ণ। বিরহ অর্থাৎ মাথুরের পদে বিদ্যাপতির রাধার নিদারুণ বিরহজ্বালা বর্ণিত-

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর

এই ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।।'

সখিকে রাধা বলছেন তার দুঃখ অসীম। এই ভরা, বৃষ্টির দিনে যখন "বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে তখনই শ্রীমতী ব্যাকুল। ভাদ্র মাসে রাধিকার ঘর শূন্য। এছাড়া রাধা কৃষ্ণ বিহনে নিরানন্দ-

"হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।

বিপথে পড়ল জৈসে মালতিমালা ॥'

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন তাই অপথে পড়ে আছেন শ্রীরাধা বিশুষ্ক মালতী ফুলের মালার মতো।

ভাবসম্মিলনের কবি বিদ্যাপতি

কৃষ্ণ ফিরে আসেন নি বৃন্দাবনে তিনি মধুরায় কংসনিধনে ব্যস্ত। তাঁর অব্যর্থ প্রকাশের বাণী মানব প্রাণই চিনে নেয়-

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোহি পিরীতি অনুরাগ রাগ বাখানিএ

তিলে তিলে নূতন হোয়।।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দরূপমমৃতং।" এমনই একটি পদ-

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ

পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।

জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ

দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।'

জীবনযৌবন রাধার সফল কারণ তার হৃদয়ে রয়েছেন কৃষ্ণ - একান্ত আপন রূপে। বিদ্যাপতি ভারতের কবি সার্বভৌম। ভাষায় ছন্দে, চিত্রকল্প কংযোজনায় বৈষ্ণব পদাবলীকারদের শ্রেষ্ঠ পূর্বসুরি। আর প্রার্থনার পদে কবির হৃদয়ের গভীর আত্মসমর্পণ ভক্তির বিনম্র সুধায় সুধাময়-

'ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর

তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন

তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।'

ভবসিন্ধুপারের কান্ডারী একমাত্র শ্রীমাধব তাই তাঁর চরণে বিদ্যাপতির শরণাগতি অটুট। বিদ্যাপতি শমন অর্থাৎ যমের ভয়ে ভীত তাই বলেন -

'ভনই বিদ্যাপতি শেষ সমন-ভয়

তুঅ বিনু গতি নাহি আরা'

প্রেমের কবি, সৌন্দর্যরসিক বিদ্যাপতি শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছেন ভক্তির রাজ্যে। কাব্যের কলানৈপুণ্যে, রসের মিলনে, সৃষ্টির আগুন জ্বালা বিরহে বিদ্যাপতির কবিকৃতিই শ্রেষ্ঠ - বিদ্যাপতি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। চৈতন্যপূর্ব যুগের রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কালের সরণি বেয়ে আজও অল্লান।

বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণ কি কি?

(১) বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যের নায়ক নায়িকা রাজসভার পরিবেশে চটুল নাগরিক প্রেমের আধার। বয়ঃসন্ধির পদ বিদ্যাপতির নিজস্ব সংযোজন। রূপানুরাগের পদে বিদ্যাপতির যে সৌন্দর্যচেতনা সেই সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা প্রভাবিত জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

(২) বিদ্যাপতির রাধা নাগরিকা হলেও কামকলানিপুণ। পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলীতে বৈষ্ণবপদাবলীকার জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সেই রাধার কামমিশ্রিত প্রেমকে Platonic Love এ পরিণত করেছেন।

(৩) বিদ্যাপতির ভণিতাংশে রাজার নাম থাকলেও, মিলন ও সখীশিক্ষার পদে তিনি অনন্যা । সেই মিলন রোমান্টিক মিলন রূপান্তরিত জ্ঞানদাসের পদে।

(৪) মানপর্যায় বহুচারী পুরুষের বিশ্বসঘাতকতার ছবি বিদ্যাপতির কাব্যে আছে। রাজসভার জন্যই পুরুষ কৃষ্ণ বহুজনবল্লভ। বৈষ্ণবপদাবলীতেও আমরা গোপীজনবল্লভ "প্রেমলম্পট' বহুচারী কৃষ্ণকেই নায়ক হিসেবে পাই। (৫)বিদ্যাপতি সুচয়িত অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন রাজাদের পরিতুষ্ট করার জন্য। অনুপ্রাস, যমক উপমা, রূপক,

উৎপ্রক্ষা, স্বভাবব্যক্তি, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অলঙ্কার গোবিন্দদাস ব্যবহার করেছেন তাই চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলীকার গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' রূপে পরিগণিত।

(৬)চৈতন্যচরিতামৃতে আছে 'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে' বিদ্যাপতিও কৃষ্ণকে বৃন্দাবনবিহারী করে গড়েছেন- 'বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।

কৌতুকে ছাপিত তাঁহিঁ বহুঁ কান।।'

(৭) শ্রীকৃষ্ণের বিরহ রাধাকে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নিয়ে গেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শেষে জীবনে এই ভাবের মূর্ত প্রকাশ দেখা যায়। বিদ্যাপতির বিরহ সৃষ্টির আগুণ জ্বালা বিরহ তাই বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ চলে যাওয়ায় সমস্ত বৃন্দাবন শূন্য ব্রজগোপী ও রাধার বিরহ বৈষ্ণবপদাবলীকারদের পদাবলীতে মূর্ত।বিদ্যাপতি বলেছেন-

"আন জনমে হেরব কান।।

কাহ্ন হোয়ব যব রাধা।

তব জানব বিরহক বাধা ।।

রাধার দুঃখ বোঝার জন্যই বিদ্যাপতির রাধা মামনা করেছেন কৃষ্ণ এবার রাধা রূপে জন্ম নেবেন। শ্রীচৈতন্যদেবরে সমগ্র দিব্যজীবন সেই রাধাবিরহের মূর্ত প্রকাশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে যখন রাধাভাবের প্রকাশ ঘটে তখন কৃষ্ণবিরহে দরদরধারে অশ্রু বয়ে যায়। প্রিয় পারিষদরা রাধাবিরহ প্রত্যক্ষ করেছেন - যা মাথুর (বিরহ) রূপের পদে বৈষ্ণব কবিদের হাতে জীবন্ত।

৭.৪- চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী

চৈতন্যদেবের জীবিতকালের মধ্যে তারকোনো কোনো ভক্ত বৈষ্ণব পদ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে নীলাচলে চলে গেলে গৌড়ের ভক্তেরা তার বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যেকারও কারও কবি প্রতিভা ছিল। এঁদের কেউ কেউ গৌরচন্দ্রিকা নাম দিয়ে চৈতন্যবন্দনাও লীলাপ্রবেশক গান রচনা

করতে লাগলেন, যেগুলি রাধাকৃষ্ণের পালাকীর্তনের আগে গাইতে হত। কেউ কেউ (যেমন বাসু ঘোষ) চৈতন্যের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনে পালাগানও লিখতে লাগলেন, কেউ-বা শুধু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান লিখতে লাগলেন। তখনই বিদ্যাপতির পদের প্রভাবে এ-দেশে ব্রজবুলি পদ রচিত হচ্ছিল। অবশ্য তখনও এই পদাবলী বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের দার্শনিক মননের দ্বারা ততটা আক্রান্ত হয়নি।কারণ তখন বূপ-সনাতন-জীবের তন্ত্র গ্রন্থগুলির অধিকাংশই রচিত হয়নি-জীব তো তখনশিশু মাত্র। এখানে চৈতন্য-সমকালীন কয়েকজন পদকর্তার কথা বলা যাচ্ছে। মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন। দুজনেই একই টোলে পড়তেন। দুজনের মধ্যেই খুব প্রীতি-অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। মুরারিই সংস্কৃতে সর্বপ্রথম চৈতন্য-জীবনী-কাব্য লিখেছিলেন। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে কিছু কিছু পদ লিখেছিলেন, তার মধ্যে চৈতন্যের বাল্য-কৈশোরলীলার পদগুলি সুখপাঠ্য। নরহরি সরকার ঠাকুর চৈতন্যদেবের আর-এক বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত। শ্রী গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে এঁর জন্ম হয়। ইনি মহাপ্রভুর পরমভক্ত হলেও চৈতন্য-জীবনীকাব্যের সমন্ধে বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। তিনি খান দুই সংস্কৃত পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের তিনিই নাকি আদি রচনাকার। নরহরি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক মধ্যম শ্রেণীর পদ লিখলেও প্রধানত তিনি স্মরণীয় হয়েছেন গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ লিখে। 'গৌরনাগর" ভাবের আদর্শেই তার পদগুলি রচিত হয়েছিল। এই মতের অর্থ, গৌরাঙ্গ যেন কৃষ্ণের মতো নাগর, আর ভক্তের দল যেন গোপীদের মতো নাগরী। নরহরি এইরূপ আদিরসের ছিটেফোঁটা দিয়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক কয়েকটি পদ লিখেছিলেন। এগুলির তাৎপর্য যাইহোক না কেন, চৈতন্যদেবকে নিয়ে ভাগবতের কৃষ্ণলীলার ছাঁচে এতটা “রসোদ্গার' অনেক নিষ্ঠাবান ভক্ত বিশেষ পছন্দ করতেন না। এইজন্য বৈষ্ণব আচার্য শ্রীখণ্ডসম্প্রদায় এই মতই পোষণ করতেন। এইজন্য রক্ষণশীল নৈষ্ঠিক বৈষতবগণ নরহরি ও তার অনুচরদের চৈতন্যসংক্রান্ত আদিরসাত্মক কাল্পনিক পদের বাড়াবাড়ি মানতে পারেননি । সে যাই

হোক, এই পদগুলিতে ভক্ত নরহরির যে নিষ্ঠা ফুটেছে তার মূল্য নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। শিবানন্দ সেন (কবিকর্ণপুরের পিতা), বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়-__এঁরাও কিছু

কিছু পদ লিখেছিলেন। এরা সকলেই মহাপ্রভুর সাহচর্য-সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনজন ঘোষভ্রাতার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন-_গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু (দেব) ঘোষ, এরা তিনজনেই চৈতন্য- অনুচর ও সুদক্ষ পদকর্তা ছিলেন। এঁদের কনিষ্ঠ বাসু ঘোষই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছেন। বাসু ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাস পালা করুণরসের আকর। চৈতন্যলীলার বাসুদেব সরল বাংলা ভাষায় চৈতন্য-সন্ন্যাস-বিষয়ক যে পালা লিখেছেন, তাঁর অনুচর, রামানন্দ বসুও কিছু কিছু ভালো পদ লিখেছিলেন। যদুনন্দন, গোবিন্দ আচার্য, বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি পদকর্তা চৈতন্যের সমসাময়িক এঁদের পদ কবিত্বের দিক দিয়ে এমন কিছু বিস্ময়কর না হলেও চৈতন্য-সমসাময়িক রচনা বলে এগুলির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এবার চৈতন্য-তিরোধানের পরবর্তিকালের কয়েকজন পদকর্তার সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৭.৫- চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রেষ্ঠ কবিকূল

চৈতন্য-তিরোধানের পর ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও শেষভাগেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদকারদের আবির্ভাব হয়। বলরামদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, গোবিন্দদাস-এঁরা এই যুগের বিখ্যাত পদকার এবং বৈষ্ণব পদসাহিত্যের এরাই কর্ণধার। তালের পর গোডীয় ভা গোড়া বেশ কিছু তারপর শোকাবেগ মন্দীভূত হলে, বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে কলিযুগের কৃষ্ণাবতার বলে গ্রহণ করলেন, তিরোধানের পর মানব চৈতন্যদেব জ্যোতির্ময় ভাগবত বিগ্রহে পরিণত হলেন। ভক্ত ও কবির দল নতুন ভাবরসে প্লাবিত হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর ঐশ্বর্য-যুগের সূচনা করলেন।

৭.৫.১ : জ্ঞানদাস ও তাঁর কবি কৃতিত্ব

চৈতন্যে পূর্ববর্তী দুই শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বর্ণনায় যে বিশিষ্ট দুই রীতির প্রবর্তন করেছিলেন চৈতন্য পরবতী ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা সেই ধারারই অনুসরণ করেন একটু অন্যভাবে। কারণ তাঁদের সামনে ছিল বৈষ্ণব তন্ত্র দর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের গ্রন্থ। এই গন্ডীবদ্ধ ভক্তি-প্রেমের জগতে বিচরণ করতে গিয়েও প্রতিভাবান কয়েকজন কবি তাঁদের কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্য পরবর্তী

সেই অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান কবির মধ্যে জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় জানার বিশেষ অবকাশ নেই। তাঁর সর্বজন স্বীকৃত পরিচয় সামান্যই । সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে নরোত্তম দাসের আহ্বানে যে খেতরী মহোৎসব হয় আনুমানিক ১৫৮১ সাল, কারুর কারুর মতে ১৬০১-২, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জ্ঞানদাস তাতে যোগ দেন। তখন নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়দের তিনি অন্যতম ছিলেন। জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্যদের অন্যতম ছিলেন তিনি। জ্ঞানদাস চিরকুমার ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দকে তিনি বাল্যকালে সম্ভবতঃ দেখে থাকবেন-

‘খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে

বাবা আউল ছিল সহচর ।

কবিকুলে যেন রবি চন্ডীদাস তুল কবি

জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।।’

[ভক্তিরত্নাকরঃ নরহরি চকবর্তী]

প্রস্ফুটিত পদ্মের বিকশিত সৌন্দর্য নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গনে জ্ঞানদাসের আবির্ভাব হয় নি। প্রথম জীবনে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রভৃতি মহাজন কবির অনুসরণে তিনি সিদ্ধির মন্ত্র অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে নিতে তাঁর অধিক সময় লাগেনি।

সেযুগে ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৈধী উপাসনার রীতি প্রচলিত ছিল। নিত্যানন্দ চৈতন্য প্রভুর দ্বারা নির্দেশিত হয়ে গৌড়বঙ্গে এই রাগানুগা ভক্তি-ধর্ম-প্রচারের দায়িত্ব নেন-ফলে তিনি এই ধর্মের প্রচারে এমন বাতাবরণ গড়ে তোলেন, যা বৈধী উপাসনা

রীতি থেকে অনেক প্রগতিশীল। জানদাস এই প্রগতিচিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। কাব্যের ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় কবি লিখেছেন -

‘কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি

কেবা দিলে ফাগু রঙ্গিয়া।

রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে

জবাকুসুম তাহে দিয়া।।’

কেবল বর্ণনীভঙ্গিতে মৌলিকতা নয়, কৃষ্ণের রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি ‘জবাকুসুমের’ প্রসঙ্গ এনেছেন। আমরা জানি, জবা ফুল শাক্ত সাধনার অন্তর্গত। বৈষ্ণব হয়েও এই জাতীয় উপমা ব্যবহারে কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভু হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন-জ্ঞানদাসের মধ্যে সেই আদর্শের প্রভাব এত গভীর ছিল যে, কাব্যরচনাতেও তা অকৃত্রিমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জ্ঞানদাসের পদাবলীকে বিষয়বস্তুর বিচারে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে-(ক) গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ, (খ) কৃষ্ণরাধার বাল্যলীলা বিষয়ক পদ, (গ) বয়ঃসন্ধি, (ঘ) পূর্বরাগ, সখিশিক্ষা ও নবোঢ়া-মিলনের পদ, (ঙ) রূপানুরাগের পদ, (চ) দান ও নৌকালীলার পদ, (ছ) মান, খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা বিষয়ক পদ, (জ) বংশীশিক্ষারপদ, (ঝ) অনুরাগ, রসোদগার ও আক্ষেপানুরাগের পদ, (৫) মিলন ও রাসের পদ, (ট) মাথুর ও ভাবসম্মেলনের পদ, (ঠ) আত্মনিবেদনের পদ। উল্লেখিত পর্যয়গুলির পদ রচনায় সর্বত্রই জ্ঞানদাস সমান সার্থক হয়েছেন এমন নয়, বিশেষতঃ তাঁর ব্রজবুলিতে লেখা পদগুলিতে কবিপ্রতিভার দ্যুতি বেশ কিছুটা ম্লান বলেই মনে হয়, তবে সর্বত্রই কবির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় উজ্জ্বল।

রুপদর্শনের পদগুলিতে গোবিন্দদাস নিজ আমিত্বকে পৃথক রেখে যে রূপ নির্মাণ করেছেন, ভাষা, ভাব ও ছন্দের দিক দিয়ে তাতে ক্ল্যাসিক্যাল গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্য আছে। জ্ঞানদাসও রূপদর্শন করেছেন, কিন্তু আমিত্ব বিবিক্ত রূপ গঠনের পথে অগ্রসর হন নি।

তাঁর রূপ নয়, স্বরূপ দর্শন। অনুরাগটাই তাঁর কাছে প্রধান। অথচ চন্ডীদাসের মতো ততখানি আত্মবিস্মৃত কবিও তিনি নন। সুতরাং রূপ বর্ণনার একটা বাহ্য - প্রয়াস তাঁর মধ্যে আছেই। কিন্তু একে ভেদ করে আন্তর-প্রবৃত্তি-স্বরূপ-ধর্ম উঁকি মারছে। গোবিন্দদাসের কাছে রূপদর্শন যা রূপনির্মাণও তাই। তিনি দেখেন যা, গড়েন তেমনই - সর্বাবয়ব নিখুঁত মূর্তি। জ্ঞানদাসের দর্শনে ও নির্মাণে প্রভেদ আছে। তিনি যা দেখেন তাই আঁকতে পারেন না। কাব্যের মধ্যে দর্শনজাত আত্মস্ফুর্তির ছাপটুকু থেকে যায়। ফলে সেখানে রূপ ও সরূপ মন্ময়তা ও তন্ময়তার মেশামেশি। যেমন কৃষ্ণের রূপবর্ণনামূলক পদ

‘চুড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ

ভালে সে রমণী মনোলোভা।

আকাশ চাহিতে কে বা ইন্দ্রের ধনুক খানি

নব মেঘে করিয়াছে শোভা।।’

এই দর্শন প্রাচীন কবিকূলের শিল্পলোক থেকে আহুত রত্নরাজি নয়, উপমার মতো দৃষ্টিও একান্তই জ্ঞানদাসের একান্ত নিজস্ব। বৈষ্ণব পদাবলী গানে, বিশেষকরে চৈতন্য পরবর্তী ভক্ত কবিদের গানে ব্যক্তিক প্রেমানুভূতির আর্তি প্রকাশের অবকাশ কম। জ্ঞানদাস কিন্তু ভাব বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের ধর্মীয় জগতের ছবি আঁকতে গিয়েও তারই ফাঁকে ফাঁকে আপন মনের নিভৃত ভাবনার স্পর্শে আমাদের চমকিত করে তোলেন।

পূর্বরাগের পদরচনায় জ্ঞানদাস চন্ডীদাসের অনুসারী হয়েও স্বতন্ত্র ।প্রথম দর্শনের পুলক বিহ্বলতা ও রূপতন্ময়তা

‘রূপের পাথারে আঁখি ডুরি সে রহিল।

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।’

পদটিতে সুব্যক্ত প্রথম দর্শনের মুহূর্তে রূপের পাথারে রাধার আঁখি নিমজ্জিত হয়েছে এরং রূপপাগল তরুণীর মন যৌবনের বনে পথ হারিয়েছে। ফলে ঘরে ফেরার পথ

রাধার কাছে অফুরান বলে মনে হয়েছে। রোমান্টিক কবি জ্ঞানদাসের তীব্র রোমান্টিক আকুলতা ও হৃদয়ভেদী আকুতি তাঁর পূর্বরাগের পদে অপরূপ কাব্যশ্রী মন্ডিতরূপে প্রকাশ পেয়েছে-

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।'

প্রিয়তমের প্রতি অঙ্গের জন্য প্রিয়তমার প্রতি অঙ্গের এই যে ক্রন্দন ও নিঃসীম আকুলতা তার মাধ্যমে শুধু পূর্বরাগের আবেশ বিহ্বলতা নয়, মানবাত্মার চিরন্তন বিস্ময় প্রকাশিত। ইন্দ্রিয় চেতনা ও ইন্দ্রিয় বাসনা এই অভিব্যন্তিতে জ্ঞানদাস বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করে গেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী কবিরূপে কাব্যরচনা ছিল জ্ঞানদাসের ধর্মসাধনার অঙ্গ। ত ছিল কবির 'লীলাশুকবৃত্তি'। সমালোচকের ভাষায় "বৈষ্ণবভক্তদের জীবনের চরম সাধনা সিদ্ধদেহে গোপ কিশোরীর মূর্তি ধারণ করিয়া নিত্যবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা দর্শন" এবং সেই

আনন্দ সংগীতকে ব্যক্ত করা। এই কবিরা তাই প্রেমের কবিতা রচনায় জীবন থেকে রূপ গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানদাসের রাধা যখন বলেন-

'আলো মুঞি জানো না

জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে

চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে।।'

তখন রাধার হৃদয় আকুলতা, তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে মানব প্রেমের গভীরতম রূপায়ণরূপে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। রুপানুরাগের কবিতায় জ্ঞানদাস সর্বোৎকৃষ্ট কবি প্রতিভা ও রোমান্টিক মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। বস্তুতঃ রূপের কথা বলতে গিয়ে জ্ঞানদানের পদ অসীম, অরূপের বার্তাবহ হয়েছে। দেহ-মন, রূপ-অপরূপের এমন নিবিড় সম্পর্ক, গভীরতম আবেগের এমন মহত্তম বাণীরূপ সত্যই অন্যত্র বিরলদৃষ্ট। যৌবনোচ্ছল সরলা নায়িকার রূপানুরাগের চিত্রণে, বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দচয়নে জ্ঞানদাসের

কবিপ্রতিভার অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ভাবতন্ময়তার সঙ্গে রোমান্টিক প্রেম ও স্বপ্নাবেশ মিশ্রিত হয়েছে। স্থূলতা পরিহার করে প্রেমানুভূতি যে অসীম আনন্দময় স্বপ্নলোকে ধাবিত হতে পারে জ্ঞানদাসের পদে তারই চকিত শিহরণ ও মিশ্র ভাবরূপ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেম ইন্দ্রিয়ের মিলনজাত নয়, ইন্দ্রিয়মিলনে যে অসীম প্রেম স্বপ্নের পরিতৃপ্তি ঘটে না, এ যেন সেই কল্প বিরহের বেদনা মিশ্রিত আনন্দলোকের বার্তা বহন করে এনেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই জ্ঞানদাসের রোমান্টিক ও লিরিকধর্মী কবিপ্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা আকর্ষণ ছিল। এই মানবীয় প্রেম ও রোমান্টিক অনুভূতিতে জ্ঞানদাস মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি হয়েও আজকের পাঠকের কাছে এতটা সমাদৃত। রূপনির্মিতিতে দক্ষতা, সুরের প্রাবল্য তথা গীতিপ্রাণতা, মৌলিকতা, আধুনিকোচিত মননধর্মিতা এবং রোমান্টিকতা জ্ঞানদাসের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। লিরিক প্রতিভার সার্থক উত্তরাধিকারীরূপে অন্তরের অনুভূতির স্পর্শে জ্ঞানদাসের পদ যুগ ও কালোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করেছে। কবি তাঁর রাধার হৃদয়বেদনা ও অন্তরার্তির মধ্যদিয়ে সাধারণ মানবীয় যে চিত্ত আকুলতা ব্যক্ত করেছেন সেই কারণেই তাঁর কাব্যের আবেদন সর্বজনীন।

তবে জ্ঞানদাস সর্বত্রই যে কবিপ্রতিভার উচ্চমান রক্ষা করতে পেরেছেন এমন নয়। এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে একই পদের সকল পঙক্তিতে কবিত্বের স্ফুরণ সমানভাবে হয় নি। মাঝে মাঝে কবিত্বের দ্যুতি বিদ্যুৎচমকের মতো দীপ্তিমান হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই আবার যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। জ্ঞানদাসের ব্যর্থতার অপর কারণ তাঁর আত্মনিষ্ঠতা। এই ব্যর্থতাই আবার তাঁর অন্য বিজয়ের স্মারক। তিনি এমনই আত্মনিষ্ঠ যে, নিজ মন সুখের প্রতিকূল কোনো ক্ষেত্রেই পদ চারণায় স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। অবশ্য কোনো নীতি কবিরই তা থাকে না। জ্ঞানদাসের তৃতীয় সীমাবদ্ধতার কারণ তাঁর ব্রজবুলিতে পদ রচনার চেষ্টা। বাংলায় রচিত পদের কাব্য সৌন্দর্য ব্রজবুলিতে একবারেই লক্ষিত হয় না। এমন কি মিশ্রপদেও ব্রজবুলির তুলনায় বাংলা অংশের কাব্যসৌন্দর্য অসাধারণ।

বৈষ্ণব রসপর্যায়ের সব শাখাতেই জ্ঞানদাস বিচরণ করেছেন, কোথাও সার্থকভাবে, কোথাও বা কিছুটা অসাফল্য সহকারে। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ বিষয়ে তিনি যে পদগুলি লিখেছেন তার তুলনায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদগুলিই অধিকতর সার্থক হয়েছে। কিন্তু যেখানে তিনি বিদ্যাপতির অনুসারী, সেখানেই তিনি স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আর, যেখানে তিনি চন্ডীদাসের ভাবানুসারী, সেখানে তাঁর কবিপ্রতিভা সাফল্যের চুড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করেছে। জ্ঞানদাস চন্ডীদাসের মতো তদগত চিত্তের কবি নন, তিনি আত্মগত কবি। আবার "কবিত্বের বাহিরের লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাস অপেক্ষা উচ্চতর কারুশিল্পী, কারণ, রূপনির্মিতিতে জ্ঞানদাস অধিকতর শিল্প প্রয়াসের পরিচয় দিয়াছেন"।

একটি ধর্মগোষ্ঠীর হয়ে যখন কোনো ভক্তকবি সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন সেখানে সর্বত্র কবিত্বের উৎকর্ষ প্রত্যাশা করা যায় না। বহুক্ষেত্রেই পালাগানের প্রয়োজনে, তত্ত্বগত সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে কবিকে ফরমায়েশী পদ রচনা করতে হয়। এই প্রতিবন্ধকতাকে বহুলাংশে অতিক্রম করে লিরিক প্রেম বেদনার এক বিশিষ্ট অনুভূতি জ্ঞানদাস যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, সেখানেই বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী থেকে তিনি স্বতন্ত্র।

৭.৫.২- গোবিন্দদাস ও তাঁর পদাবলী

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা অধিক আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী শাখায়। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগেও বৈষ্ণব পদাবলী ছিল। সংস্কৃতে জয়দেব রচনা করেছিলেন 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' ব্রজবুলিতে বিদ্যাপতি লিখেছিলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে পদাবলী সাহিত্যে নির্ঝরের উৎসমুখ খুলে গেছে। এ যেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে' এই আবিষ্কার ষোড়শ শতাব্দীর ।

এই পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ অনুভবের আবেগ এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় ভক্তির আকুলতা। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে বৈষ্ণবপদকর্তাদের প্রকাশ অনেকটাই

ছিল পরোক্ষ অনুভবের ফল। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগে এই প্রকাশ অনেকটাই ছিল প্রত্যক্ষ অনুভবের প্রভাব। কবিগণ যেন শ্রীচৈতন্যের ভিতর রাধাপ্রেমকে সজীব মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করলেন। এই অপরোক্ষানুভূতির স্পর্শেই পদকর্তাগণ মহাজন হয়ে উঠলেন। মহাজন তাঁরাই, যাঁরা প্রেমের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। ষোড়শ শতক থেকেই বৈষ্ণব পদাবলী "মহাজন পদাবলী" আখ্যা লাভ করলো। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠতম পদকর্তা গোবিন্দদাস।

বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য রূপে অভিহিত হলেও একথা সত্য যে শুধু তত্ত্ব ও ভক্তি দিয়ে কাব্য রচনা হয় না। শ্রেষ্ঠ কবির তত্ত্বোপলব্ধির বাইরেও একটি জিনিস থাকে, সেটি হলে তাঁর কবিত্বশক্তি। অধিকাংশ বৈষ্ণব পদকর্তাই সেই শক্তির অধিকারী ছিলেন। তবে এঁদের মধ্যে গোবিন্দদাসের নাম বেশি করে মনে পড়ে। কারণ তাঁর কাব্যে তত্ত্ব, ভক্তি ও মানবিক আবেদনের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। অসামান্য কবিত্বশক্তির স্পর্শে গেবিন্দদাসের পদাবলী নীরস তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়নি। কাব্যমুল্যেও শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

পদাবলী সাহিত্যে অন্তত চারজন গোবিন্দদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য শ্রীখণ্ডের দামোদর কূলের ভক্তকবি গৌবিন্দদাস কবিবাজ চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যমণি সরূপ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভবত তৃতীয়-চতুর্থ শতকের কোনো এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নরহরি চত্রবর্তীর "ভক্তিরত্নাকরে' আছে-

'রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর।

পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর।।

দামোদর সেনের নিবাম শ্রীখণ্ডেতে।

সেহোঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে।।'

গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক নিত্যানন্দের শিষ্য বলরাম দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শক্তির উপাসক ছিলেন। শৈশবে মামাবাড়িতে শাক্তপরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে হয়তো শাক্ত মনোভাব তাঁর মধ্যে

গড়ে ওঠে। পরে কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হলে তাঁর দাদা রামচন্দ্রের পরামর্শে শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণবধর্মে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ এর পরেই হয়েছিল এবং দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল তিনি ধর্ম সাধনা ও কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। গোবিন্দদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে শ্রীনিবাস তাঁকে কৃষ্ণলীলার পদ রচনার আদেশ দেন। তাঁর কবিত্বে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদরচনা করেছেন। তিনি যেমন শ্রীবাস ও নরোত্তমের আদর্শ মেনে নিয়ে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ রচনা করেছিলেন, তেমনি অন্যান্য নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কবির, মতোই গৌরচন্দ্রিকা, রূপানুরাগ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, রসোদ্গার, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহ প্রভৃতি প্রায় সকল পর্যায়েরই পদ রচনা করেছেন। তবে গৌরচন্দ্রিকা, রূপানুরাগ ও অভিসার পর্যায়েই তাঁর অসামান্য প্রতিভার বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা বিষয়ক দুটি উল্লেখযোগ্য পদ-'নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন/গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ" মূলতঃ সঙ্গীতধর্মী এবং 'শ্যাম সুধাকর ভূবন মনোহর' মূলতঃ ভাবগভীর ও সুরসমৃদ্ধ রচনা। পদটি শব্দসঙ্গীত রূপচিত্রকে আকর্ষণ করেছে। আবার, তাঁর 'শারদ সুধাকর মণ্ডল-মণ্ডন-খন্ডন বদন বিকাশ' পদটিতে পরিস্ফুট চিত্রকল্প অতুলনীয়। বিলীয়মান সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে নায়িকার নিদ্রিতাবস্থার স্মিত হাস্য ও তা মিলিয়ে যাওয়ার তুলনা যুগ ও কালোত্তীর্ণ রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্যরুপে পরিচিত হলেও গোবিন্দদাস শব্দধ্বনি সৃষ্টির ব্যাপারে জয়দেবের কাছে ঋণী।

অভিসার পর্যায়ের পদ রচনায় গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার অভিসারই সমগ্র লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড। অভিসারে গতানুগতিক গৃহশৃঙ্খল, লজ্জাকুলশীল, সংসারধর্ম, পরিজন-গুরুজনদের ভয় সমস্তই দূরীভূত ও উপেক্ষণীয় বলে মনে হয় রাধিকার কাছে। কন্টক, উত্তপ্ত বালুকা, সর্পভয়, বজ্রপাত, প্রবল বর্ষণ, দারুণ শৈত্য, সুচীভেদ্য অন্ধকার ইত্যাদি সমস্ত রকম প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হয়। অভিসারিকার দেহাত্মবুদ্ধি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ যেন লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম

করে আধ্যাত্মিক প্রেমের সরূপ প্রকাশ করে। বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যে গোবিন্দদাসের অভিসারের গদগুলি এতটাই সমৃদ্ধ যে 'রাজাধিরাজ' উপাধি তাঁরই প্রাপ্য সাধনাবেগ ও প্রেমনিষ্ঠায় গোবিন্দদাসের অভিসারিকা রাধা অতুলনীয়া, অদ্বিতীয়া। গোবিন্দদাস বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে শব্দমন্ত্র , ধ্বনিগুণ ভাবগৌরবের মিশ্রণে রাধার যে চিত্র এঁকেছেন তা কবির বর্ণনাকে অনির্বচনীয় স্তরে উন্নীত করেছে। শব্দঝংকার, অলংকার সৃষ্টি, ভাষার দ্যুতি ও ছন্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস বর্ষণমুখর-বর্ষারজনী, ভাদ্রমাসের দুরন্ত বারিধারা, হিমশীতল পৌষ-রজনী সবই প্রত্যক্ষবৎ ফুটে ডঠেছে। গোবিন্দদাস খণ্ডিতা রাধার মনোবেদনা নাট্য সংলাপের ভঙ্গিতে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

অলংকারের ঐশ্বর্যে, ছন্দের কৌশলে ভাষার দ্যুতিতে -- এককথায় কবিতার বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব-সাধনে গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিপ্রতিভার অধিকারী, ভাবের গভীরতা, অলংকারাদির প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে গোবিন্দদাসের রচনা ক্ল্যাসিক্যাল ভাব গাম্ভীর্য ও পারিপাট্য লাভে আপাত দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও অন্তরঙ্গ দিক থেকে ভাবের ঐশ্বর্য ও মাধূর্যের বিচারে ভক্ত, রসিক, গায়ক ও শ্রোতা সকলের কাছেই বহুল পরিমাণে সমাদৃত।

গোবিন্দদাসের কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সংগীতধর্মিতা। অনুপ্রাসাদি অলংকারে সৃষ্ট, শব্দ ঝংকার তাঁর পদগুলিকে সংগীতমুখর করে তুলেছে। শব্দের কারুকার্য ও ঝংকার, বাক নির্মিতিতে বিশেষ অভিব্যাক্তি, অংলকারের বহুল উপস্থিতি, চিত্র-রচনার বিশেষ ক্ষমতা সব কিছুর সমবায়ে অথচ সবকিছুকে অতিক্রম করে এক আশ্চর্য সংগীতময়তা তাঁর পদসমূহকে বিশিষ্ট, করে তুলেছে। গোবিন্দদাসের পদের অর্থ না বুঝলেও তার সংগীত মাধূর্য ও ধ্বনিঝংকার পাঠককে এক অপরূপ রহস্যময়তার জগতে নিয়ে যায়।

গোবিন্দদাসের পদ গাঢ়বদ্ধ, বক্তব্যবিষয়ে সংযত, সংহত নিটোল স্ফটিকসদৃশ। তাতে ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা যেমন বর্তমান,তেমনি প্রকাশভঙ্গিতে সচেতন শিল্পসংযম লক্ষণীয়।

তাঁকে মঞ্জরী ভাবের সাধক রূপে আরাধনার কৰি হিসেবে চিহিত করলেও তাঁর পদে মানবিক আবেদনের দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। ঘর ও বাইরের নানা বিপর্যয় ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর রাধা বিভ্রান্ত, কিন্তু বিচলিত ও সংকল্পচ্যুত হননি। প্রেমের একনিষ্ঠা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও কৃচ্ছসাধনায় তিনি তুলনারহিত।

তবে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কবিরূপে বিরহ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে কবি ততখানি সফল নন। রাধার বেদনার রূপচিত্রণে সেই গভীরতা ও বিষাদের বিচ্ছুরণ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। তাঁর দ্বিতীয় দুর্বলতা অলংকারাসক্তি। মাথুর বিরহে অনুচিত অলঙ্কৃতি রাধার বেদনার গরভীরতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

বিদ্যাপতির মতো গোবিন্দদাসও সচেতন শিল্পী ছিলেন। সচেতন শিল্পবোধ নিয়ে তাঁর রচিত পদগুলিতে ভাস্করের হাতে মূর্তি যেরকম একটু একটু করে চিত্রে ও অলঙ্করণে সুন্দর হয়ে ওঠে, ঠিক সেইভাবে ধ্বনি, অলংকার ও ছন্দের মোহন সাজে কাব্যপ্রতিমার সৌন্দর্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করি। ভক্ত কবি রূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে দার্শনিকতা তাঁর পদে কিছুটা সচেতনভাবেই এসে পড়েছে। এর ফলে কোথাও কোথাও কাব্যসৌন্দর্যও ক্ষুন্ন হয়েছে। তবু তিনি ভক্তির আবেগে শিল্পীর রূপ-ভোক্তার সত্তাকে বিসর্জন দেন নি। রূপদক্ষ সচেতন শিল্পী সত্তাতেই তাঁর আসল পরিচয় নিহিত। এ যুগের অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের তুলনায় ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ এবং ধ্বনিময় রূপনির্মিতির ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধ হয়। অন্য অনেক কবি যেখানে অলংকার, ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারে কাব্য দেহকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন, গোবিন্দদাস সেখানে কাব্যের এশ্বর্যপূর্ণ অঙ্গসজ্জায় বিশেষভাবে সফল হয়েছেন বলা যায়।

সচেতন রূপদক্ষ শিল্পীর ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা, আলংকারিকতা, মণ্ডনকলা, চিত্র ও সংগীতধর্ম, সৌন্দর্য দৃষ্টি, ধ্বনি প্রাধান্য, ছন্দোনৈপুণ্য, ভক্তিভাব, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের সমাহার-ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গোবিন্দদাসের রচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষায় রচিত পদেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়। গোবিন্দদাস কবিরাজ ভক্তকবি, বৈষ্ণব কবি। “কবিরাজ-রাজ”, 'রস-সায়র' গোবিন্দদাসের পদে প্রেম-ভক্তির

চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষণীয়। তদুপরি, "যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে কবিগণ চমকয়ে চীত" -গোবিন্দ হলেন এমনই কবি।

ষোড়শ শতকের আর কোনো কবি বৈষ্ণবভক্ত ও রসজ্ঞদের কাছে এত প্রশংসা পান নি। আবার কালের কষ্টিপাথরে ও গোবিন্দদাসের রচনার চিরন্তন মূল্য প্রমাণিত হয়েছে। এখানেই বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের গৌরব ও সাফল্য। গোবিন্দদাসের পদাবলী গানে তত্ত্বের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। তবে তত্ত্ব কাব্যরসকে ক্ষুন্ন করতে পারে নি - এখানেই কবির আসল গৌরব।

গোবিন্দদাস খাঁটি লিরিক কবি না হলেও তাঁর কাব্যের বড় বৈশিষ্ট্য হলো লিরিকগুণ। সঙ্গীতের অবিচ্ছিন স্রোতে পাঠক, শ্রোতাকে একেবারে ডুরিয়ে দিতে পারেন খুব কম কবি-ই। গোবিন্দদাস ছিলেন সেই বিরল প্রতিভার অধিকারী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর কাব্যের ক্ল্যাসিক্যাল গাম্ভীর্য। অথচ তাঁর পদের বস্তুভার সুরের ডানায় ভর করে পাঠক ও শ্রোতাকে পৌঁছে দিয়েছে গভীর অনুভূতির রাজ্যে। এইভাবেই কবি অন্য সকল পদকর্তাদের তুলনায় পৃথক হয়ে গেছেন।

৭.৫.৩- বলরাম দাস ও তাঁর কবি কৃতিত্ব

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিন্ন নামে একাধিক কবি থাকার সম্ভাবনা দেখা গেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে কবি চণ্ডীদাসের মতো বলরাম দাসকে নিয়েও সে সমস্যা ঘটেছে। এই দুই বলরাম দাসের মধ্যে একজন ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে, অন্যজন সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন বলে অনুমান করা হয়। এই দুই কবির মধ্যে প্রথম জনের কৃতিত্বই সর্বাধিক। ইনি সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ রচনা করেন। তাঁর রচিত পদগুলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত হয়। এই বলরাম দাসের জন্মস্থান, কৃষ্ণনগরের অন্তর্ভুক্ত দোগাছিয়া গ্রাম (মতান্তরে শ্রীহট্টে)। ইনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। এঁর গৌর গুণগানে মুগ্ধ হয়ে নিত্যানন্দ নিজের শিরোভূষণ উপহার দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দের সখ্যভাবের উপাসনা কবি বলরাম দাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সাঁইত্রিশ জন পর্ষদের সঙ্গে বলরাম দাসের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন-

‘প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস

যাহার বাতাসে সব পাপ হয় নাশ।’

খেতুড়ী মহোৎসবের বৈষ্ণব সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। 'পদকল্পতরু' সঙ্কলনে তাঁর নামে ১৩৬টি পদ স্থান পেয়েছে। বাৎসল্যভাব, চিত্রময়তা, আত্মসচেতনতা, বর্ণনামূলকতা, বাংলা ও ব্রজবুলির সুষম মিলন এবং ছন্দঝঙ্কার তাঁর পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণে কবি কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, অভিসার, সম্ভোগ, রসোদগার, দানলীলা, নৌকাবিলাস, খন্ডিতা, বিরহের পদ রচনা করেছেন। অবশ্য সব পর্যায় সমানভাবে উজ্জ্বল নয়। উল্লেখযোগ্য দু- একটি অংশ; যেমন গৌরাঙ্গের বর্ণনা-

‘নাচিতে নাচিতে গোরা

যেনা দিগে চায়।

লাখে লাখে দীপ জ্বলে

কেহ হরি পায় ॥

কুলবধু সকল ছাড়িয়া হরি বলে।

প্রেম নদী বহে সবার নয়নের জলে।।’

নিত্যানন্দের বর্ণনা-

‘আজও অবধৌত করুণার সিন্ধু

প্রেমে গরগর মন করে হরি সংকীর্তন

পতিত পাবন দীনবন্ধু।।’

কিংবা শ্রীরাধার আক্ষেপ-

‘দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।

কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥

কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।

আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে।।’

তাঁর আর একটি পদ ‘হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির’ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ মনের বিশ্লেষণ-সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

কবি প্রধানত বাৎসল্য রসের পদ রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাল্যলীলার ক্ষেত্রে মা যশোদার সুগভীর বাৎসল্য স্নেহ পাঠকচিত্তে সঞ্চালিত। সঞ্চারিত হয়ে ওঠে মূলতঃ দুটি কারণে-একদিকে আবেগের উষ্ণ উত্তাপ, অন্যদিকে সেই আবেগ-নির্ভর মুহূর্তে একটি ঘরোয়া অভিজ্ঞতার চিত্রাঙ্কন। এই পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায় বলরাম দাসের পদে।

একদা এক সুন্দর প্রভাতে শিশু কৃষ্ণের অনভিজ্ঞ হৃদয়ে আসে বাইরের ডাক, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে ওঠে চিত্ত। তখন আর পুরাতন পরিবেশে মন বসে না, নতুন মোহাবেশে চিত্ত হয় অধীর, ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায় সে মায়ের কাছে, বলে-

‘গোঠে আমি যাব মা গো, গোঠে আমি যাব।

শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।।

চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।

আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে।।’

পরবর্তী অংশে দেখা যায় মা যশোদা কিভাবে ‘সাজায় বিবিধ বেশে’ তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা। বস্তুত এই বর্ণনা চিত্ররূপে গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে তখনই, যখন শিশুকৃষ্ণের দেহের

আভরণে ও পরিচ্ছেদে, রত্নহারে ও নূপুর ঝঙ্কারে, তিলক ও কাজলের অলঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক মুগ্ধ মাতৃমূর্তি

‘অঙ্গ বিভূষণ কৈল রতন ভূষণ।

কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন ॥

চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।

চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥

বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।

নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি।।’

বিলম্বিত লয়ের উচ্চারণে নিসর্গের পটভূমি এবং গোপ বালকদের গোষ্ঠ থেকে প্রত্যাবর্তনের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকেছেন বলরাম দাস-

“চাঁদ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া

ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।

শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু

পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।।’

ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু

পথে চলে করি কত ভঙ্গে।

যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন

বলরাম দাস চলু সঙ্গে।।’

বৈষ্ণব পদ রচনায় তাই কবি বলরাম দাসের স্থান অদ্বিতীয় না হোন নিঃসন্দেহে অতৃতীয়। বলরামদাসের বাৎসল্যভাবের একটি চমৎকার পদ উল্লেখ করি। প্রত্যুষে

বলরামাদি রাখালবালকেরা কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে গোচারণে চলেছে। তাতে যশোদা মায়ের প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে-

বলরাম, তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।

যারে ঘুমে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি

তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥

বসন ধরিয়ে হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে

দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।

এহেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া

কেমনে ধরিবে প্রাণ যায়।।'

এই স্নেহব্যাকুল আর্তি নিবিড় মানবরসে ভরা বলে এর স্বাদু মাধুর্য এখানে উপলব্ধি করা যায়।

৭.৬- গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলী

লিরিক কবিতায় কবির আত্মভাব অথবা মন্ময়তা প্রাধান্য পায়। মন্ময় দৃষ্টির আলোকে বস্তুর স্বীকৃত সাধারণ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গী এবং আপনাকে প্রকাশ করার রীতি-সবটাই স্রষ্টার হৃদয়বাসনায় রঞ্জিত হয়। সামান্যকে বিশেষ করার প্রবণতা লিরিক কবিতায় লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণবকাব্য আধুনিক আর্থে মন্ময় কাব্য নয়। এতে রূপের কথা বাদ দিলেও ভাবের কথা যা আছে তা রাধা ও কৃষ্ণের হৃদয়ভাব। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুগত ভাব--ভাবনাকে কবির নিজস্ব আবেগ - ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার অনুরঞ্জন বলে সব সময়ে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে কোন কোন কবির কোন কোন পদে লিরিক কবিতা সুলভ সুতীব্র রসানুভূতির উজ্জল সংহতির দিকটি লক্ষ করা যায়-অবশ্যই সেই অনুভূতি কবি-ব্যতিরিক্ত অন্য একজনের ব্যক্তি সত্তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিদ্যাপতির রাধার কণ্ঠে বিরহের পর্যায়ে যে আবেগ ফুটে ওঠে তা একান্ত ভাবেই লিরিক ধর্মী চণ্ডীদাসের কবিতার

আধ্যাত্মিকতা শেষ পর্যন্ত গীতিধর্মিতাকে গ্রাস করতে পারে নি। জ্ঞানদাসের মধ্যে লিরিক ভাবনার সর্বোত্তম প্রকাশ। তাঁর একটি পূর্বরাগের পদে আছে-

'আলো মুঞিজানোনা সই জানো না

জানো না গো জানো না।'

একই কথা আকুলভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরম অনুনয়ের সুরে প্রকাশ করেছেন যিনি তিনি বাহ্যত রাধা হলেও আসলে স্বয়ং কবি।স্পন্দমান হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অকারণ অনুনয়ের সুরে বেজে উঠেছে। রোমান্টিক কবিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে-

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।'

'প্রতি অঙ্গলাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' প্রভৃতি পংক্তি বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্ব সাহিত্যেও গৌরবের।

ষোড়শ শতকের শেষভাগের বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস কবিরাজ সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেও পদ রচনা করেছেন। ছন্দ ঝংকারে, অনুপ্রাসে, অলংকারে, কবিকর্মের অপূর্ব নিপুণতায় গোবিন্দদাস অতুলনীয়। ভাবগৌরবও তাঁর যথেষ্ট। তবু গীতিমাধুর্যই তখন লক্ষ্য হয়ে উঠেছে তা গোবিন্দদাস থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।

সপ্তদশ শতকে ছন্দ-কৃতিত্ব ক্রমে বেড়ে চলল। গোবিন্দদাসের পরে ভাব-সরসতায় ভাঁটা পড়েছে। কিন্ত জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের অনুরূপ না হলেও সপ্তদশ শতকে উৎকৃষ্ট পদকর্তার অভাব নেই। হেমলতা দেবীর শিষ্য ছন্দশিল্পী যদুনন্দন দাস, জগদানন্দ, শ্রীনিবাস-শিষ্য রাধাবল্লভ দাস (চক্রবর্তী), গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম, শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস (গোপাল দাস), সৈয়দ মর্তুজা জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ) প্রমুখ পদকর্তারা সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন।

এই সময়ের কবিরা ছিলেন শ্রীনিবাস-নরোত্তম শ্যামানন্দের প্রচারে ও প্রতিভায় উদ্বুদ্ধ। এই সময়েই বাংলার বিচিত্র কীর্তন পদ্ধতির প্রচলন হয়। গরানহাটি, রানিহাটি,

মনোহরশাহি, মান্দারনি (ঝাড়খণ্ডি) প্রভৃতি কীর্তনের বিভিন্ন ঘরানা বিকশিত হয়ে ওঠে। বিশেষ কেন্দ্রের নাম অনুসারে ওইসব কীর্তন-পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে।

বৈষ্ণব সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের আর একটি দিক হল বিষ্ণুপুরে মন্দির শিল্পের বিকাশ।বিষ্ণুপুর অবশ্য সঙ্গীতচর্চার জন্যও বিখ্যাত ছিল, পদাবলীর চর্চাও সেখানে হয়েছিলো।

বীর হাম্বীরের ভণিতায় দুটি পদ পাওয়া গেছে একটি গুরু শ্রীনিবাসের বন্দনা, আর একটি নবাণূরাগিনী রাধার দৃষ্টিতে কালাচাঁদের সরূপ বর্ণনা। দ্বিতীয় পদটি এইরকম-

‘শুন গো মরমী সখী কালিয়া কমল আঁখি

কিবা হৈল কিছুই না জানি।

কেমন কেমন করে মন লাগে সব উচাটন

প্রেম করে খোয়ানু পরানি।”

রচনা বেশ ভালো বলেই মনে হয়।

বীর হাম্বীর 'চৈতন্যদাস' ভণিতাতেও পদ লিখেছিলেন বলে নরহরি চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা চৈতন্যসিংহের নামেও পদ পাওয়া গেছে, শ্যামচাঁদের বন্দনা। পদটির চারটি ছত্র উদ্ধৃত করছি।

“চায়ন চান্দ বান্ধ মুধমন্ডল

ভালহি চন্দন চান্দ।

বিংশতি চান্দ চরণ করমন্ডল

শিরে শিখি চান্দ সুছান্দ।”

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয় আদিত্যের ভণিতায় পদ মিলেছে। তাছাড়া প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ও পদ লিখেছেন। প্রতাপাদিত্যের একটি ভণিতায় একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে। পদটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি-

‘বন্ধুর লাগি কোন দেশে যাইমু

রজনী হৈলে কায় মুখ চাইমু।

ভোখে ভাত নাহি খাঙ পিয়াসে না খাঙ পানি

জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদয়ে আগুনি।

শুতিলে না আইসে নিপ্রা বসিলে পোড়ে হিয়া

বিষ খাই মরি যাইমু কালার বালাই লৈয়া।’

প্রথম পদসংকলন গ্রন্থ রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' সপ্তদশ শতকে সংকলিত হয়।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্য সিংহ পিতার মতো শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে-

‘যব ধরি পেখলুঁ কালিন্দীতীর

নয়নে ঝররে কত বারি অথীর

কাহে কহব সখি মরমক খেদ

চিতাই না ভায়ে কুসুমিত শেজ।।’

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গোবিন্দগতির শিষ্য। ঘনশ্যাম ব্রজবুলি পদ রচনায় নিপুণ ছিলেন। সংস্কৃত শ্লোক এবং ব্রজবুলি পদ - দুয়েরই রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। যেমন-

‘ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝুমকল

ঝিঁ ঝিঁ ঝনকত ঝাঁঝিয়া।’

কবি রাধাবল্লভদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। তা ছাড়া আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন রাধাবল্লভ চক্রবর্তী।একটি পুথিঁতে রাসলীলার কিছু পদ পাওয়া গেছে রাধাবল্লভ কয়েকটি ‘শোচক' অর্থাৎ তিরোভূত মহাজনের স্মারক-পদ লিখেছিলেন।

কবি বল্লভ নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁর রচিত একটি পদের অংশবিশেষ-

‘সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়

সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিয়ে

অনুখন নৌতন হোয়।’

শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের লেখা দু'চারটি পদ গাওয়া গেছে। শ্রীনিবাসের পৌত্র সুবলচন্দ্রও দু'একটি পদ লিখেছিলেন।শ্রীনিবাসের শিষ্য পদকর্তাদের মধ্যে এঁদের নামও উল্লেখযোগ্য- গোকুলানন্দ, বংশীদাস ও শ্যামদাস। শ্যামদাসের একটি পদের অংশবিশেষ উদ্ধত করছি -

‘কি কহব কহুনে না যায়

ও রূপ-মাধুরী হেরইতে হেন বুঝি

কলঙ্ক লাগিয়া যাবে গায়।’

নরোত্তম শিষ্য রাঘবেন্দ্রও সপ্তদশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ‘তোমা না ছাড়িব বন্ধু তোমা না ছাড়িব / বিরলে পাঞাছি হিয়া মাঝারে রাখিব’ তাঁর উল্লেখযোগ্য পদ। বাৎসল্য রসের ভালো পদ খুব কমই পাওয়া গেছে। বলরাম দাসের পরে বাৎসল্য-পদাবলী রচয়িতার মধ্যে কীর্তনগানের রানিহাটি (রেনেটি) পদ্ধতির প্রচলনকর্তা বলে খ্যাত বিপ্রপাস ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।তাঁর একটি পদ উদ্ধৃত করা হল-

‘এ খীর নবনী দন্ডে দন্ডে খাও

তিলে তিলে লাগে ভোক ছানি

খাইয়া মায়ের মাথা এত বেলা ছিলে কোথা

অ মোর কুলের যাদুমণি।

অদূর অরুণ প্রখর কিরণ

ঘামিয়াছে ও চান্দ-বদন

বিম্বাধর তোমার মলিন হয়্যাছে

আহা মরি মায়ের পরাণ।

নিমিখ করিতে ভরসা না করি চিতে

মনে করি পাছে হই হারা

বিপ্রদাস ঘোষে কয় মনে বড় বাসি ভয়

ঘর মাঝে তুমি ধন সারা॥"

৭.৭- অনুশীলনী

১) বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) পদাবলীর চন্ডীদাসের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাব্য কৃতির মূল্যায়ন করুন।

৪) টীকা লিখুন- চন্ডীদাস সমস্যা।

৫) বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতির পরিচয় দিয়ে তাঁর কাব্য কৃতি আলোচনা করুন।

৬) চৈতন্য পরবর্তী কালের কবি হিসেবে জ্ঞানদাসের মূল্যায়ন করুন।

৭) গোবিন্দ দাসের কবি পরিচয় ব্যক্ত করে তাঁর কাব্য কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮) টীকা লিখুন- বলরাম দাস।

৯) জ্ঞানদাস ও চন্ডীদাসের কাব্য কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১০) গোবিন্দ দাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলার কারণ আলোচনা করুন।

১১) গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্যায়ন করুন।

৭.৮- গ্রন্থপঞ্জি

১. বৈষ্ণব পদাবলী- হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

২. পাঁচশত বৎসরের পদাবলী- বিমান বিহারী মজুমদার

৩. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য- বিমানবিহারী মজুমদার

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রী ভূদেব চৌধুরী

৬. বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়: নবপর্যায়- নীলরতন সেন

৭. বৈষ্ণব পদাবলী- ড. সত্য গিরি

৮. বিদ্যাপতির পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার

৯. জ্ঞানদাসের পদাবলী- বিমান বিহারী মজুমদার

১০. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- পার্থ চট্টোপাধ্যায়